নাদির শাহ

নাদির শাহ

শ্রীপারাবত

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫/১বি. বিধান সরণি, কলি-৬

প্রথম প্রকাশ
১৯ই মার্চ ১৯৬৩

প্রকাশক
স্থনীলকুমার ঘোষ এম. এ.
পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫/১বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ শিল্পী
প্রবীর সেন

মুদ্রক
শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী
ক্যালকাটা সিটি প্রেস
৯এ, মনমোহন বস্থ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

পুত্রবধূ

শ্রীমতী সুকন্যা গোস্বামী

কল্যাণীয়াসু —

নাদির শাহ

ভোরের আলো তখনো ফোটেনি ভালভাবে। একদল অশ্বারোহী পারস্যের সীমানা অতিক্রম করে হিন্দুস্থানের প্রত্যন্ত গ্রাম মুকুরের ভেতরে প্রবেশ করল। তার পেছনে একটু পরে দুতিন হাজারের একটি দল দোলায়, শকটে এবং অনেকে পায়ে হেঁটে ঢুকে পড়ল। তাদের আপাত দৃষ্টিতে দেখতে সিপাহীদের মত। কিন্তু চলনে যেন সেই দাপট বা চট্‌পটে ভাব নেই। তাদের আলাদাভাবে বোঝা যাচ্ছে না আলোকাভাবে। পুবের ওই পাহাড়টি যার সবটাই হিন্দুস্থানের অন্তর্গত, সেটির অস্তিত্ব না থাকলে হয়ত এদিকের দৃশ্য অনেক স্পষ্ট হত। কারণ সেটির পশ্চাতে এতক্ষণে নিশ্চয়ই পূর্বাকাশে রক্তিমাভার আভাস সূচিত হয়েছে।

মুকুর গ্রামের কোন কুটিরের এক যুবক হয়ত প্রাকৃতিক তাগিদে কুটিরের বাইরে এসেছিল। এসেই এত মানুষের নিঃশব্দ চলনে আকৃষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। অবাক হয়ে চেয়েছিল দোলায় শকটে আর পায়ে হাঁটা আবছা মূর্তিগুলোর দিকে। বন্দুক গর্জে উঠল। প্রকৃতির স্তব্ধতা খান্‌খান্ হয়ে ভেঙে পড়ল। যুবকটি অসহায়ের মত আকাশের দিকে দুহাত তুলে হাঁকুপাঁকু করে কী যেন ধরতে গেল, পারল না। তার দেহ আছড়ে পড়ল সামনের শক্ত মাটিতে। মাথাটা আঘাত পেল একটি বড় পাথরে। তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ প্রাণবায়ু আগেই নির্গত হয়েছিল।

অজ্ঞাতে যুবকটি মহা অপরাধ করেছিল। একটি শকটের কথোপকথনের মধ্যে তার প্রমাণ মিলল। শকটের কণ্ঠস্বর নারীর। আসলে ওই কয়েক হাজারের দলের সবাই নারী। তাদের অধিকাংশ তুরস্কের। স্থানীয় কিছু সুন্দরীও দলের সংখ্যা বাড়িয়েছে।

একজন নিম্নস্বরে অপরজনকে বলে — হারাম অপবিত্র। জান তো একথা?

— না জানার কি আছে?

— হারামকে স্পর্শ করতে নেই। জানো?

— জানি।

— আমরাও সেই রকম।

— আমরা অপবিত্র?

মেয়েলি হাসিতে শকট ঝঙ্কৃত হয়। হাসি থামলে নারী বলে—আপত্তি থাকলে বলতে পার, অতি পবিত্র। আমাদেরও স্পর্শ করতে নেই।

— কিন্তু ওই তরতাজা তরুণটি কি অপরাধ করল?

—ও আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল।

—এই অন্ধকারে ও কি জানে, আমরা কে ?

— না জানুক। আমাদের দল যখন চলবে, তখন তার কাছাকাছি আসার শাস্তি হল, মৃত্যু। এর অন্যথা হয় না কখনো। সেই তুরস্ক থেকে দেখে আসছি। আজকের এই ঘটনা প্রথম নয়।

— আগেও এমন হয়েছে?

— কতবার।

— কিন্তু কেন?

— ওই যে বললাম, আমরা সাধারণের অস্পৃশ্য।

— আমরা সত্যিই হারাম?

— না, কিন্তু তার কাছাকাছি বলে আমাদের দলকে বোধহয় বলা হয় হারেম। নাদির শাহের হারেম। যত রাজ্য উনি জয় করেন, ওঁর হারেম তত পরিপুষ্ট হয়।

— তোমার কষ্ট হয়নি?

— খুব। একজন সান্ত্বনা দিয়েছিল। তারপর সয়ে গেল। নারীদের এও এক ধরনের পরিণতি।

— মাতৃত্ব?

খিল খিল করে হেসে ওঠে অন্যজন। বলে— ভাগ্যে থাকলে হতে পারে বৈকি। তবে সেই ভাগ্য কয়েক হাজারের মধ্যে কয়জনের হবে? সুলতান নাদির শাহ মাঝরাতেব আগে খুব কমই হারেমে পদার্পণ করেন। সূর্য ওঠার আগেই হারেম ছেড়ে চলে যান সিপাহীদের কুচকাওয়াজ দেখতে। শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন। অন্য পুরুষদের মত তিনি উচ্ছৃঙ্খল নন আদৌ।

— অনেক তাজ্জব কাহিনী শুনেছি তাঁর নামে।

— তাও সত্যি।

শকট অনেকটা এগিয়েছে। ওরা পেছনে ফিরে দেখতে পায় একটি কুটির থেকে এক রমণী এবং একটি শিশু ছুটতে ছুটতে আসে। রমণী যুবকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। শকট পথের বাঁকে চলে আসায় দৃশ্যটা আড়ালে পড়ে যায়। তবু ওরা অনুমান করতে পারে রমণী এতক্ষণে যুবকের মৃতদেহ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধবে আকুল স্বরে কাঁদছে। পাশের শিশুটি আসল সত্য অনুমান করতে না পেরেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে মায়ের দেখাদেখি।

হিন্দুস্থানের সীমানায় পা দিতে নাদিরের অনেক দ্বিধা ছিল। সেই দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে তিনি কম সময় নেননি। অথচ তিনি ভালভাবে জানেন মোগল-সূর্য অনেকদিন আগে থেকেই অস্তাচলের পথে ঢলে রয়েছে। বাদশাহ আলমগীরের শেষ জীবন থেকে তার সূত্রপাত। তারপর মসনদ নিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ। সেই বিবাদে অনেক যুদ্ধ, অনেক গুপ্ত খুনও ঘটে গিয়েছে। অবশেষে দ্বিতীয় শাহজাহানের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র রওশন

আখতার তক্তাউসে বসে হলেন আবুল ফতে নাসিরুদ্দিন মহম্মদ শাহ্ গাজী বা শুধুই মহম্মদ শাহ্। নাদির শাহ পারস্যের অধিপতি হওয়ার সতেরো বৎসর আগে তিনি বাদশাহ্ হয়েছেন। তবু নাদির শাহ ভালরকম খবর রাখেন যে প্রবীণ হলেও মহম্মদ শাহ্ আত্মবিশ্বাসহীন দুর্বলচিত্তের মানুষ। তাই তাঁর অন্তহীন উচ্চাশা এতে প্রেরণা পায়। হিন্দুস্থান জয় করতে পারলে সেকেন্দার শাহ্ আর তৈমুরের মত যশস্বী হবেন তিনি। কিন্তু হিন্দুস্থানের বিশাল আয়তনের কথা চিন্তা করলে মনে সংশয় জাগে। এ কি সম্ভব? যতই অপদার্থ হোন না কেন দিল্লীর বাদশাহ ওদেশে আরও অনেকে রয়েছে।

এই দ্বিধাও কেটে গেল কতকগুলো কারণে। তুরস্কের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করতে করতে অর্থভাণ্ডার প্রায় শূন্য। প্রশাসনেও ভাঙন ধরার উপক্রম। সৈন্যদের প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা অসন্তোষ ধূমায়িত হতে শুরু করেছে। কিছুদিনের মধ্যে তারা হয়ত দলছেড়ে দেশের দিকে পাড়ি জমাবে, অধিকাংশই তো আশেপাশের রাজ্য থেকে ভাড়া করে আনা হয়েছে। যুদ্ধবিদ্যায় এরা সবাই ওস্তাদ। এটা তাদের পেশা। সুতরাং যুদ্ধের বিনিময়ে নগদ অর্থ চাই তাদের। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে নাদির শাহকে হিন্দুস্থানে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্তে আসতে হয়। তবে মহম্মদ শাহ্‌কে কখনই বুঝতে দেওয়া হবে না প্রথমে যে তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতাবশত এই অভিযান। যতদিন সম্ভব বন্ধুত্বের মুখোশ পরে থাকতে হবে।

তাই অত্যন্ত বিনীতভাবে তিনি দিল্লীর বাদশাহ্‌কে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। লেখেন : বহুদিন ধরে আফগানিস্তান থেকে দুর্বৃত্তরা প্রায়ই এসে আমাদের দেশে হানা দিয়ে যায়। তাদের এই হামলায় ধনসম্পত্তি এবং প্রাণের প্রভূত ক্ষতি হয়। বছরের পর বছর এইভাবে এসে তারা আমাদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আমি অনেকবার তাদের পেছনে ধাওয়া করেছি। তারা তখন আফগান সীমান্ত পেরিয়ে আপনার দেশে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আমি সেখানে যেতে পারি না। হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়ে। ওরা এই সুযোগ বারবার নিতে শুরু করেছে। আমার সীমাবদ্ধতা ওরা জেনে গিয়েছে। তাই আরও দুর্দম হয়ে উঠেছে। আপনার কাছে আমার অনুরোধ সীমান্ত বন্ধ করে দিন। ওদের একজনও যেন আপনার দেশে গিয়ে আশ্রয় নিতে না পারে। আমি ওদের শায়েস্তা করতে চাই। ওদের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিতে চাই। আমি আগে একজন দুত পাঠিয়েছিলাম তাকেও ফিরিয়ে দিলেন না। সে বেঁচে আছে কি না তাও বুঝছি না।

সম্রাজ্ঞী মালিকা-আল্-জুমানি নিদ্রাভঙ্গের অনেক পরে বাদশাহের কক্ষে প্রবেশ করে দেখেন বাদশাহ্ মহম্মদ শাহ্ তখনো গভীর নিদ্রায় মগ্ন। তাঁর খেয়াল হয় আজ সকালে বিশেষ কোন কারণে দরবার বসার কথা। তিনি বাদশাহের গায়ে আলগোছে হাত রাখেন। বাদশাহের

নিদ্রা একটু বিঘ্নিত হওয়ায় তিনি অন্যদিকে ফিরে পাশ-বালিশ আঁকড়ে ধরেন। বেগম জানেন বাদশাহ বরাবরই ঘুম-কাতুরে। প্রথম যৌবনে, যখন তাঁর অন্য কোন বেগম বা উপপত্নীর উদয় হয়নি, তখনো সারা রাত তাঁকে অস্থির করে দিয়ে ভোরের দিকে এইভাবে ঘুমিয়ে পড়তেন। তখন তাঁর নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিতেন আজকের মালিকা-অল-জুমানি। কারণ তখন তো অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী আসেনি তাঁর। তারপর যখন একজন-দুজন করে জুটতে লাগল, তখন তাঁর নিজের চাঞ্চল্য হ্রাস পেল, দুষ্টুমিও কমে গেল। কারণ তখন একদিন উত্ত্যক্ত হয়ে অন্য বেগমের কক্ষে চলে গিয়েছিলেন মহম্মদ শাহ। সেই থেকে তিনি পুতুল-বেগম। আর কখনো বাদশাহের সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলতে যাননি। তবে তাঁর মর্যাদার আসনটি আজও অক্ষুণ্ণ। সেই আসনের দিকে তাঁর এককালের অতি প্রিয় রওশন আখতার, কাউকে এগিয়ে যেতে দেননি। তাই আজও বাদশাহের শয়নকক্ষের পার্শ্বে তাঁর প্রকোষ্ঠ।

প্রথম যৌবনে সত্যই ভালবেসেছিলেন বেগম মানুষটিকে। তারপর কেন যেন সেই ভালবাসা ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসতে লাগল। আজ তাঁদের উভয়েরই যৌবন বলতে গেলে অতিক্রান্ত। আজ দীর্ঘদিন পাশাপাশি থাকার অভ্যাসের জন্য একটা সাধারণ মমতা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। অথচ থাকতে পারত, যদি মানুষটা আগের দিনের কোন বাদশাহের মত শৌর্য-বীর্যে অতুলনীয় হতে পারত। বিবাহের কিছুদিন পর থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন বেগম যে মানুষটির মধ্যে বংশ গরিমা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। শৌর্য বীর্য দূরের কথা সাধারণ তৎপরতারও অভাব। বংশপরম্পরায় বিপুল ঐশ্বর্য আর তোয়াজের মধ্যে থাকলে মানুষের বোধহয় এমন দশা হয়। অন্তত বেগমের সেই ধারণা। নইলে এতবড় দেশের মালিক হয়েও ইনি এত পরনির্ভরশীল হলেন কি করে? এত নির্লিপ্তই বা থাকেন কি করে?

একসময়ে বাদশাহের নিদ্রাভঙ্গের জন্য অন্য ব্যবস্থা ছিল। এখন তিনি নিজেই সেই সব বাতিল করে দিয়েছেন। বলেছেন, নিজেই উঠবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠতে পারেন না। আজও যেমন উঠছেন না। অথচ বেগম জানেন আজ গুরুত্বপূর্ণ দরবার রয়েছে। পারস্যের শাহ নাদির শাহের নিকট থেকে একজন দূত এসেছে। সে দেখা করবে বাদশাহের সঙ্গে। তাই বেগম মহম্মদ শাহের গায়ে ধাক্কা দিলেন আবার।

ধাক্কা খেয়ে মহম্মদ শাহ জেগে উঠে সম্মুখে দণ্ডায়মান বেগমকে দেখে বলেন — কি হল?

— আজ তোমার দরবার রয়েছে সকালে।

বাদশাহ কিছুক্ষণ ওপরের দিকে চেয়ে ভাবতে থাকেন। তারপর বলেন— হ্যাঁ। যেতেই হবে।

দেশে দল উপদলের সীমা সংখ্যা নেই। নানা দলের মধ্যে খেয়োখেয়ি। এক এক প্রান্তে এক একজন প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় ব্যাপৃত। তবু কেউ-ই সীমা ছাড়াতে পারে না। মোগল বংশের অতীত প্রতাপ না থেকেও অনেকখানি রয়ে গিয়েছে। নামেই কাজ হয় এখনো। ইজ্জত রয়েছে আজও, যেমন মজুত রয়েছে ময়ূর সিংহাসন।

সেই ময়ূর সিংহাসনে বংশগত গাম্ভীর্য নিয়ে এসে উপবিষ্ট হলেন বর্তমান বাদশাহ মহম্মদ

শাহ্। তাঁর প্রবেশের পূর্বমুহূর্তে চিরাচরিত ঘোষণা যেমন হয়, হল। সবাই আসন পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে মোগল রীতিতে অভিবাদন জানাল যেমন বরাবর জানিয়ে এসেছে। কিন্তু আগের অভিবাদনের মধ্যে যে ত্রস্ত ভাব থাকত তার কিছুই নেই। এ যেন অনেকটা নিয়মরক্ষা। উপস্থিত যারা রয়েছে তারা সবাই বাদশাহকে সম্মান জানায় ঠিকই, সমীহও করে। কিন্তু কখনো ভাবে না তক্তভাউসে উপবিষ্ট ব্যক্তিটি বিদ্যা বুদ্ধি ও অন্যান্য গুণাগুণে তাদের চেয়ে অনেক অনেক উঁচুতে। এই বাদশাহের চোখের দিকে তাকাতে তাদের বুক কাঁপে না। কারণ তাদের মধ্যে অন্তত দুতিনজন চারজন বাদশাহকে পরপর ওই আসনে উপবিষ্ট হতে দেখেছে। সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ ও সৈয়দ হুসেন আলি খাঁ এই দুই সৈয়দ ভাই দিল্লীর তক্তভাউস নিয়ে কিছুদিন ছিনিমিনি খেলেছে। যাকে যখন খুশি বসিয়েছে। কাউকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে, কাউকে যৌবনপ্রাপ্তির পূর্বেই। ভ্রাতৃদ্বয় নিহত হওয়ার আগে অবধি এইভাবেই চলেছে। যে বংশের ধমনীতে তৈমুরের রক্তধারা বয়ে চলেছে সেই বংশের মর্যাদাকে তারা যতদূর সম্ভব নীচে নামিয়ে দিয়েছিল। ফলে প্রথমে দেখা গেল ফারুকসিয়ারকে, তারপর পাঁচমাসের জন্য রফিউ-দ-দরাজতকে। তারপর তাঁরই দ্বিতীয় ভ্রাতা রফিউদ্দৌলাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে এনে বসানো হল তক্তভাউসে। উপাধি দেওয়া হল দ্বিতীয় শাহজাহান। তারপর তাঁরই পুত্র এখনকার মহম্মদ শাহ। সুতরাং এই চার বাদশাহের পরিবর্তন যারা স্বচক্ষে দেখেছে, তাদের কাছে ময়ূরসিংহাসনের ঔজ্জ্বল্য, তার মণিমাণিক্যের দ্যুতি কেন যেন অনেক নিষ্প্রভ বলে মনে হয়। তবু এইসব আমীর-ওমরাহদের মধ্যে রয়েছে ধারাবাহিক শৃঙ্খলাবোধ, বংশপরম্পরায় তারা মোগল বাদশাহকে মর্যাদা দিয়ে এসেছে। তাই আজও দেয়, আগের মতই দেয়।

কিন্তু শুধু তারাই তো নয়। আরও রয়েছে, যারা নতুন এসেছে। তাদের মধ্যে আভিজাত্যবোধ নেই। তারা দরবারকক্ষকে খোশগল্পের স্থানে পরিণত করার প্রচেষ্টায় থাকে। আজ তাদের মধ্যে একজন যেমন তক্তভাউসের একটি পায়ার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে,—"ওখানে ময়লা ধরেছে। সাফ করা হয়নি ঠিক মত।" আর একজন হেসে বলে—"ময়লা না, কবুতর"। সে ওপরের দিকে দেখিয়ে দেয় একটা পায়রা বসে রয়েছে চুপ করে। একটি তির্যক আলো তার গায়ে প্রতিহত হয়ে ছায়া ফেলেছে সিংহাসনের পায়ায়। ওমরাহদের মুখ গম্ভীর। বাদশাহ্ এসব দিকে দৃকপাতই করলেন না। একজন মনে মনে চিন্তা করে, মহম্মদ শাহ এই প্রগলভতাকে বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে উচিত কাজ করেছেন। কিন্তু আজ যদি আকবর বাদশাহ থেকে ঔরঙজেবের মধ্যে যে কেউ একজন এখানে উপবিষ্ট থাকতেন তাহলে ওই দুইজনের একজনও প্রাণে বাঁচত না। মহম্মদ শাহ্ তো তাঁদের সমপর্যায়ের নয়।

মহম্মদ শাহ মোগল বাহিনীর প্রধান অর্থাৎ আমির-উল-উমর সামসামুদ-দৌলা খান দউরানকে বলেন, পারস্যের নাদির শাহ একবছর আগে যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তার কিছু করা হয়নি। তিনি বলেছিলেন, তাঁর সীমান্তে নাকি হানা দেয় দুর্বৃত্তরা।

— হ্যাঁ জাঁহাপনা। কিন্তু তখন যে স্থির হল কান্দাহারের ঝামেলা মিটিয়ে তবে তাঁকে খবর দেওয়া হবে?

— ঝামেলা তো মিটেছে। আমরা কি আমাদের সীমানা বন্ধ করেছি? একটা ব্যবস্থা এখন করা দরকার।

সবাই বলে ওঠে, নাদির শাহ বড় অল্পে ব্যস্ত হন।

মহম্মদ শাহ বলেন — কি জানি।

তিনি নিজামুল-মুল্‌ক-এর অভাব অনুভব করেন। তাঁকে ঔরঙ্গাবাদ থেকে ডেকে পাঠানো হয়। একমাত্র উনিই সুপরামর্শ দেন। কারণ নাদির শাহ যদি অল্পে ব্যস্ত হতেন, তাহলে ছয়মাস আগে মহম্মদ খাঁ তুর্কোমান নামে দূতকে কখনো পাঠাতেন না দরবারে।

বাদশাহ প্রশ্ন করেন — সেই তুর্কোমানের খবর কি ? সে তো বলেছিল চল্লিশদিনের বেশি দিল্লীতে থাকতে নাদির শাহ্‌ নিষেধ করেছিলেন। তার তো আমার পত্র নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

কয়েকজন দরবারের ভব্যতা জলাঞ্জলি দিয়ে দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসে। সেই দিকে দৃষ্টি পড়তে বাদশাহের ভ্রূকুঞ্চন হয়, তার বেশি কিছু নয়।

একজন বয়স্ক আমির বলে—সে সম্ভবত তার কর্তব্য ভুলে গিয়েছে। সে এখন আশনাই বাইজীর সৌন্দর্যে নিমগ্ন।

— নাদির শাহ ওকে নিষ্কৃতি দেবেন?

— কখনো নয়। তবে ও এখানে থেকে যাওয়ায় আমাদের দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত নিতে হয়নি।

— তবু একটা কিছু করতে হয়। আমি বরং নিজামুল মুল্‌ককে খবর পাঠাই। তিনি একটা পরামর্শ দিতে পারবেন।

নিজামুলের নাম শুনে খান দওরান মনে মনে জ্বলে ওঠে। ওই লোকটিকে সে সহ্য করতে পারে না। সে বাদশাহের আমির-উল্‌-উমর। তাই তার বাসনা বাদশাহ তার ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল হোন। অথচ সমস্যা দেখা দিলেই নিজামের কথা মনে পড়ে বাদশাহের।

সে বলে—ওঁকে অতদূর থেকে ডেকে পাঠিয়ে কি হবে? আমরাই আপনাকে পরামর্শ দিতে পারব।

— তা তো জানি। তবু উনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কাছে থাকলে ভাল লাগে।

— তুর্কোমান যখন প্রথম এসেছিল তখন নিজামুল মুল্‌ক এখানে ছিলেন।

— হ্যাঁ, তিনি কিন্তু বলেছিলেন পত্রের জবাব দিয়ে দিতে। দিলে হয়ত ভালই হত। কান্দাহারের যুদ্ধের ফলাফলের জন্য বসে না থাকলেও চলত।

আমির আজিম-আল্লাহ্‌ খাঁ বলে — আপনি যথার্থই বলেছেন জাঁহাপনা। লাহোরের শাসনকর্তা জ্যাকেরিয়া খাঁ আমাকে একবার বলেছিল নাদির শাহ দুর্দান্ত ব্যক্তি।

— দুর্দান্ত মানে?

— দুর্ধর্ষ। তুর্কীদের অস্থির করে তুলেছে। অসাধারণ যোদ্ধা। রণকৌশল চমকপ্রদ।

মহম্মদ শাহ একটু হেসে বলেন— তাই বুঝি? ওসব রণকৌশল এদেশে দেখাক। মোগল শক্তির সামনে কখনো পড়েনি।

আমতা আমতা করে আজিম আল্লাহ্ বলে— তা অবশ্য ঠিক। তবে পর্যটকরা বলেছে পারস্যের আশেপাশের সমস্ত রাজ্য তাঁর ভয়ে কাঁপে।

— কাঁপুক যত পারে। তাতে নাদির ভাববে সে একজন বিরাট ব্যক্তি।

কথাটা লুফে নিয়ে সৈয়দ নিয়াজ খাঁ বলে ওঠে— ঠিক বলেছেন জাঁহাপনা। নাদির শাহকে পত্র দেবেন কি করে? তাঁকে সম্বোধন করবেন কি বলে? 'শাহ' বলে? তাতে আপনার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না?

— ঠিক। কি বলে সম্বোধন করব তাহলে?

খান জুমান খাঁ বলে— তার চাইতে লোকটি আশনাই বাইজীর কাছে পড়ে থাকুক যত দিন খুশি।

— থাকুক। নাদির শাহ এত বড় যোদ্ধা যখন তখন সামান্য কয়েকজন হানাদারের জন্য দূত পাঠিয়ে চিঠি পাঠিয়ে অস্থির করে তোলেন কেন?

আমির সৈয়দ ইয়াকুব খাঁ বলে — এটাই সার কথা বলেছেন খোদাবন্দ।

আমির আজিম আল্লাহ খাঁ একটু ইতস্তত করে বলে ফেলে — কাবুলের সুবাদার নাসির খাঁয়ের কাছে লোক পাঠালে বোধহয় ভাল হয়। নাদির শাহ সম্বন্ধে তার পরিষ্কার ধারণা আছে বলে শুনেছি। তাছাড়া সীমান্তের সর্বশেষ খবর পাব আমরা।

মীর গুলাম একটু হেসে বলে — নাসির খাঁ? তাহলেই হয়েছে।

আরও কয়েকজন ওমরাহের মুখে হাসি দেখা গেল। এই হাসি বাদশাহকে তুষ্ট করার জন্য। কারণ নাসির খাঁ যখনই কাউকে দিল্লীতে পাঠায় বুঝতে হবে অর্থের জন্য। কোন্ কোন্ বাবদ কত অর্থের প্রয়োজন তার একটা বিরাট ফর্দ দিয়ে পাঠায়। তাই মহম্মদ শাহ একবার মন্তব্য করেছিলেন নাসির খাঁয়ের লোক মানে ভিক্ষার ঝুলি। খুব পছন্দসই কথা। সবাই লুফে নিয়েছিল মন্তব্যটিকে।

আজিম আল্লাহ খাঁ চুপ করে যায়।

মোগল দরবারে নাদির শাহকে নিয়ে যতই জল্পনা-কল্পনা হোক না কেন, তাঁর শতাংশের একাংশ সম্বন্ধেও সম্যক ধারণা নেই কারও। প্রথমেই তারা ভুল করেছে এই ভেবে যে তিনি বংশপরম্পরায় ঐশ্বর্য আর সমৃদ্ধির মধ্যে সুখে লালিত-পালিত হয়েছেন। এটাই তাদের গোড়ায় গলদ। তিনি অতি বৃদ্ধও নন। আবার তরতাজা তরুণও নন। পঞ্চাশ পার হয়েছে, অথচ দেহে অমানুষিক শক্তি। মনের শক্তি তার চেয়েও বেশি। সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘদেহী তিনি। ফর্সা চেহারা, মুখখানা রক্তিম। আয়ত চক্ষুদ্বয় কৃষ্ণবর্ণের। একটু আয়েশ করলে দেহ মেদযুক্ত হয়ে ওঠার প্রবণতা। তাঁর কণ্ঠস্বর বলিষ্ঠ এবং সুউচ্চ। কুচকাওয়াজের সময় যথেষ্ট দূর থেকে সৈন্যদের আদেশ শোনান। অতবড় বাহিনীর প্রত্যেকের কর্ণে সেই আদেশ পরিষ্কারভাবে প্রবেশ করে।

তাঁর হাতে সব সময় একটি যুদ্ধ-কুঠার। কারও প্রতি বিরূপ হলে কিংবা তাঁর ধৈর্যচ্যুতির ঘটনা ঘটলে সেই কুঠার কখনো-সখনো শিরচ্ছেদ ঘটায়। তিনি নিজে চূড়ান্ত কষ্ট সহ্য করতে পারেন। তাই তাঁর সৈন্যদলের অনেকে ভাড়াটে হলেও তাঁর মত কষ্ট সহ্য করতে বাধ্য হয়। হিমের রাতে উন্মুক্ত প্রান্তরে ভাজা মটরশুঁটি চিবোতে চিবোতে ঘোড়ার জিনকে মাথার বালিশ করে নিয়ে তিনি অনেক রাত কাটিয়েছেন। আসলে কামিজের থলিতে সব সময় ভাজা মটর মজুত থাকে। কারণ দুএকদিন অনাহারে থেকে ওই মটর চিবিয়ে দিন কাটাতে অভ্যস্ত তিনি। অমন অনেক ঘটেছে।

নাদির জন্মেছিলেন পারস্যের খোরাসান প্রদেশের ক্যালট নামে একটি ক্ষুদ্র জনপদে। পিতা ছিলেন একটি উপজাতের নেতা। তাঁর অধীনে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। এই দুর্গ থেকে লক্ষ্য রাখা হত যাতে উজবেক তাতাররা গিরিপথ ধরে দেশে প্রবেশ করতে না পারে। বেশ কয়েকটি গিরিপথ দেখাশোনার ভার ছিল নাদিরের পিতার ওপর।

পিতার মৃত্যু হলে নাবালক নাদির খুল্লতাতের দৌরাত্ম্যে তিষ্ঠাতে পারলেন না। তিনি চলে গেলেন খোরাসানের শহর মুশাদে। তখন তিনি শুধু নাদির খাঁ বা সংক্ষেপে কুলি খাঁ। খুব একটা সম্মানজনক পরিচয় নয়। কারণ 'কুলি' কথাটার অর্থ বলতে গেলে প্রায় ক্রীতদাসের পর্যায়ে পড়ত। তবু তিনি সেখানে সুলতানজাদার সঙ্গে দেখা করে, ব্যবহারে তাঁকে সন্তুষ্ট করে একটি অশ্বরোহী দলের দলপতি হলেন। তারপর থেকে তাঁর উন্নতির সূচনা। তাতাররা দেশ আক্রমণ করলে তিনি এমন বীরত্ব দেখালেন যে তাঁকে সেনাধ্যক্ষের পদে উন্নীত করা হল।

তবু কিন্তু তাঁর জীবন মসৃণ রইল না। তিনি খুল্লতাতের কাছ থেকে তখনো দুর্গটি নিতে পারেননি। এদিকে কোন কারণে সুলতানজাদার কোপদৃষ্টিতে পড়ে তাঁর সৈন্যবাহিনীর পদটিও গেল। তখন অনন্যোপায় হয়ে তিনি গিরিপথে পর্যটক এবং অন্যান্য রাজকীয় যাত্রীদের ওপর ডাকাতি শুরু করলেন। কারণ তাঁকে সৈন্যদল রাখতেই হবে। না রাখলে পৈতৃক দুর্গ দখল করতে পারবেন না কিংবা শাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন না।

অবশেষে তিনি সফল হলেন। নিজের দুর্গ দখল করলেন। শাহের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন। এবং দুর্বলচিত্ত শাহের দৌলতে শেষ পর্যন্ত পারস্য দেশের অধিপতি। এই ছিল মোটামুটি তাঁর জীবনের পশ্চাৎপট। এই জীবনের সঙ্গে দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহের জীবনের আসমান-জমিন ফারাক।

মুকুরের কাছে হিন্দুস্থানের জমিতে পদার্পণ করে নাদির শাহ অনেকখানি এগিয়ে বেশ কিছুদিনের জন্য গজনীর আঠারো ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে কারাবাগে শিবির স্থাপন করলেন। তাঁর পত্র দিল্লীশ্বরের কাছে পৌছোতে আরও কয়েকদিন লাগবে। আর পৌঁছোলেই বা কি? মহম্মদ শাহ যে কতটা গুরুত্ব দেবেন জানা আছে নাদির শাহের। আগেও কয়েকবার একই অনুরোধ জানিয়েছেন দিল্লীকে, পর্যটকদের মারফত। এইসব পর্যটকেরা দূতের মতই সম্মানীয় ব্যক্তি ছিল। দিল্লী ভ্রূক্ষেপ করেনি। নাদির শাহ জানেন, বছবছর ধরে বংশপরম্পরায় একটা বিশাল দেশের অধীশ্বর হলে ভুয়ো আত্মম্ভরিতায় আক্রান্ত হওয়া খুব স্বাভাবিক। এমন না হলে

তো এক একটা সাম্রাজ্য চিরকাল ধরে টিকে থাকত। তাদের পতন হত না। আর পতন না হলে নাদির শাহদের উচ্চাশা পূর্ণ হবে কি করে? সুতরাং পত্রের জবাব আসুক, না আসুক এসে যায় না। বরং না আসাই ভাল। তিনি যে সীমান্ত অতিক্রম করে ঢুকে পড়েছেন, এ খবর এখনো জানানো হয়নি বাদশাহকে। এবারে জানাতে হবে সময়মত। আর পত্রের জবাব না এলে এদেশে প্রবেশের অজুহাত আরও পাকাপোক্ত হবে। তবে কোন সময়ে ভুল করেও বন্ধুত্বের মুখোশ খুলে ফেললে চলবে না। আর যে বংশ-মর্যাদাবোধ দিল্লীর শাহকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে, সেই বোধকে আরও তোয়াজে রাখতে হবে।

অবসর কাকে বলে মনে নেই নাদির শাহের। রাত্রি ব্যতীত মানুষের জীবনে অবকাশ বলে কিছু থাকতে পারে সেকথা ভুলে গিয়েছেন তিনি। তবে রাত্রিকে শুকনো করে রাখতে তিনি কখনই রাজি নন। রাত্রি হবে রঙিন। সেখানে সুরা ও নারী থাকবেই থাকবে। আর নারী বলতে যাকে সামনে হাজির করা হবে সে হলেই চলবে এমন হতে পারে না। তিনি নিজে প্রতি রাতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বেছে নেবেন। সুরা তিনি পান করেন, তবে কখনই অত্যধিক নয়। খুব বেশি হলে তিন পোয়া।

আজ কিন্তু রাত্রির আগেই অপরাহ্নের শেষ বেলায় নাদির শাহের হাতে কাজ নেই। এ এক দুর্লভ মুহূর্ত। এই মুহূর্ত কিভাবে অতিবাহিত করতে হয় সে অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। তাঁবু খাটানো হয়ে গিয়েছে। রঁসদ-সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়েছে। আরও কিছু লোক বেরিয়েছে অতিরিক্ত রসদের সন্ধানে। এদের খাদ্য এবং অর্থ এই দুটো জিনিস চাই। পারস্যের সীমান্তবর্তী দেশগুলো তেমন উর্বর নয়। তাই সেখানকার মানুষেরা পরিশ্রমী এবং অকুতোভয়। হুমকি দিয়ে তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করা দুরূহ। অথচ অর্থ পেলে তারা জান লড়িয়ে দেয়। নিজেদের পরিবারের মধ্যে তারা প্রেমময় পতি আর স্নেহময় পিতা। কিন্তু ঘরের বাইরে তারা নির্মম, নিষ্ঠুর। কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও তারা যুদ্ধক্ষেত্রে শৃঙ্খলাপরায়ণ। এরা প্রায় সবাই পারস্যের সীমারেখার বাইরের অধিবাসী। অর্থ পাবে বলে যুদ্ধ করতে এসেছে। এরা ঘোর পেশাদার। নাদির এদের ভীষণ পছন্দ করেন। কারণ এরা ভয়ে পালায় না আর হুকুম অমান্য করে না। তবে এদের শৃঙ্খলাপরায়ণ করে তুলতে যোগ্য দলপতির প্রয়োজন। এদের যত গুণাবলী রয়েছে দলপতির সেই সব গুণগুলো তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে থাকা জরুরী। আর প্রয়োজন লৌহমানবের ব্যক্তিত্ব। নাদির শাহের তা রয়েছে। ওরা কথায় ভোলে না, বাজিয়ে দেখে।

নাদির শাহের আকাশের চাঁদ ও তারা কখনো কখনো নজরে পড়ে যায়। বিশেষ করে ধ্রুবতারা তাঁর কাজে লেগেছে মাঝে মাঝে। কিন্তু দিনের আকাশ কবে দেখেছেন ভুলে গিয়েছেন। কারণ তখন তিনি থাকেন কর্মব্যস্ত। আজ তাঁবুর বাইরে পা ছড়িয়ে বসে হঠাৎ দেখে ফেলেন সেই আকাশকে। দেখে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন। ভাবখানা, পৃথিবীতে এমন রোমাঞ্চকর কিছু রয়েছে নাকি ? জানতাম না তো? হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। অনেক শৈশবে মা যেমন চাঁদ দেখাত, তেমনি এমন লাল হয়ে ওঠা আকাশও দেখাত। আশ্চর্য, মায়ের কথাই

মনে ছিল না এতদিন। আজ আকাশ দেখতে দেখতে আশেপাশে চোখ যায়। আর সেই সময় একদিকে দৃষ্টি আটকে যায়। ওই ছোট্ট পাহাড়টি আর পাহাড়ের পথে ওই গাছটি— দুটোই যেন তাঁর গ্রাম ক্যালট থেকে তুলে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমন হুবহু মিলও থাকতে পারে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্থানের দুটি দৃশ্যের মধ্যে। নাদির শাহের মত মানুষও মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে থাকেন।

ধীরে ধীরে অন্ধকার নামে। আজ নাদির শাহের নিজের কোন সক্রিয়তা নেই বলে এত অসংখ্য তাঁবুও যেন স্তব্ধ। কোথাও প্রাণের সাড়া নেই। কোথাও অগ্নি প্রজ্বলিত হতেও দেখা যাচ্ছে না। অথচ সবার সজাগ মন পড়ে রয়েছে এখানে। দূরে অদূরে তাঁর বিশ্বস্ত দেহরক্ষীরা অশ্বারোহীরা সবাই মজুত এবং কান পেতে রয়েছে কখন সেই বজ্রনির্ঘোষ শোনা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে সামনে অভিবাদন জানিয়ে দাঁড়াবে।

অন্ধকার একটু গাঢ় হতেই শোনা গেল সেই গর্জন— হাজি খাঁ।

মুহূর্তের মধ্যে উদয় হয় হাজি খাঁয়ের। বলে— হুজুর।

— সরাব।

সরাবের আয়োজন হয়। সাকী সুরা পরিবেশন করে। খেয়াল হলে নাদির শাহ কোন সঙ্গী বেছে নেন। আজ তিনি একা। আজ তিনি হারেমে যাবেন। হারেম তাঁর শিবিরের সন্নিকটে। একটু আগে যাবেন। কারণ প্রথমে তিনি হারেম পরিদর্শন করে নেবেন। মুকুর ছাড়ার পরে তারা সবাই কিভাবে রয়েছে দেখা হয়নি। একজন খোজাকে তিনি পাঠান হারেমের ভারপ্রাপ্ত অপর খোজার কাছে। হুকুম দেন, সবাই যেন তাদের দেওয়া পোশাক পরে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ায়। সাধারণত রাত গভীর হলে তিনি হারেমে যান। কিন্তু আজ তো শুধু নিজের জন্য নয়, আজ তাদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নেবেন। তাই অনেক আগেই রওনা হন।

তারা সবাই দাঁড়িয়ে ছিল খোলা আকাশের নীচে। ঠিক যেন একদল সৈন্য কোথাও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। দেখলে সৈন্য বলেই মনে হয়। বাইরের কারও পক্ষে এদের নারী বলে চেনার সাধ্য নেই। তাদের স্বাভাবিক পোশাকের ওপর বাররানি বা বর্ষাতি। কটিবন্ধ বা মেখলা জাতীয় পরে রয়েছে প্রত্যেকে। প্রত্যেকের মুখ সূক্ষ্ম কাপড়ে ঢাকা, আর মাথায় শাল টুপির মত করে বাঁধা। সিপাহীর মত পাদুকা এবং হাতে অস্ত্র রয়েছে। এরা দল বেঁধে চললে সাধারণ মানুষের সাধ্য নেই নারী বলে চেনে। সবাই ভাববে নাদির শাহের সৈন্যদল চলেছে। পুরুষের দাপটের অভাব সহসা কেউ লক্ষ্য করবে না।

সব দেখেশুনে নাদির শাহ নীরব থাকেন অর্থাৎ তিনি মোটের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁর পার্শ্বচরেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

নাদির শাহ রাতের জন্য একজন তুরস্কের সীমান্তের নারীকে বেছে নেন। কারণ তুর্কী ভাষা তাঁর মাতৃভাষার মত। কথা বলে সুখ। আফগান সুন্দরীদের সঙ্গে কথোপকথনে অসুবিধা হয়। তাদের উচ্চারণভঙ্গি অন্য ধরনের। তাদের কিছু জিজ্ঞাসা করলে একবারে উত্তর মেলে না। 'উঁ' 'এ্যাঁ' বলে জিজ্ঞাসা করবে। একজন রমণীর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করার সময় এই 'উঁ'

'এ্যা' বড়ই বিরক্তিকর। এই বয়সে অত উচ্ছ্বাসও নেই সব বাধাবিঘ্ন চুরমার করার মত। একটা সময়ে ছিল বটে। তবে তখন নারী অত সহজলভ্য ছিল না। তাই চিন দেশের সুন্দরী হঠাৎ পেয়ে গেলেও কোন বাধা বাধা হয়ে দাঁড়াত না। মুহূর্তে মিলেমিশে একাকার। জাতটাও তেমনি। স্থানকালের পার্থক্য নেই কোন। একাকার হওয়ার জন্য যেন সদাই প্রস্তুত। হয়ত কখনো স্বামীর সঙ্গে ঘর করার স্বাদ পায়নি বলে, এমন অদ্ভুত ধরনের হয়ে ওঠে তারা। ভাগেযোগে জীবনে কয়বারই বা পুরুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়? আজকের এই রমণী যেন অন্য ধরনের। তার গায়ের ঘ্রাণও দেশী দেশী পরিচিত। হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ তুরস্ক আর পারস্যের সীমান্ত থেকে তাকে সংগ্রহ করা হয়েছে। পারস্যের গাছপালা, পাথর-মাটি ফুল-ফলের গন্ধ যেন এরও গায়ে।

— তোমার সাদি হয়েছিল?

— হ্যাঁ।

— কতদিন?

— এক বছর।

— বাচ্চা হয়নি?

— না।

— কেন?

— নসিব।

— তোমাকে এনেছি বলে কষ্ট হচ্ছে না?

— হলেই বা কি ?

— ধর তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি যদি?

মেয়েটি অদ্ভুত হাসে।

— হাসলে যে?

— আপনি কাউকে ফিরিয়ে দিয়েছেন কখনো?

— না। এভাবে কারও সঙ্গে কথা বলিনি। তাছাড়া তোমার দেশ আমার দেশের এত কাছে। এখনো বল। ফিরিয়ে দিতেও পারি।

— আপনার এখানে খাওয়ার কষ্ট পাব না?

— কখনো না। প্রত্যেকের ব্যবস্থা আমি করি।

— তাহলে আর ফিরব না।

— অশ্চর্য।

— আমার স্বামী আর শাশুড়ি ভীষণ অত্যাচার করে। তাছাড়া ওরা বড় গরিব। খেতে পাই না।

নাদির শাহ নীরব থাকেন। বহুদিন পরে তাঁর শরাবের নেশা সেভাবে জমে উঠতে পারল না। অথচ মেয়েটি মোটামুটি সুন্দরী। সুন্দরী না হলে তো হারেমে স্থান হয় না।

নাদির শাহ ধীরে ধীরে অগ্রসর হন। হিন্দুস্থানের মধ্যে প্রবেশ করেও মনের দ্বিধা একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেননি এখনো। কী বিশাল দেশ। কত জাতি। সর্বোপরি রয়েছে রাজপুত জাঠ আর শিখ। আর রয়েছে মারাঠী।

তিনি বাদশাহকে আর একটি পত্র লেখেন। তিনি যে এদেশে ঢুকে পড়েছেন সেটা জানানো জরুরী।

তিনি লেখেন : আমার একটি পত্র ইতিমধ্যে নিশ্চয় আপনার হস্তগত হয়েছে। কিন্তু পত্রবাহক আপনার কোন পত্র নিয়ে ফিরে আসেনি। আরও অপেক্ষা করা আমার দেশের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল দেখে আমি বাধ্য হয়ে আপনাব সীমানায় প্রবেশ করেছি। এতে আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। অনুপ্রবেশকারীদের শাস্তি দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। আমি আপনার সুহৃদ। আপনি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বলে আমার নিকট খুবই সম্মানীয়। আপনার পত্রের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রইলাম।

দুজন অশ্বারোহীকে পাঠালেন পত্রসহ।

এবারে আসল অভিযান শুরু হবে। প্রথমে কাবুল। কাবুলের সুবেদার নাসির খাঁ। লোকটি বাদশাহের বিশ্বস্ত এবং ভাল যোদ্ধা। প্রথমেই তার কাছে অপদস্থ হলে বাহিনীর মনোবল ধাক্কা খাবে। তাই তাঁর কয়েকজন সেনানায়ককে ডেকে প্রত্যেককে তাদের মতামত প্রকাশ করতে বলেন। এদের মধ্যে দুজন আছে যাদের নাদির শাহ কোনদিনও পছন্দ করেন না। তিনি লক্ষ্য করেছেন তারা সবসময় বিপরীত মতামত প্রকাশ করে গম্ভীর ভাবে। তারা কোন কিছুতে এগিয়ে যেতে গেলেই বাধা দেয়। নানা বিপদের গন্ধ পায় সব কিছুতে। নাদির শাহের কতবার মনে হয়েছে তাদের শেষ করে দিতে। কারণ তারা যেভাবে আশঙ্কা প্রকাশ করে থাকে, অন্য সব সেনানায়করাও তাতে প্রভাবিত হয়। এই দুজনার মন সন্দেহপ্রবণ। ওদের মতামত কোনদিনই উৎসাহব্যঞ্জক হয় না। তবু এরা রয়েছে। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে এরা অসাধারণ। এদের একজনের নাম হুসেন, অপরজন জাফর। বহুদিন ধরে রয়েছে। মাঝে মাঝে নাদির শাহের ওপর নিজেদের মতামত জোর করে চাপিয়ে দিতে চায়। কারণ তিনি যখন শুধু নাদির খাঁ বা কুলি খাঁ ছিলেন তখন থেকেই জাফর আর হুসেন রয়েছে। তেমনি রয়েছে তাদের খবর্দারি।

এবারে হিন্দুস্থান আক্রমণের আগে তারা রীতিমত জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তাদের স্পর্ধা দেখে অন্য সবার রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল। অবাক হল, এভাবে বলেও দুজনা নিষ্কৃতি পেয়ে গেল দেখে।

আজ তারা দুজনা যখন উপস্থিত হয়, তখন অন্য সবাই অপাঙ্গে তাদের বেজার মুখ দেখে বুঝল আজও উল্টোপাল্টা কিছু বলার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে। আলোচনা একটু এগোতেই জাফর বলে ওঠে— মারাত্মক ভুল হচ্ছে। এখনো সময় রয়েছে দেশে ফেরার।

হুসেন বলে — হ্যাঁ, হিন্দুস্থানের শাহাজনশাহ ওৎ পেতে রয়েছেন। বেশি দূর এগিয়ে গেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলবেন। এখনো সাবধান করছি শাহ।

নাদির শাহের হাতের যুদ্ধ-কুঠার একবার ওপর দিকে উঠেই নেমে গেল। তিনি কয়েকজনকে হুকুম করেন ফাঁসিতে লটকানোর মত দ্রুত মঞ্চ তৈরি করতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মঞ্চ প্রস্তুত।

নাদির শাহ ক্রূর হেসে বলেন — এরা দুজনা নাদির শাহ্ আর নাদির কুলির মধ্যে পার্থক্য বারবার ভুলে যায়। এভাবে চলা অসম্ভব।

তাঁর অঙ্গুলি হেলনে তখনই দুজনকে দ্রুত ফাঁসিতে লটকে দেওয়া হল। ঝুলে পড়ার আগে অবধি ওদের চোখে বিস্ময়ের ঘোর লেগে ছিল।

তাদের দেহ দুটি ঝুলতে থাকে। তারই সামনে নাদির শাহ্ ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে গভীর আলোচনায় রত হন অন্য সবার সঙ্গে।

দিল্লীর বাদশাহ্ মহম্মদ শাহের পুত্র সুলতান আহমেদ পরিপূর্ণ যুবক। দীর্ঘকায় এবং মুখে চোখে চেহারায় মোগল বংশের আদল। সবাই বলে তাকে দেখতে নাকি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের মত। খুব গর্ব সেজন্য। ইয়ার দোস্তদের বলে, বেগম একটা আছে বটে, কিন্তু নূরজাহানের ধারে কাছে নয়। সবাই হাসে। তোয়াজে রাখে। ভবিষ্যতের বাদশাহ্ বলে কথা। খোশামোদ করলে আখেরে কাজ হবে।

বেগমকে সুলতান আহমেদের পছন্দ না হলেও অন্য সব নারীদের ওপর তার নজর। ফুলে ফুলে মধু পানের সাধ তার। এক এক ফুলের এক এক ধরমের ঘ্রাণ। বেশ বৈচিত্র্য রয়েছে। বেগম তার পরিচিত হয়ে গিয়েছে। একঘেয়ে। তার খাঁজখুজ সবই বড় বেশি পরিচিত। কথার মধ্যেও মিষ্টত্ব নেই। বড চড়া। আমিরের মেয়েরা বোধহয় অমনই হয়। বিনয়ভাব কম। নিজেকে সমর্পণও করে গোছগাছ করে নিয়ে। সেখানেও সাবধানতা। আকুলতা নেই বলে অসংবৃত ভাবও নেই।

হারেমে মায়ের তদারকি করে এক বাঁদী। নাম তার ফুলজান। হ্যাঁ, একবার দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। তাই বলে কি সে সুন্দরী? কখনই নয়। কিন্তু তার দেহখানা? রীতিমত ফুটন্ত আর বন্য। মা মালেকা-আল-জুমানি বুঝতে পেরেছিলেন ছেলের মনোভাব। হেসে ফুলজানের ওপর থেকে নজর তুলে নিতে বলেছিলেন। অতই সহজ নাকি। ফুলজানও যেন ধরা দিতে ব্যস্ত। শাহাজাদার প্রথম দিনের দৃষ্টি তার কাছে জলের মত সহজ বলে মনে হয়েছিল। তাই অনেকের সহযোগিতায় হারেমের শেষ প্রান্তে সেই আলাদা একটি কক্ষে উভয়ের দেখা। শাহাজাদা সুলতান আহমেদ রীতিমত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বেগমের সঙ্গে প্রথম রাতের মিলনেও এর অর্ধেক রোমাঞ্চ অনুভব করেনি। বেগম হল শীর্ণতনু। আর ফুলজানের যৌবন যেন ফেটে বের হয়ে আসতে চায়।

তার কথার ধরনও অন্যরকম। নতুনত্বের স্বাদ।

— আমাকে আপনার ভাল লাগছে শাহাজাদা?

— খুব।

— মোজাহারও ওকথা বলত।

সুলতান থমকে যায়। বলে — কি বললে?

— না। মোজাহারও বলত, তোকে খুব ভাল লাগেরে ফুলজান।

— মোজাহার তোমাকে ছুঁয়েছে?

— হ্যাঁ, ছুঁয়েছে। তবে বেশি না। একবার শুধু জড়িয়ে ধরেছিল। আমি হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে এসেছিলাম।

— কেন?

— গায়ে যা বিশ্রী বাস! আপনার গা শুঁকলে আরামে চোখ বন্ধ হয়ে আসে। আর ওর? থুঃ।

— ওর গায়ে সুগন্ধ থাকলে ধরা দিতে?

— তাহলে ভেবে দেখতাম। তাগড়াই চেহারা ছিল তো? লোভ হত।

— আমি তোমার কাছে আবার যদি আসি?

— আসবেনই তো। আপনি এসেছেন, আমার কত বড় ভাগ্য। আমি আপনার কেনা বাঁদী। জন্মিয়ে যে কত আনন্দ কত সুখ আজ বুঝলাম। আল্লার কিরে।

ফুলজানের কাছে প্রেমালাপের নতুন পাঠ নিল শাহজাদা।

নাদির শাহ হিন্দুস্থানে প্রবেশের পরে প্রথম যে পত্র বাদশাহকে লিখেছিলেন সেটি এসে পৌঁছোয়। তাতে তিনি উল্লেখ করেননি যে বাদশাহের সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। পত্রবাহককে অতিথিশালায় পাঠিয়ে দিয়ে পত্রটি পাঠ করা হয়। অধিকাংশ আমির সেটি পড়ে ঠোঁট উল্টোয়। বাদশাহ হাসেন। শুধু আমির আলি-হামিদ খাঁ গম্ভীর হয়ে বলে — অশুভ সঙ্কেত! তুচ্ছ করা উচিত নয়।

কয়েকজন তার কথায় টিপ্পনি কাটতে শুরু করে।

বাদশাহ বলেন — আপনার এমন মনে হওয়ার কারণ?

— আরব দেশের এক পর্যটকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। বলা যায় বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আমার বাড়িতে সে অতিথি হয়ে কয়েকদিন ছিল।

একজন বলে ওঠে — আপনি অতিথি বৎসল বলে নাম ডাক আছে। বিশেষ করে অতিথি বিদেশী হলে।

আলি হামিদ খাঁ বলে — বিদেশীরা বাইরের তাজা খবর আনে। তাদের প্রতি আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। অন্তত আমার ভাল লাগে।

মুজাফফর খাঁ বলে — দেখবেন, ঘরের কথা ফাঁস করে দেবেন না। কোন্ শাহের কাছ থেকে কোন্ প্রস্তাব এরা আনবে ঠিক কি? প্রস্তাবের সঙ্গে যদি প্রাপ্তিযোগ থাকে —

মুজাফফরের কথায় হামিদ খাঁয়ের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। সে আশা করেছিল বাদশাহ এই অপমানজনক উক্তিতে অসন্তুষ্ট হবেন এবং প্রতিবাদ করবেন। কিন্তু ময়ূরসিংহাসন নির্বাক।

নিজেই সে তখন বলে — খোদার কৃপায় বংশ পরম্পরায় অনেক রয়েছে আমার। আর প্রয়োজন নেই। তাছাড়া আমি অনেক পুরুষ ধরে হিন্দুস্থানের অধিবাসী। দরবারে তো দেখি, কেউ পারসিক, কেউ তুর্কী আর কেউ উজবেকী। খুব বেশি হলে দুই পুরুষ রয়েছে এদেশে। তাদের কত উপদল। মমতা আছে কি তাদের এই দেশের প্রতি? বাদশাহের প্রতি কর্তব্যবোধ? আছে কি তাও? তাদের কি টান আছে হিন্দুস্থানের প্রতি ?

দক্ষিণের নিজামুদ্দিন-মুল্‌ক, অযোধ্যার অধিপতি সাদাত খাঁ সবাই হাল আমলের। তারা উপদল নিয়ে সব সময় ব্যস্ত। দিল্লীতে অবস্থান কালে তাদের মধ্যে কোন্দল লেগেই থাকে। হামিদ খাঁয়ের কথায় তাদের আঁতে ঘা লাগে। ভাবে আলি হামিদ খাঁ তাদের উদ্দেশেই বলেছে। তাই দুজনাই প্রতিবাদ করে ওঠে।

এবারে বাদশাহ বলেন — ওঁকেও তো একটু আগে অপবাদ দেওয়া হল। উনি তো উষ্মা প্রকাশ করেননি। ওঁর কথায় আপনারা চটছেন কেন? সত্যি কথা বলে ফেলেছেন নাকি ?

— না জাঁহাপনা সে কথা নয়। তবু এভাবে —

— উপদল নেই বলতে চান? সবাই তো জানে আছে।

— তা আছে। কিন্তু তাই বলে তারা হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে ? এদেশের দুশমন?

— সে কথা ঠিক নয়। ঠিক হলে আপনারা এত সম্মানজনক পদে থাকতেন না। কিন্তু আলি হামিদের দিকেও সেই ইঙ্গিত করা হয়েছিল। তখন আপনারা নীরব ছিলেন কেন?

আলি হামিদ বুঝতে পারে মোগল রক্তের ধারা স্তিমিত হয়ে এলেও এখনো রুদ্ধ হয়ে যায়নি। তাই দেরিতে হলেও তাকে রক্ষা করলেন।

বাদশাহ তার দিকে চেয়ে বলেন — আপনি বললেন, অশুভ সঙ্কেত। কেন বললেন একথা।

— সেই বিদেশী, নাদির শাহের রাজধানীতে বেশ কিছুদিন ছিল। নাদির শাহ সম্বন্ধে তার কাছ থেকে অনেক কিছু শুনলাম।

বাদশাহের প্রশ্ন — কি শুনলেন?

— লোকটা অত্যন্ত দুঃসাহসী, জেদী, অসাধারণ যোদ্ধা, কৌশলী। লোকটা শান্ত থাকতে পারে না। আশেপাশের রাজ্যকে অস্থির করে তোলে। অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী।

একজন টিট্‌কারি দিয়ে বলে ওঠে — বাকি থাকল কী ?

আলি হামিদ খাঁ তার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে — আরও একটু বাকি আছে। সেকেন্দার শাহ আর তৈমুরের মত তারও লক্ষ্য হিন্দুস্থান বিজয়।

কয়েকজন হেসে উঠলেও সিরবুলিন্দ খাঁ, কামরুদ্দিন খাঁ, খান দউরান প্রভৃতি সবার কপালে ভাঁজ পড়ে। খান দউরান বলে — আপনার সেই অতিথি সাধারণ পর্যায়ের নন নিশ্চয়।

একটু হেসে হামিদ খাঁ বলে — রাস্তার লোককে আমি সাদর আমন্ত্রণ জানাই না।

এবারে বাদশাহ নিজে সব কিছু হালকা করে দেন। তিনি বলেন — আকাশের চাঁদও পেতে ইচ্ছা করে অনেকের। তাই বলে কি সেটা পাওয়া সম্ভব? হিন্দুস্থান বিজয়ের স্বপ্ন অনেকেই দেখতে পারে, বাস্তবে সেটা সম্ভব নয়। ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। পত্রের উত্তর একটা দিতে হবে। নিজামুল-মুলক যখন রয়েছেন দিল্লীতে মুসাবিদা করে রেখে দেবেন। দুএকদিনের মধ্যে পাঠিয়ে দেব। সেই সঙ্গে মহম্মদ খাঁ তুর্কোমান যদি চলে যেতে চায় ভালই হবে।

একজন ফোড়ন কাটে — আশনাই বাইজীকে ছেড়ে?

একমাসের মধ্যে নাদির শাহের দ্বিতীয় পত্র আসে। তাতে তিনি লিখেছেন মুকুরের কাছে বাধ্য হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করেছেন। দুর্বৃত্তরা তিষ্ঠোতে দিচ্ছিল না। তবে এতে বাদশাহের ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

বাদশাহ বলেন — পারস্যের শাহকে শুধু শুধু কষ্ট করতে হল। আমরা আর একটু আগে ব্যবস্থা নিলে ভাল হত। আপনারাই তখন বললেন, কান্দাহারের ব্যাপারটা মিটে যাক। অথচ উনি কবে থেকে বলছেন।

নিজামুল-মুল্‌ক দিল্লীতেই রয়েছে মাসখানেকের ওপর। সে মন্তব্য করে — এমন আর কি হয়েছে? নাদির শাহ নিজেই তো লিখেছেন, ওদের শায়েস্তা করে ফিরে যাবেন।

খান দউরান বলে — উনি আমাদের শত্রু নন বলেছেন বটে, তবে ফিরে যাবেন এমন কথা একবারও বলেননি। ওটা শুধু মুখের কথা হতে পারে।

একজন আমির বলে ওঠে — তাই বলে কি আপনি ধরে নিচ্ছেন উনি হিন্দুস্থান আক্রমণ করলেন?

— সেকথা জোর দিয়ে এখনো বলা যাচ্ছে না। তবে আশঙ্কা তো রয়েছেই।

আলি হামিদ খাঁ বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে — হিন্দুস্থানের ওপর চরম বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।

একসঙ্গে কয়েকজন আমির বিরক্তি প্রকাশ করে বলে — আপনি সব সময় দড়িকে সর্প ভ্রম করেন।

হামিদ খাঁ বলে — আপনাদের সর্পকে দড়ি বলে ভেবে নেওয়া মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে নড়াচড়ার প্রয়োজন হয় না। রাজধানীতে বসে অলস দিন যাপন করা যায়, আর দরবারে বসে লম্বা চওড়া কথা বলা যায়।

কয়েকজন বাদশাহের সামনে লাফিয়ে উঠে বলে — অত্যন্ত অপমানজনক কথা। আপনি নিজে কি করছেন? আপনি যাবেন নাদির শাহের বিরুদ্ধে?

— হুকুম হলেই যাব। আমার ধারণা এই মুহূর্তে আমাদের সীমান্তে বড় একদল সৈন্য পাঠালে ভাল হয়। কাবুলের নাসির খাঁকে এখনি সাহায্য পাঠানো প্রয়োজন।

কয়েকজন হেসে উঠে বলে — আবার সেই নাসির খাঁ? ওর তো তাহলে সুদিন আসবে।

তহবিল থেকে কিছুটা খসাতে পারবে।

হামিদ খাঁ বলে — বাইরের আক্রমণ প্রতিরোধ নাসির খাঁকেই করতে হবে। তাঁর প্রতিরোধ চূর্ণ করতে পারলে যে কোন শত্রু অনেক সহজে জালালাবাদ পর্যন্ত চলে আসবে।

সাদাত খাঁ আগের রাতে অযোধ্যা থেকে এসেছে। সে বলে — আক্রমণটা করছে কে? নাদির শাহ তো আক্রমণ করেননি।

হামিদ খাঁ-এর মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটে ওঠে। সে বলে — আপনিই সব চেয়ে ভাল বলতে পারেন। কারণ আপনি খাঁটি পারসিক। শৈশবে পিতার সঙ্গে এদেশে এসেছিলেন। পারস্যের শাহের মনোভাব আপনি যত তাড়াতাড়ি বুঝবেন নিজামুল-মুলক ততটা বুঝবেন না। কারণ তাঁর জন্ম মধ্য-এশিয়ায়।

নিজামুল-মুলক খোঁচাটা নীরবে হজম করল।

বাদশাহ মহম্মদ শাহ এতক্ষণ এই সব কথোপকথন বেশ উপভোগ করছিলেন। এবারে তিনি বলেন — তাহলে কি সাব্যস্ত হল?

আজিম আল্লাহ খাঁ এতক্ষণ একটিও কথা বলেনি। যদিও মনে মনে সে হামিদ খাঁকে সমর্থন জানিয়ে এসেছে। অনেক আগেই সে নাসির খাঁকে সাহায্য পাঠাতে বলেছিল। আজকের মত সেদিনও সবাই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল।

সে ক্ষোভ প্রকাশ করে বাদশাহকে বলে — কিছুই সাব্যস্ত হল না জাঁহাপনা। নাসির খাঁয়ের পতন আমরা বসে বসে দেখব। তারপর আরও কত কি যে দেখব কে জানে।

— আপনি কি বলতে চান কৌশলে আমাদের নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে?

— অতবড় কথা বলার দুঃসাহস আমার নেই। তাহলে দরবারেরই কাউকে সন্দেহ করতে হয়। আমার ধারণা নাদির শাহের এই অভিযানের গুরুত্ব কেউ বুঝতে পারছেন না, যতটা পেরেছেন হামিদ খাঁ। আমিও শুনেছি নাদির শাহ সাধারণ লোক নন।

বাদশাহ মহম্মদ শাহ ময়ূর সিংহাসন থেকে সেদিনের মত গাত্রোত্থান করে বলেন — আপনারা সবাই ভাবুন। কয়েকদিনের মধ্যে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

প্রাসাদে ফেরার পথে বাদশাহ দেখেন প্রাঙ্গণ দিয়ে পুত্র সুলতান আহমেদ ধীর পায়ে নহবত খানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে পুত্রকে দেখে মনে মনে তারিফ করেন তিনি তার দেহসৌষ্ঠবের জন্য। তবে দেহ অনুপাতে সে মজবুত নয়। কোথায় চলেছে সুলতান একা একা? ইয়ার দোস্তরা কোথায় গেল? সেকি নাদির শাহের কথা শুনেছে? মনে হয় না। ওসব দিকে তার আগ্রহ নেই। তার গর্ভধারিনী বলেন, নিজের বেগম থাকা সত্ত্বেও সুলতানের মন উড়ুউড়ু। নহবতখানার পেছনে কোন সুন্দরীর সন্ধান পেয়েছে নাকি? একটু কৌতুক অনুভব করেন বাদশাহ।

কদিন পরে দরবারে আবার নাদির শাহ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। সেদিন একটি পত্র আসে কাবুলের সুবাদার নাসির খাঁয়ের কাছ থেকে। শুনেই কয়েকজন হেসে ওঠে। আরও অনেকে সেই হাসির সঙ্গে যোগ দেয়। বিশেষ করে সাদাত খাঁ ও নিজামু-উল মুল্‌ক।

আজিম আল্লাহ্ খাঁ বলে — আপনারা সম্মানীয় ব্যক্তি। যে কোন বিষয়ে বাদশাহের সামনেও আপনাদের হয়ত হাসির হক আছে। তবে একটা কথা মনে রাখলে বোধহয় ভাল হয়। নাসির খাঁ কাবুলের সুবাদার হয়েছিলেন নিজের যোগ্যতায়। তিনি একটু চেষ্টা করলে এখানকার আমির-ওমরাহ্দের মত আরামে দরবারের শোভাবর্ধন করতে পারতেন। কিন্তু তা করতে চাননি।

সাদাত খাঁ বলে ওঠে — নাসির খাঁয়ের বাড়ি ওইদিকে। দিল্লীর ওপর আকর্ষণ কম।

— আপনার আকর্ষণ আরও কম হতো তাহলে। আপনি পারস্য থেকে এসেছেন। অযোধ্যায় গিয়ে ভালই আছেন। যখন তখন দিল্লীতে এসে হালচাল দেখে যেতে পারেন। নাসির খাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করতে পারেন। মাঝে মাঝে নিজামের পা ধরে টানতে পারেন।

সাদাত খাঁকে চটে উঠতে দেখে ময়ূর সিংহাসন থেকে বাহু ওঠে চুপ করার জন্য। তারপর বাদশাহ বলেন — পত্রটি পাঠ করা হোক।

নাসির খাঁ-এর পত্রের মর্মার্থ : নাদির শাহ এগিয়ে আসছেন। ফিরে যাওয়ার জন্য তিনি আসছেন না। আমি প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারতাম। কিন্তু আমার অবস্থা হল শীতের হাওয়ায় শুকিয়ে যাওয়া রক্তগোলাপের ঝোপের মত। আমার সৈন্যদলের অবস্থা আরও শোচনীয়। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ছিন্ন। তারা বহুদিন বেতন পায় না। সব চেয়ে বড় কথা তাদের মনোবল বলতে বোধহয় অবশিষ্ট কিছুই নেই। আমার একান্ত প্রার্থনা, পাঁচ বৎসরের যে বেতন প্রাপ্য রয়েছে, তার মধ্যে অন্তত এক বছরের বেতন মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। নইলে নাদির শাহ অগ্রসর হলে আমি বোধহয় কিছুই করতে পারব না।

দরবার স্তব্ধ। বাদশাহ প্রতিটি আমিরের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকেন, কেউ কোন আশার বাণী শোনায় কি না। কিন্তু সবাই মুখে কুলুপ এঁটে বসে রয়েছে।

তখন বাদশাহ খান দউরানকে উদ্দেশ করে বলেন — আপনি হচ্ছেন আমির উল-উমর। আপনি তো কিছু বলবেন। কারণ সমস্ত সৈন্যবাহিনীর অধিকর্তা হলেন আপনি।

খান দউরান তখন বলে — আমার মনে হয় নাসির খাঁ অযথা ভয় পেয়েছেন। নাদির শাহ নিজে লিখেছেন, অন্য কোন উদ্দেশ্য তাঁর নেই। হানাদারদের শাস্তি দিয়েই তিনি ফিরে যাবেন।

হামিদ খাঁ বলে ওঠে — সেই ভরসাতেই থাকুন।

উত্তেজিত খান দউরান বলে ওঠে — আপনি বলতে চান নাদির শাহ মিথ্যাবাদী?

আজিম আল্লাহ্ এবারে বলে — রাজনীতিতে আবার সত্যমিথ্যা। সৈন্য নিয়ে যে এগিয়ে আসছে তার কথায় বিশ্বাস করার মত মূর্খতা আমাদের না দেখানোই ভাল। পরে পস্তাতে হবে।

আমীর-উল-উমর এবারে বলে — দেশটা ক্ষুদ্র নয়। দিল্লী পৌঁছোতে অনেক নদ নদী পাহাড় পর্বত অতিক্রম করতে হয়।

হামিদ খাঁ একটু চড়া গলায় বলে — অর্থাৎ আপনি বলতে চান দেশের অন্যত্র যা হয় হোক দিল্লী বাঁচলেই হলো?

— না আমি তা বলতে চাইনি। আমি বলছি আর একটু দেখা যেতে পারে।

বাদশাহ হঠাৎ কেন যেন খান দউরানের ওপর নির্ভর করে বসেন। তিনি বলেন — বেশ তো, দেখাই যাক না আর কয়েকটা দিন।

আজিম আল্লাহ্ বলে — নাসির খাঁকে সাহায্যের কী হবে?

— হবে হবে, সব হবে।

হিন্দুস্থান জয় করে একটা অতুল কীর্তিস্থাপনের বাসনা নাদির শাহের যে একেবারে নেই তা কখনো নয়। তবে খ্যাতনামা হওয়াই মূল উদ্দেশ্য বললে ঠিক বলা হবে না। অজুহাত যদিও হানাদার দমন, প্রকৃত উদ্দেশ্য হল হিন্দুস্থানকে পদানত করে অনেক — অনেক অর্থ সংগ্রহ। এর মত ধনী দেশ আশেপাশে একটাও নেই। সেই অর্থের সিংহভাগ পেলে সারা জীবনের সমস্যা মিটে যাবে। তাঁর অন্তরের অন্তস্তলের বাসনা হল, তুরস্কের মধ্য দিয়ে বসফরাস প্রণালী অবধি যাওয়া এবং অধিকার করা। এর জন্য তুরস্কের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ লেগেই রয়েছে। ফলে প্রভূত অর্থব্যয়। কোষাগার নিঃশেষিত। এদিকে দেশের কয়েক স্থানে দুর্ভিক্ষ অবস্থাকে আরও সঙ্গীন করে তুলেছে। সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ উজবেকী আর আফগান। তারা সব কিছু করতে পারে। তবে অর্থের বিনিময়ে। সুতরাং অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ পাওয়া যাবে একমাত্র হিন্দুস্থানে। নইলে এতবড় দেশের বিপক্ষে অভিযান চালাতে দ্বিধা হওয়া স্বাভাবিক ছিল। সেই দ্বিধা মুকুরেই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এগিয়ে এসেছেন নাদির শাহ একেবারে কাবুলের দ্বারপ্রান্তে।

নাসির খাঁ বুঝল এই ভয়ঙ্কর বিপদেও বাদশাহ নির্বিকার! সে তখন কাবুলের কোতোয়াল শারজা খাঁয়ের সঙ্গে পরামর্শে বসে।

— বলুন শারজা খাঁ, এখন কি করব? আত্মসমর্পণ?

— আপনার অভিমত আগে জানতে চাই।

— আত্মসমর্পণের লজ্জা বহন করার ক্ষমতা আমার নেই। চেষ্টা করে দেখব কত সিপাহী সংগ্রহ করতে পারি। পারলে প্রতিরোধ গড়ে তুলব খাইবার গিরিপথে। নইলে আত্মবিসর্জন। সেটা অনেক শোভনীয় হবে।

শারজা খাঁ বলে — আমিও সাধ্যমত বাধা দেব। আমার সৈন্য বলতে এমন কিছু নেই। তবু দেখব চেষ্টা করে। কিন্তু তার আগে আমার একটা কর্তব্য রয়েছে। সেজন্য এখুনি আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে।

– জরুরী?

— খুবই জরুরী।

— বলতে অসুবিধা আছে?

— একটুও না। আগে হলে নিশ্চয় জানতেন। নিমন্ত্রিত হতেন সম্মানীয় অতিথি রূপে।

কিন্তু শুভ কাজটা আজকেই সেরে ফেলতে হবে। নইলে আর সময় পাব না। আমার পিতৃমাতৃহীন একমাত্র ভগিনীর সাদি আজ রাতেই দিতে চাই।

— ও। খুব ভাল কথা।

— আগে থেকে ঠিক ছিল। ভেবেছিলাম বেশ জাঁকজমক করে দেব। কিন্তু ভগিনী আমার হতভাগী।

— কে বলল হতভাগী? এমন দাদা যার রয়েছে তার চেয়ে ভাগ্যবতী আর কে হতে পারে? তাছাড়া সাদি সুখের হওয়া সব চেয়ে বড় কথা। আল্লার দোয়া আর সঙ্গে থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আপনি যান। যদি কখনো সুদিন আসে তখন অন্য কিছু করা যায় কি না ভেবে দেখা যাবে। তখন না হয় একটা উৎসবের আয়োজন করবেন।

শারজা খাঁ দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়। কাবুলেরই পাত্র। জমিজমা রয়েছে। ব্যবসা করতে চায়। খুব বুদ্ধিমান। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে মনে হয়। পাত্রের পিতাই মেয়েকে পছন্দ করেছেন। ভগিনী তো অপছন্দের নয়। সুন্দরী। শারজা খাঁ জানে তার দিন ফুরিয়ে আসছে। নাদির শাহ্ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা তার রয়েছে। যারা প্রতিরোধ করে তাদের এই পৃথিবীতে বিচরণ করতে দিতে ঘোর অনিচ্ছা নাদির শাহের।

পাত্রের পিতা এই অসময়ের সাদি মেনে নিয়েছে। সে নাদির শাহ্ সম্বন্ধে ভালরকম ওয়াকিবহাল। আর জানে শারজা খাঁয়ের ওপর কতখানি দায়িত্ব। সে শারজা খাঁকে কথা দিয়েছে, সাদির পরই দুজনকে সে কাবুল থেকে অনেক দূরে তাদের নিজস্ব গ্রামে পাঠিয়ে দেবে যেখানে যুদ্ধের আঁচ লাগবে না।

ভগিনী শাকিনা ভ্রাতার বুকে মাথা রেখে অনেকক্ষণ কাঁদল। সে একটু শান্ত হলে নিয়ম মাফিক শাদি হল। দিনের বেলায় সময় করে উঠতে পারেনি শারজা খাঁ। তাই রাতের অনুষ্ঠান।

বাইরে শকট প্রস্তুত। অনুষ্ঠানের পর রাতের অন্ধকারে রওনা করে দেওয়া হল নবদম্পতিকে। শারজা খাঁ ভাবে সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করলে আনুষ্ঠান থেকে শুরু করলে সব কিছুই অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। কাবুলের কোতোয়াল হওয়া সত্ত্বেও তার একমাত্র ভগিনীর এমন বাহুল্য-বর্জিত বিবাহ শহরের কেউই কল্পনা করতে পারত না। কিন্তু পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। বিশেষ করে নাদির শাহ্ যখন শিয়রে।

নাদির শাহ্ কাবুলের আরও নিকটে এগিয়ে আসেন। স্থানটির নাম বারিকাব। নাসির খাঁ বাদশাহের অনুগ্রহের অপেক্ষায় না থেকে অনেক কষ্টে অনেক পরিশ্রমে বিশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে। অন্তরের তাগিদেই এই অতি কঠিন কাজ সম্ভব হল তার পক্ষে। নিজের দেশ বিনাবাধায় বিদেশী দ্বারা লাঞ্ছিত হতে দেখা অসহ্য। নিশ্চিত পরাজয়ের কথা জেনেও সে তার সৈন্যদলকে খাইবার গিরিপথের মুখে নিয়ে গিয়ে রাখার জন্য রওনা হল। আল্লাহ সদয় হলে এই সীমিত শক্তি দিয়েও নাদির শাহের বাহিনীকে রুখে দেওয়া সম্ভব হতে পারে। কাবুলে আসার ঘোরাপথও রয়েছে। তবে সেভাবে আসা সময়সাপেক্ষ। সিয়া চোব, চিনা ও চোরা

হয়ে আসতে পারে ওরা।

বিদায়ক্ষণে শারজা খাঁ এসে দেখা করে বলে — আমি নিজের মত বাধা দেব যাতে আপনার কাছে আসতে দেরি হয় ওদের।

— সেই ভাল। আপনার এই সামান্য সংখ্যক সৈনা আমার বাহিনীকে এমন কিছু পরিপুষ্ট করতে পারবে না।

শারজা খাঁ বিদায় নেয়। নাসির খাঁ বুঝতে পারে তার পক্ষে জীবিত অবস্থায় কাবুলে প্রত্যাবর্তনের ক্ষীণতম সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। আজ যদি মোগলদের সেই সুদিন থাকত, তাহলে নাদির শাহ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারতেন না হিন্দুস্থান অভিমুখে সৈনা চালনা করার কথা। কিন্তু আজ অতি দুর্দিন। মোগলদের কাছে কাবুল এবং অন্যান্য সীমান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এককালে। তখন দেশের অভ্যন্তরের রাজ্যগুলোর চেয়ে কাবুল অনেক বেশি প্রাধান্য পেত। সৈন্যরা সময় মত তাদের বেতন পেত। খাইবার গিরিপথের অসীম গুরুত্ব বাদশাহেরা মনে মনে অনুভব করতেন। আর আজ? বাদশাহের নিজের কোন ক্ষমতাও নেই ব্যক্তিত্বও নেই। যেভাবে চালনা করা হচ্ছে, সেইভাবে চলছেন। যারা চালনা করছে তারা কতখানি বিশ্বস্ত সেই বিষয়েও সন্দেহ রয়েছে যথেষ্ট। দরবারে নানা উপদল। মধ্য এশিয়ার উপদল, পারস্যের উপদল, তুরস্কের উপদল, হিন্দুস্থানী উপদল — কত কী যে আছে। সব খবরই রাখে নাসির খাঁ। কে কত সুবিধা আদায় করতে পারে বাদশাহের কাছথেকে তাই নিয়ে প্রতিযোগিতা। বাদশাহের তাঁবে হয়ত দেখা যাবে একজন আমিরও নেই। দিল্লীর নিজের হাতে সযত্নে গড়া এই ছন্নছাড়া ভাগ্যকে কাবুলে বসে কতটা আর জোড়া লাগানো যায়? ওরা তো কাবুলকে তুচ্ছ করে। এমনকি ভিখারি বলে ঠাট্টাও করে বলে শোনা যায়।

তবু সৈন্যবাহিনী নিয়ে যখন নাসির খাঁ যাত্রা করল তখন শুভেচ্ছা জানাতে দলে দলে কাবুলবাসী পথের দুপাশে জমায়েত হল। নাসির খাঁ জানে, তারা বড় অসহায় এবং অরক্ষিত আজ। শুভেচ্ছা জানানো ছাড়া আর কিছু করার নেই তাদের।

শারজা খাঁ তার অশ্বারোহী দল নিয়ে দ্রুত এগিয়ে গিয়েছে। কিছু আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে তার। সে জানে ফিরে আসা আর হবে না। তাই ভগিনীর সাদি অমন তাড়াহুড়ো করে দিল। নিজের বিবি নিঃসন্তান অবস্থায় গত বছর মারা গিয়েছে। ঘরে অবিবাহিতা ভগিনীই ছিল শুধু। মানুষটা খাঁটি। মনে মনে নাসির খাঁয়ের ইচ্ছা ছিল তাকে সংসারী করার জন্য নিজের ভগিনীর কন্যার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করবে সময় মত। তা আর হল না। হবেও না। নিশ্চিতভাবেই হবে না। কারণ সে নিজেও চলেছে অনিশ্চিতের পথে। নাদির শাহের বাহিনী শুধু বিপুল নয়, অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ। কিন্তু তার নিজের বাহিনী তেমন শিক্ষাই পায়নি। অনেকে যুদ্ধের গোড়ার কথাও জানে না। হাতে একটা করে অস্ত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে সদ্য, এমন সৈন্যসংখ্যাও কম নয়। তবু তাদের নিয়েই প্রতিরোধের প্রাচীর তোলার চেষ্টা করতে হবে। নিশ্চেষ্ট অবস্থায় আত্মসমর্পণের মত বেদনাদায়ক আর কিছু নেই একজন সেনানায়কের পক্ষে।

কাবুলের সন্নিকটে বারিকাব-এ নাদির শাহের ছাউনি। এগিয়ে গেলেই হল। তবে হিন্দুস্থানের আরও অভ্যন্তরে প্রবেশের আগে বড় বাধা খাইবার। এখানে নাদির শাহ খবর পেলেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রেজা কুলি তাঁর নির্দেশমত মধ্য এশিয়ার বল্‌ক্‌ অঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করেছে। মনে মনে খুব সন্তুষ্ট হন তিনি। সবে পঁচিশ বছরে পা দিয়েছে, এখনি সে একজন কুশল যুদ্ধবিশারদ। বল্‌কের বিদ্রোহ দমন করে সে থেমে থাকেনি। সেখানে বলতে গেলে পিতার নির্দেশ অমান্য করেছে। কারণ নাদির শাহের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল বল্‌কের বেশি এক কদমও নয়। সেখান থেকে ফিরে বাহিনী নিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে হবে। কিন্তু সে বুখারার দিকে এগিয়ে গিয়ে শুলুকের কেল্লা অবরোধ করেছে। অল্প বয়সে এমন ঝোঁক থাকে। তাঁরও ছিল। তবে রেজাকে ফিরিয়ে আনতে কদিন পরে লোক পাঠাতে হবে। তার আগে হিন্দুস্থানের অভ্যন্তরে আর একটু অগ্রসব হওয়া প্রয়োজন। একটা নির্দিষ্ট স্থানে রেজাকে দেখা করতে বলতে হবে।

দ্বিতীয় পুত্র মূর্তাজা কুলি সঙ্গে রয়েছে। রেজার কথা উল্লেখ করে নাদির শাহ্ প্রশ্ন করেন — কিরকম বুঝছ?

— খুব ভাল। আমি জানি ও খুব ভাল। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, ভীষণ বুদ্ধি।

— তোমার?

অপ্রস্তুত মূর্তাজা বলে — নিজের কথা আমি কি করে বলব?

— তোমার বয়সও একুশ হয়েছে। অভিজ্ঞতা এই বয়সে ভালই হয়েছে। আমার ইচ্ছা খাইবার জটটা ছাড়িয়ে তোমাকে কিছু কিছু ভার দেব।

— এখনি দিন না। আমি প্রস্তুত।

— এই সঙ্কীর্ণ গিরিপথ অত্যন্ত বিপজ্জনক।

— সেখানেই আমার পরীক্ষা আরও ভাল হবে।

এভাবে নাদির শাহের সঙ্গে কিছুদিন আগে সে কথা বলতে পারত না। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র তাদের পরস্পরকে অনেক ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে। সে পিতার নিষ্ঠুরতা স্বচক্ষে দেখছে কিছু কিছু। তবু তাঁকে খুব পছন্দ তার। পিতা তার আদর্শ। যুদ্ধ করতে হলে কোমল মন নিয়ে চলে না।

নাদির শাহের ইচ্ছা নেই এই গিরিপথের মধ্যে পুত্রকে কোন ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে। তাই নিজে থেকে প্রসঙ্গটা চেপে যান। কারণ গিবিপথে যে কোন মুহূর্তে ওপর থেকে প্রস্তর বর্ষণ হতে পারে। সেখানে যুদ্ধ কৌশল দেখানোর সুযোগ থাকে না। প্রশস্ত প্রান্তরেই প্রথম সুযোগ দেওয়া উচিত পুত্রকে।

সেই সময় একজন গুপ্তচর এসে উপস্থিত হয়। কাবুল থেকে এসেছে সে।

— কি খবর?

— শারজা খাঁ কাবুল ছেড়ে এগিয়ে এসেছেন।

— সেই খবর জানা আছে আমার।

— সবাই অশ্বারোহী।

— তাও নতুন খবর নয়। কয়েকদিনের মধ্যে সে আমাদের ব্যতিব্যস্ত করতে শুরু করবে বলে মনে হয়। নাসির খাঁয়ের খবর কি ?

— তিনিও কাবুল ছেড়েছেন।

— কত লোক ?

গুপ্তচর একটু আমতা আমতা করে। সঙ্গে সঙ্গে নাদির শাহের হস্তধৃত কুঠারের আঘাতে তার মস্তক ভূলুণ্ঠিত হয়।

পুত্র মূর্তজার ভেতরটা ঝাঁকি দিয়ে ওঠে। তবে সঙ্গে সঙ্গে সে সামলে নেয়।

পিতাকে সে বলে — আরও কিছু খবর পাওয়া যেত।

— হ্যাঁ, তবে সে খবর সঠিক হত না। কারণ কাবুলের ভেতরে বেশিক্ষণ থাকতে ভয় পেয়েছিল এ। অন্যেব মুখের খবর শোনাচ্ছিল।

আরও চর কাবুলে পাঠানো হয়েছে। তারাও আসবে টাটকা খবর নিয়ে। একজনের ওপর নির্ভর করার মানুষ নাদির শাহ নন।

একটু পরে দুইজন মুর্দাফরাস যন্ত্রচালকের মত এসে নির্বিকার চিত্তে খণ্ডিত দেহটি একটা ঠেলার ওপর তুলে দিয়ে চলে গেল। তাদের অমন অনেক দেখার অভ্যাস আছে নাদির শাহের আশেপাশে। তাছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নাদির শাহ নাসির খাঁয়ের বাহিনীর সঠিক অবস্থান জানার আগেই সেই রাতে আচম্বিতে শারজা খাঁ তার অশ্বারোহী দল নিয়ে প্রথম আঘাত হানল। নাদির শাহ্ এত দ্রুত কোন আক্রমণ প্রত্যাশা করেননি। মনে মনে ক্ষেপে উঠলেন তিনি। হিন্দুস্থানের ভূমিতে প্রথম সংঘাতেই তিনি মানসিক দিক দিয়ে পরাজিত। মনে মনে ঠিক কবে নেন, পরদিন কোন্ কোন্ গুপ্তচরের কতল করা হবে।

শারজা খাঁ বেশিক্ষণ আক্রমণ চালায়নি। কিন্তু তবু অপ্রস্তুত অবস্থায় সেনাবাহিনীকে পেয়ে অনেক ক্ষতি করেছে। বেশ কিছু হতাহত হয়েছে। সেই তুলনায় তাদের এমন কিছু হয়নি। তারা পালিয়েছে। ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য আসেনি। তবে আবার আসবে। এভাবে বারবার এলে অগ্রসর হওয়া মুশকিল হয়ে যাবে নাদির শাহের।

শারজা খাঁ আরও কয়েকবার আক্রমণ করল। তার আক্রমণের জন্য নাদির শাহের মূল অভিযান বিলম্বিত হতে থাকে। শারজা খাঁ আরও একটা ক্ষতি করেছে। সে তাঁর সব চেয়ে অভিজ্ঞ আর তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী গুপ্তচর তাজ-উদ্দিন খাঁকে হত্যা করেছে। কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে তাজ-উদ্দিনের প্রকৃত পরিচয় শারজা খাঁয়ের কাছে ফাঁস করে দিয়েছিল। মনে মনে ফুঁসতে থাকেন নাদির শাহ্। শারজার নিস্তার নেই। তাকে নিশ্চিহ্ন না করে এগিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়। কিছু করতে না পারলে খাদ্যসামগ্রীও লুঠ করতে পারে পেছন থেকে। গিরিপথে প্রবেশের আগে সেই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া প্রয়োজন। নানা দিকে অশ্বারোহী বাহিনী পাঠাতে থাকেন তিনি। শারজা এতদিন গোপনে থাকতে পারত না। কিন্তু এখানকার পাহাড় পর্বত নদী-নালা পথ-ঘাট তার নখদর্পণে। কোথায় কখন আক্রমণ শানিয়ে কিভাবে লুকোতে

হবে, আগে থেকেই সে ঠিক করে নেয়। তাই অশ্বারোহী বাহিনীকে অনেক ভাগে ভাগ করে নাদির শাহ চারদিকে ছড়িয়ে দেন। তাতে কাজ হয়। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে নাদির শাহের বড় একটি দলের মুখোমুখি হয়ে পড়ে সে। যুদ্ধ শেষ হতে হতে অন্ধকার নেমে আসে। শারজার সৈন্যের চেয়ে নাদির শাহের সৈনদল সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল। তাই ধীরে ধীরে শারজার অশ্বারোহীরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। তাদের প্রায় সবাই নিহত কিংবা আহত হয়। আরোহীবিহীন অশ্বেরা কিছু বুঝতে না পেরে কেউ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেয়।

নাদির শাহ মৃত কিংবা আহত অবস্থায় শারজা খাঁকে খুঁজে বের করার হুকুম দেন। সারা রাত ধরে অনুসন্ধান চলল। ভোরের আলো ফুটলো। বেলা বাড়তে লাগল। শারজা খাঁয়ের মৃতদেহের দেখা মিলল না। মিলল তার আহত অশ্বটিকে। আসলে শারজা খাঁকে মুষ্টিমেয় যে দু'তিনজন চিনত, তাদের সবার মৃত্যু হয়েছে। তাই ওই অসংখ্য মৃতদেহগুলির মধ্যে শারজার দেহটি আছে কি না বোঝা সম্ভব হল না। ভবিষ্যতে সে যদি নতুনভাবে আক্রমণ করে শুধু তখনই বোঝা যাবে যে সে জীবিত। নইলে নয়। তার অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় থেকেই যাবে।

নাসির খাঁ-এর অবস্থান সম্বন্ধে নাদির শাহ সঠিক সংবাদ পান কদিন পরেই। কৌশলী নাসির খাঁ কাবুল রক্ষার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানটি নির্বাচন করে নিয়েছে। স্থানটি হল জামরুদ আর আলি মসজিদ থেকে কিছুটা উত্তর-পশ্চিমে খাইবারের মুখে। স্বাভাবিকভাবে গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়ে তার দিকে অগ্রসর হওয়ার অর্থ আত্মহনন। শোনা গিয়েছে তার সৈন্যসংখ্যা বিশহাজার। খুব কম নয়, আবার খুব বেশিও নয়। নাদির শাহের সৈন্যসংখ্যা কয়েকগুণ বেশি। তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যদল অপ্রতিরোধ্য। তাঁর বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রও আধুনিক। কারণ বহুদিন ধরে তুরস্ক ও পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তিনি ক্রমাগত তাঁর বাহিনীকে সব দিক দিয়ে উন্নত করে তুলেছেন। তবু নাসির খাঁ মোক্ষম স্থানটিতে ঘাঁটি করেছে। সোজা পথে তার দিকে এগোনো যাবে না। বিশাল বাহিনী নিয়ে নাদির শাহ কয়েকদিন সঙ্কীর্ণ গিরিপথে অপেক্ষা করতে থাকেন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণয়ের জন্য। বাহিনীর মধ্যে সামান্য একটু চঞ্চলতা দেখা দেয়। চারদিকে স্তব্ধতা বিরাজ করে। সবাই দেখল নাদির শাহও কেমন একটু চিন্তিত। তাঁর মধ্যেও অনিশ্চয়তা। অসুবিধা সৃষ্টি করল তাঁর হারেম। তারা এতবেশি ভীত হয়ে পড়ে যে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। কান্নাটা ছোঁয়াচে রোগের মত। একজনকে ধরলে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে অন্য নারীদের মধ্যে।

নাদির শাহ চিৎকার করে ওঠেন — এসব কি হচ্ছে? ওরা কাঁদছে কেন?

একজন সভয়ে বলে — বোধহয় ভয় পেয়েছেন হুজুর।

— ভয় পাওয়ার কি হল? এ যে পাল্লা দিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

হারেমের দিকে কারও যাওয়ার নির্দেশ নেই। গেলেই মৃত্যু একথা সবাই জানে। তাই শাহের চিৎকারেও তারা তৎপরতা দেখাতে পারে না।

অবশেষে নিজেই তিনি ছুটে যান নারীদের মধ্যে। একজন ক্রন্দনরতা সুন্দরীর বোরখা

তুলে মুখের সামনে মুখ এনে প্রশ্ন করেন — কাঁদছ কেন?

সে অসহায়ভাবে কাঁদতে কাঁদতে পার্শ্ববর্তী রমণীকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

— ও কিছু বলেছে?

— না।

— তবে?

— কাঁদছে।

— কি জন্যে কাঁদছে?

— জানি না।

যাকেই প্রশ্ন করেন নাদির শাহ, কেউ বলতে পারে না কেন কাঁদছে। তখন নাদির শাহ তাঁর কুঠার তুলে ধরে হঠাৎ চিৎকার করে বলে ওঠেন — কান্না বন্ধ না হলে সবাইকে কাটতে শুরু করব। তাঁর কণ্ঠস্বর বজ্রের মত গিরিপথকে কাঁপিয়ে দেয়। একটু থেমে আবার কান্না শুরু করে দেয় অনেকে। সেই সময় শাহ দেখতে পান অদূরে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের আড়াল থেকে একজন সৈনিক লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখছে আর হাসছে।

তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে ওঠেন — তোমাদের কি করব এখুনি দেখাচ্ছি।

ছুটে গিয়ে তিনি সেই লোকটিকে চেপে ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে হারেমের সামনে নিয়ে আসেন। তারপর বলে ওঠেন — এই দেখ।

কুঠারাঘাতে লোকটির ছিন্ন মুণ্ড নীচে পড়ে ঢালু পথে গড়াতে থাকে।

হারেম মুহূর্তে নীরব।

পৃথিবীতে যুগে যুগে বিশ্বাসঘাতকের অভাব কখনো ঘটেনি। ঘটলে ইতিহাস এত বৈচিত্র্যময় হত না। ইতিহাসের সম্ভাব্য গতি এক একজন বিশ্বাসঘাতকের কারসাজিতে সম্পূর্ণ বিপরীত খাতে প্রবাহিত হয়। ওই গিরিখাদের মধ্যেই নাদির শাহ ভাগ্যক্রমে এমন একজন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেয়ে গেলেন।

লোকটি একটি উচ্চস্থানে বৃক্ষের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে নাদির শাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাকে ওভাবে দেখে নাদির শাহ চমকে ওঠেন। ভাবেন নাসির খাঁ চর পাঠিয়েছে খোঁজখবর নিতে। তাঁর নির্দেশে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্রের নল তার দিকে তাক করে। সে সঙ্গে সঙ্গে দুহাত তুলে চেঁচিয়ে বলে ওঠে — আমি আপনার কাছে যেতে চাই। গুলি করবেন না।

বন্দুকের নল নিম্নাভিমুখী হয়। লোকটি পাহাড়ের গা বেয়ে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করে। নাদির শাহ অপেক্ষা করেন। লোকটি নীচে নেমে কিছুক্ষণ হাঁপাতে থাকে। প্রথম দর্শনে বোঝা যায় আদৌ শক্তসমর্থ নয় সে। তবু এত কষ্ট করে শত্রুদের কাছে সে এল কেন? উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়।

সে নাদির শাহের সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে কুর্নিশ করে। নাদির শাহ বলেন — তুমি আমাকে চেন?

তাঁর হাতের কুঠার দেখিয়ে বলে — ওইটা দেখে চিনেছি।

— বুঝলাম। এবারে বল।

— আমি সাতদিন আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।

নাদির শাহ্ মনে মনে রেগে ওঠেন। লোকটা কারও নজরে পড়ল না তবু?

— আসল কথা বল।

— এভাবে সোজা পথে গেলে আপনি শেষ হয়ে যাবেন। নাসির খাঁ সাধারণ লোক নয়। সে খুব ভাল সৈন্য পবিচালনা করে।

— কে তুমি?

— আমির খাঁ আমার নাম।

— নামটা তো ভালই। কোথায় থাক?

— আলি মসজিদে।

— কেন এসেছ?

— আপনাকে সাহায্য করতে হুজুর।

— এই সখ হল কেন? এ তো অদ্ভুত সখ।

— নাসির খাঁকে জব্দ করতে চাই। ও আমার অনেক ক্ষতি করেছে।

— বিনা কারণে?

— হ্যাঁ।

নাদির শাহ বুঝতে পারেন, যারা দেশের ক্ষতি করতে চায় তারা কী সাংঘাতিক চিজ। সুতরাং নাসিব খাঁ যাই করুক না কেন, সঙ্গত কারণেই করেছে। তিনি বলেন — কিভাবে আমাকে সাহায্য করবে?

— আপনাকে ঘোরাপথে নিয়ে যাব নাসির খাঁয়ের ঠিক পেছনে। টেরও পাবে না সে।. তখন আপনি ওকে সহজে আক্রমণ করে কাবু করে ফেলতে পারবেন। আমাদের গ্রাম আলি মসজিদ থেকে সামান্য দূরে রয়েছে নাসির খাঁ।

নাদির শাহ ভাবেন, এই সব মানুষের সাহায্যে কার্যোদ্ধার করেই তাদেব শেষ কবে দিতে হয়। অন্তত শেষ করে দেওয়াব প্রলোভন জাগে। তবে এই আমির খাঁকে তিনি কিছু বলবেন না। কারণ ঘোর দুশ্চিন্তা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পথ এ বাতলে দিয়েছে। কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত।

একদিনের জায়গায় তিন দিন কেটে গেল লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে। অত্যন্ত দুর্গম পথ। কোথাও কোথাও পর্বত উল্লঙ্ঘন করতে হল হামাগুড়ি দিয়ে। এক এক সময় মনে হতে লাগল বাহিনীর মনোবল এই বুঝি ভেঙে খান খান হয়ে গেল। হল না শুধু নাদির শাহের জন্য। তিনি সর্বদা বাহিনীর সামনে আমির খাঁয়ের কথা অনুযায়ী পথনির্দেশক হয়ে চললেন। কামিজের থলি থেকে মাঝে মাঝে শুধু ভাজা মটর মুখে ছুড়ে ফেলতে থাকেন। বাহিনীর অন্য সবাই সময় মত ক্ষুন্নিবৃত্তি করে নিয়েছে। অভিযানের সময় তাঁর পবিপাটি হয়ে বসে খাওযার অভ্যাস নেই।

ভাজা মটরই ভরসা।

অবশেষে যখন তিনি আলি মসজিদে পৌঁছোলেন তখন প্রথম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। দূর থেকে থেকে দেখা গেল নাসির খাঁ অত্যন্ত সতর্কভাবে ওত পেতে রয়েছে। নাদির শাহের মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। তাঁর উপস্থিতির সংবাদ যাতে নাসির খাঁ বুঝতে না পারে তার জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা নিলেন তিনি। সন্ধ্যা হয়ে আসছে বলে, এই মুহূর্তে শত্রুদের সঙ্গে মোকাবিলায় লিপ্ত হওয়া সমীচীন হবে না। পরদিন প্রত্যুষেই হবে প্রকৃষ্ট সময়।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে যখন নাসির খাঁ পশ্চাৎদিক থেকে আক্রান্ত হল তখন তার এবং তার সিপাহীদের বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই অনেকটা সময় চলে গেল। সামনের দিকে তাদের দৃষ্টি এত বেশি তীক্ষ্ণ ছিল যে পশ্চাদ্ভাগ কিছুটা অবহেলিত ছিল। তার জন্য নাদির শাহের সুবিধা বেশি হল। তবু নাসির খাঁ অল্পেতেই ভেঙে পড়ার মত ব্যক্তি নয়। লৌহ-কঠিন তার মনোবল। সেই মনোবল তার বাহিনীর মধ্যেও সংক্রামিত হল। তাই যুদ্ধ চলল অনেকক্ষণ ধরে। শেষ পর্যন্ত নাদির শাহ জয়ী হলেও তাঁকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করতে হল। নাসির খাঁ আহত এবং বন্দী হল। সে দেখল অদূরে একটি খোলা জায়গায় তাকে রাখা হল। নিজের ভবিষ্যত সম্বন্ধে এত বেশি নিশ্চিত সে যে এই নিয়ে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা হল না তার। শুধু রক্তাল্পতার জন্য নিজেকে বড় নিস্তেজ বলে মনে হতে লাগল। আর সর্বাঙ্গ বেদনা-জর্জরিত।

নাসির খাঁ লক্ষ্য করে নাদির শাহ তার দিকে একবারও এলেন না। ক্ষতস্থানগুলোর পরিচর্যা করতে পারলে যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব হত। কিন্তু তেমন আশা করা বাতুলতা। তাকে যে এখনো জীবিত রাখা হয়েছে এটাই যথেষ্ট। কিন্তু কেন? তার মনে হতে লাগল যন্ত্রণায় অনেকে অবচেতন হয়ে পড়ে। তার যন্ত্রণা নিশ্চয় ততটা নয়। হলে ভাল হত।

বেলা বাড়তে গায়ে সূর্যের প্রখর রশ্মি এসে লাগে। দুচারটে মাছির আনাগোনা হতে থাকে। সে সেইভাবে হাত পা নাড়াতে পারছে না। মাছি নির্বিঘ্নে ক্ষতস্থানগুলোতে এসে বসেছে। এভাবে পড়ে থাকলে ক্ষতস্থান দূষিত হয়ে উঠবে। হয়ত সেটাই উদ্দেশ্য নাদির শাহের। কষ্ট দিয়ে মারতে বোধহয় ভালবাসে।

কিছুক্ষম আচ্ছন্ন হয়ে থাকে নাসির খাঁ। আবার একটু হুঁশ হয়। দেখতে পায় নাদির শাহ সামনে দাঁড়িয়ে। শুধু সে নয়, কাবুলের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে অদূরে।

নাদির শাহ বলেন — এঁরা সবাই এসেছেন কাবুলকে রক্ষা করতে। নইলে আমি তো ধ্বংস করে দেব।

নাসির খাঁ চুপ করে থাকে।

— চুপ করে থাকবেন না। আপনি হলেন কাবুলের শাসনকর্তা। আপনার মতের মূল্য আছে। তবে আমি আপনাদের বাদশাহকেও পত্র দিচ্ছি। এতবার খবর পাঠানো সত্ত্বেও তিনি কোনরকম উচ্চবাচ্য করছেন না। তাঁর প্রশাসনিক প্রক্রিয়া কি একেবারেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে? তাঁকে আমি জানাতে চাই আমি শত্রু হয়ে এদেশে আসিনি। কিন্তু তাঁর নীরবতায় আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে।

নাসির খাঁ ভাবে বিরুদ্ধপক্ষের আহত সেনানায়ককে অযত্নে অবহেলায় এভাবে ফেলে রাখা সখ্যতার নিদর্শনই বটে। সে বুঝতে পারে তার মধ্যে অফুরন্ত জীবনীশক্তি থাকলে জীবিত থাকতে পারে, নইলে নয়।

নাদির শাহ আর একটিও কথা না বলে স্থানত্যাগ করেন। স্থানীয় ব্যক্তিরা কাছে ঘেঁষতে ইতস্তত করে। শেষে একজন এসে বলে — এভাবে পড়ে থাকবেন?

— আমি তো জানি না।

— জিজ্ঞাসা করব?

— আপনার অভিরুচি।

— কিন্তু আর কিছুক্ষণ পরেই তো পচন ধরবে।

নাদির খাঁ চুপ করে থাকে।

— আমি নাদির শাহকে গিয়ে অনুরোধ করব আপনার জন্য।

কথাটা অন্য একজন শুনে ফেলে বলে — খেপেছ? কাবুলকে শ্মশান করে দেবে। চুপ চাপ চল।

ব্যক্তিটির নাম ফকির খাঁ। নাসির খাঁয়ের অপরিচিত নয়।

নাসির খাঁ জানে, তার বাহিনীর অধিকাংশ জামরুদ হয়ে পেশোয়ারের দিকে পালিয়েছে তাকে ফেলে রেখে। তাই সে মৃত্যু নিশ্চিত বুঝে নিশ্চিন্তে চোখ বন্ধ করে। মাঝে মাঝে একটা তন্দ্রাভাব তাকে আচ্ছন্ন করে। তারপর একসময় সে অচেতন হয়ে পড়ে। সেই সময় নাদির শাহ তার কাছে একজন হাকিম পাঠান।

উজির কামরুদ্দিন খাঁয়ের এক জামাতা গাজীউদ্দিন খাঁয়ের সঙ্গে বাদশাহ মহম্মদ শাহের পুত্র সুলতান আহমেদের অল্প পরিচয়েই দোস্তি জমে উঠেছে। দোস্তির যোগসূত্র যদি নারী ও কমবেশি সুরা হয় তাহলে জমে উঠতে একটুও দেরি হয় না। দুইজনেরই ঘরে বেগম রয়েছে, তবু নানান ফুলের মধু পান করতে ইচ্ছা হয়। তাতে একঘেয়েমী কাটে। সুলতান আহমেদ শত হলেও শাহজাদা। তার পক্ষে নারীর খোঁজে রত হওয়া অতটা শোভনীয় নয়। তাই গাজী তাকে এই বিষয়ে সাহায্য করে। তাছাড়া শাহাজাদার পক্ষে প্রাসাদের বাইরে রজনী অতিবাহিত করা অসুবিধা। কেউ দেখে ফেললে, সঙ্গে সঙ্গে রটে যাবে, অগ্নিস্পর্শে সুরা যেমন দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে, সেই একই গতিতে। তাছাড়া জীবনের ঝুঁকি রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে সুলতানই হবে সিংহাসনের পরবর্তী দাবিদার। তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারলে অন্য অনেকের সুবিধা। সেই দাবিদাররা সবাই তার আত্মীয় — দূরের কিংবা নিকটের। তাই কোন সুন্দরীকে সংগ্রহ করতে পারলে একটি মহল নির্দিষ্ট করা হয়েছে শাহজাদার জন্য। তবে গাজীর ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। সে তো আর বাদশাহজাদা নয়। না হলে কি হবে, সুন্দরীদের আস্বাদন প্রথমে সেই পায়।

তারপর সুলতান আহমেদ-এর মহলে পৌঁছোয়। মালিকা-আল-জুমানির কানে অনেক কিছু যায়, তিনি না জানার ভান করে থাকেন। শাহজাদা তো আর সাধারণ ব্যক্তি নয়। তাঁর জীবন যাত্রার ধরন-ধারণ সম্পূর্ণ অন্য রকম তো হবেই।

শাহজাদার সর্বশেষ সংগ্রহ খুরশিদা বেগম। শাহজাদা তার রূপে মোহিত। আগ্রার নিকটবর্তী কোন গ্রামে নাকি তার বাড়ি। বয়স খুবই কম। এর মধ্যে এত দূর এসে পৌঁছলো কি করে জানার আগ্রহ নেই সুলতান আহমেদের। তবে রূপের জেল্লা যে অন্যতম কারণ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই তাঁর। সব চেয়ে বড় কথা তাকে পেতে গাজীউদ্দিন খাঁ-এর সাহায্য প্রয়োজন হয়নি। একজন অল্পবয়সী আমির, উচ্চাশা যার খুব বেশি, সেই রইস খাঁ নিজে উদ্যোগী হয়ে সুলতান আহমেদকে খুশি করতে চেয়েছে খুরশিদাকে অর্পণ করে। গাজীউদ্দিন-এর ওপর শাহজাদা মনে মনে খুব একটা সন্তুষ্ট নয় ইদানীং। কয়েকজন সুন্দরীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে কথা বলে সে বুঝতে পেরেছে গাজী যাদের নিয়ে আসে এই মহলে তাদের মধ্যে অন্তত অনেককেই আস্বাদন করে নিয়ে আসে। এতে তার আত্মসম্মানে প্রচণ্ড ঘা লেগেছে। তবু সে থাকায় সুন্দরীদের আসার পথ মসৃণ থাকে বলে তাকে বিতাড়িত করেনি।

রইস খাঁকে শাহজাদার প্রথম প্রশ্ন ছিল — আপনি তো আমার চেয়েও তরুণ। এই সুন্দরীকে নিশ্চয় স্পর্শ করেছেন।

— না।

— করেননি? আশ্চর্য! আপনি কি পুরুষ নন?

— পুরুষ বলেই তো দূরে থেকেছি শাহজাদা। পুরুষরা যেমন ভোগবিলাসে মাতোয়ারা হতে পারে, তেমনি দৃঢ়ও হতে পারে। যারা পারে না, তারা ভেড়া। তাদের ওপর আস্থা রাখা বিপজ্জনক।

— হুঁ। বেশ ভাল ভাল কথা বলছেন দেখছি। আপনি কি বলতে চান এই বয়সেও এ অনাঘ্রাতা?

খুরশিদা অদূরে দাঁড়িয়েছিল। অনুচ্চ কণ্ঠের কথা তার কর্ণগোচর হওয়ার কথা নয়। তবে সে বুঝতে পারছিল, তাকে নিয়েই আলোচনা। কাকে নিয়েই বা হবে। আশেপাশে যতটুকু দেখেছে অবাক হয়েছে এবং বুকটা দুরু-দুরু। শাহজাদাকে সে দেখে একটু যেন ভরসা পেল। তার মুখমণ্ডলে ক্রূরতার কোন রেখা নেই। বড় বেশি পেলব। ভয়ও নেই, আকর্ষণও নেই ওই মুখে।

রইস খাঁ বলে — অনাঘ্রাতা কি না আমি বলতে পারব না। আপনি নিজেই সব চেয়ে বেশি বুঝতে পারবেন। বয়স কত হবে? মনে হয় ষোল-সতেরো। জিজ্ঞাসা করলে হয়।

খুরশিদাকে শাহজাদা কাছে ডাকেন। সে এগিয়ে আসে। তার চলনেই শাহজাদার বুকের ভেতরে উছলে ওঠে। রইস খাঁকে মনে মনে তারিফ করে।

খুরশিদা কাছে এলে রইস খাঁ বলে — তোমার বয়স কত?

— উনিশ।

— এত?

— হ্যাঁ মেহেরবান।

— মেহেরবান এই শাহজাদা, আমি নই। তোমাকে দেখে আরও কম মনে হয়।

— সবাই সেকথা বলে।

— তুমি গান জান?

— শিখেছি।

— নাচতে জান?

— তাও শিখেছি।

শাহজাদা এবারে প্রশ্ন করে — এত সব শিখলে কি করে।

— আমার মা বাইজী ছিল। তাছাড়া সঙ্গীত তাঁর প্রাণ।

খবরটা রইস খাঁয়েরও অজানা ছিল। সে বলে ওঠে — তাই নাকি ?

শাহজাদা বুঝতে পারে বাইজীর মেয়ে কখনো অনাঘ্রাতা থাকতে পারে না। তবু সে প্রশ্ন করে — এখানে আসার আগে আর কার কাছে ছিলে?

এবারে রূপসীর ভ্রূভঙ্গি তির্যক হতে হতেও হল না। সে শান্ত কণ্ঠে বলে — কারও কাছে নয় মেহেরবান।

দুইজনেই বিস্মিত হয়।

সেই সময় একজন খোজা এসে শাহজাদাকে অভিবাদন জানায়। এই মহলের রক্ষীরা খোজা। কয়েকজন নারীও রয়েছে। সে বলে — খোদাবন্দ, দরবারে বাদশাহ আপনার উপস্থিতির প্রয়োজন বোধ করছেন।

শাহজাদার মুখে বিরক্তি ফুটে ওঠে। তবুও সে বুঝতে পারে জরুরী কোন প্রয়োজন ছাড়া কখনো তাকে ডাকা হয় না। সে একজন নারী রক্ষীকে ইশারা করতে সে খুরশিদাকে নিয়ে ভেতরে চলে যায়। শাহজাদা রইস খাঁয়ের সঙ্গে বাইরে এসে তাকে বিদায় দিয়ে দরবারের দিকে চলতে থাকে।

প্রবেশ করেই বাদশাহজাদা বুঝতে পারে দরবারের আবহাওয়া বেশ গরম। বাদশাহ একবার খান দউরান আর একবার নিজাম উল-মুল্‌কের দিকে ঘন ঘন চাইতে থাকেন। যেন কোন আশ্বাসের বাণী উচ্চারিত হবে বলে আশা করছেন এই দুইজনার কোন এক জনের মুখ থেকে। কিন্তু দুই জনেই নীরব। সরব আজ আলি হামিদ খাঁ।

হামিদ খাঁ বলছে — আপনার হস্তে যে পত্রটি রয়েছে ওটি না পাঠ করেও তার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হচ্ছে না।

বাদশাহ বলেন — তবু পাঠ করে দেখাই যাক না।

— নিশ্চয় পাঠ করবেন। এই পত্রের মধ্যে যত স্তোকবাক্যই থাকুক না কেন, এটি এসেছে নাদির শাহের নিকট থেকে।

খান দউরান বলে — হামিদ খাঁ বড় বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। এত উত্তেজনার

কোন কারণ ঘটেনি।

হামিদ খাঁ বিষণ্ণ হাসি হেসে বলে — আপনাকে আর কি বলব। আপনি হলেন হিন্দুস্থানের আমির-উল-উমর। নাসির খাঁ সম্বন্ধে আপনাদের মন্তব্য দিনের পর দিন আমি এবং অনেকেই শুনে এসেছেন। আজ কি প্রমাণিত হল? নাদিব শাহের পত্র পাঠের কোন প্রয়োজন আছে? আজ যদি নাসির খাঁ আপনার বিন্দুমাত্র সহযোগিতা পেতেন তাহলে আমার মনে হয় কাবুল আক্রমণ করার আগে নাদির শাহ্ একশোবার চিন্তা করতেন।

— আপনার এটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

— হয়ত হয়ে যাচ্ছে। তবু এখনো যদি আপনি জালালাবাদে না হোক লাহোরেও আমাদের বৃহৎ সৈন্যদল প্রেরণ করেন তাহলে সামলানো যেতে পারে।

— আমাদের এই দেশ বিবাট। পাঞ্জাবেব কত নদ-নদী রয়েছে একবার খেয়াল রাখবেন।

— হ্যাঁ জানি। কিন্তু দুঃখেব বিষয় এটা বর্ষাকাল নয়। একবার যে ভুল হয়েছে তার পুনর্ঘটন না ঘটতে দিলে বিচক্ষণতার পরিচয় মিলবে।

— অর্থাৎ আমি বিচক্ষণ নই।

· নিজামুল-মুলক আর সাদাত খাঁ বরাবর নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করে। কিন্তু আজ তারা খান দউরানের হয়ে বলতে থাকে। দরবারের মধ্যে একটা গুঞ্জন।

বাদশাহ্ বলে ওঠেন — আপনাবা চুপ করুন। সব আলোচনাই হবে। পত্রটি পড়া যাক।

পত্রটি পড়তে শুরু করে উজির কামরুদ্দিন খাঁ।

নাদির শাহ যথাবিহিত সম্মান জানিয়ে লিখেছেন . "আমার আগে ধারণা ছিল না যে, কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এতবার পত্র দিয়েও হিন্দুস্থানের মত বিশাল দেশের বাদশাহের নিকট থেকে কোন সাড়া মিলবে না। আমার নিজস্ব মান-সম্মানের কথা ছেড়েই দিচ্ছি (শুধু সম্মান রাখতে এই পবিস্থিতিতে একটা দেশকে আক্রমণ করা যায়)। আপনার ভদ্রতাবোধও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে এই নীরবতায়। আমি জানি আপনি নিশ্চিন্ত আছেন, কারণ আপনাকে আমি কয়েকবার বলেছি যে কেবলমাত্র আফগান দস্যুদের শাস্তি দেবার জন্য আমি এদেশে প্রবেশ করেছি। এখনো সেকথা আবার বলছি। কিন্তু কতদিন আর জোরের সঙ্গে একথা বলতে পারব? হ্যাঁ, আপনার সহযোগিতা পেলে চিবকালই বন্ধুত্ব বজায় বাখা যেতে পারে। তবে আপনি এ বিষয়ে কতখানি চিন্তা করেন, আদৌ করেন কি না আমার সন্দেহ রয়েছে। কাবুল দখল করতে আমাকে রীতিমত রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করতে হয়েছে। একদল দস্যুকে শায়েস্তা করা সহজ, কিন্তু সেই দস্যুদলের পশ্চাতে যদি বাদশাহের লোকজন শক্তি যোগায় তাহলে অত সহজে তাদের পরাভূত করা যায় না। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কাবুলের শাসনকর্তা নাসির খাঁ আমাকে বাধা দিতে গেলেন। তবে তাঁব সিপাহীদের দুরবস্থা দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল। তারা তো আপনারই সেনা। মনে হল তারা বহুদিন থেকে বুভুক্ষু। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের অবস্থা আমার মত দরিদ্র দেশের সেনাদের চেয়েও শোচনীয়। আপনি কি তাদের ত্যাগ করেছেন? তবু তারা লড়ল কিন্তু চমৎকার। বিশেষ করে নাসির খাঁ আর শারজা খাঁয়ের কথা

আমার বহুদিন মনে থাকবে। আমার দেশ হলে তারা অনেক বেশি গুরুত্ব পেত। কারণ তাদের সাহস আছে, শক্তি আছে, মস্তিষ্ক আছে। সবচেয়ে বড় কথা দেশকে তারা বিলিয়ে দিতে চায় না।

যাহোক, ওসব আপনার নিজের ব্যাপার। আমার কোন রকম মন্তব্য করা সাজে না। আমি এখন জালালাবাদের পথে অগ্রসর হচ্ছি। জালালাবাদের কাছে বাহার সুফ্‌লা বলে একটা স্থানে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করব। কারণ সেখানে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র রেজা কুলিকে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছি। ও মধ্য এশিয়ার বল্‌ক দখল করে আরও এগিয়ে যাচ্ছিল। আফগানদের মত বল্‌ক-এও কিছু বেপরোয়া লোক রয়েছে। আমি রেজাকে আর না এগিয়ে সৈন্যদল নিয়ে ফিরে আসতে বলেছি। আমরা দ্বিতীয় পুত্র সঙ্গেই আছে আমার। নাম মুর্তজা কুলি। যা হোক, এসবে আবার আপনার কোন আগ্রহ থাকার কথা নয়। আসল কথা হল আপনি যদি একটু সক্রিয় হতেন তাহলে আমাকে কাবুলেও আসতে হত না। কিন্তু এখন জালালাবাদেও থামতে পারব না। কারণটা শুনলে আপনারও রাগ হবে।

আলি মসজিদ-এ নাসির খাঁকে পরাজিত করে আমি একটা সুদীর্ঘ পত্র লিখে কাবুলের কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে আমার দূতকে পাঠিয়েছিলাম দিল্লীতে আপনাব কাছে। জালাবাদের অধিকর্তা আমার সেই দূতকে হত্যা করে পত্র নষ্ট করে ফেলে। তবে কাবুলের মানুষদের সে হত্যা না করে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। আপনিই বলুন, এরপরেও কি আমি এদের শাস্তি না দিয়ে পারি? আমার যে অনিষ্ট করবে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ না নিলে আমি শান্তি পাই না। সুতরাং এখন কিছুদিন প্রতিশোধ চলবে। তারপর আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে কথা বলে পববর্তী সিদ্ধান্ত নেব।"

উজির কামরুদ্দিন পত্রপাঠ শেষ করে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। দরবারও স্তব্ধ। সবাই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে হামিদ খাঁ এক বিন্দুও মিথ্যা বলেনি। আমির-উল-উমর খান দউরান মস্তক অবনত করে থাকে। নিজামুল-মুল্‌ক-এর মুখে আবছা হাসির রেখা। সাদাত খাঁ সেই হাসিটুকু দেখে ফেলে।

বাদশাহ তক্তাউসের দুই দিকে হাত ঘষতে ঘষতে বলে ওঠেন — এবারে আপনারা বলুন, কি করা উচিত। চিঠি পড়ার পর এমন হতাশ দেখাচ্ছে কেন আপনাদের? দেশটা বিশাল। অনেক সময় রয়েছে এখনো। তাই নয়?

বাদশাহজাদা সুলতান আহমেদ দরবারের উত্তেজনা বেশ উপভোগ করছিলেন। এক একবার এক একজনের ওপর তার ক্রোধ জন্মাচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল একটা কিছু করা খুব প্রয়োজন। কিন্তু কি করতে হবে বুঝতে পারছিল না। তবে যত কিছু নষ্টের গোড়া যে আমির-উল-উমর এটা তাব মনে হচ্ছিল। আর নিজামুল-মুল্‌ক এবং সাদাত খাঁ এই দুজনকে সে কিছুতেই অকৃত্রিম ভাবতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল এরা দুজন যেন দর্শক হয়ে দরবারের দৃশ্য উপভোগ করতে এসেছে। কেন যে এমন মনে হচ্ছিল সে নিজেও জানে না। অথচ বাদশাহের এই দুজনার ওপর অগাধ আস্থা। তাই ময়ূর সিংহাসনের দুই পাশ বারবার আঁকড়ে ধরেও ওই

দুইজনের দিকে দৃকপাত করছেন বেশি।

খান জুমান খাঁ সাধারণত বেশি কথার মানুষ নয়। দরবাবে অধিকাংশ সময় সে চুপ করে থাকে। সে এবারে মুখ খোলে। বলে — নাদির শাহের পত্রের উত্তর সত্বর দেওয়া উচিত। সেই সঙ্গে একটা বিরাট বাহিনী মজুত রাখা প্রয়োজন পাঞ্জাবে। নাদির শাহের মতলব খুব সুবিধের নয়। বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া উচিত স্বয়ং খান দউবানের।

আমির-উল-উমর বলে ওঠে— আমি!

— হ্যাঁ।

হেসে খান দউরান বলে — এত বড় দেশের দিকে আমাব নজর রাখতে হয়। আমি চলে গেলে গোটা দেশটার দায়িত্বে কে থাকবে?

— দেশের ওপর আপনার নজর থাকলে নাদির শাহ এতদূর চলে এলেন কি করে? বলতে গেলে বিনা বাধায় এসেছেন। যে তাঁকে রুখতে গিয়েছিল যথাসাধ্য তাকে তো আপনারা আমল দেননি কখনো। বিদ্রূপ করেছেন শুধু।

নিজামুল-মুল্‌ক পরিবেশকে হাল্‌কা করার জন্য বলে — খান জুমান খাঁ, এমনিতে নিরুত্তাপ। আজ কিন্তু উনি সত্যই চটেছেন। চটে যাওয়ার কাবণ আছে বৈকি। তবে নাদির শাহ সম্বন্ধে অত উতলা হওয়ার কিছু ঘটেনি এখনো। কি বলেন সাদাত খাঁ।

সাদাত খাঁ বলে — আমারও তাই ধারণা। তবে পত্রেব জবাব তো দেওয়াই যেতে পারে।

খান জুমান খাঁ বিস্মিত হয়ে বলে — আপনাদের নির্বিকাবত্ব দেখে আমি যারপরনাই আশ্চর্যান্বিত। মনে হচ্ছে আপনাবা যেন পাবস্য ও হিন্দুস্থানের মধ্যে পার্থক্য গুলিয়ে ফেলেছেন।

নিজামুল-মুল্‌কের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। সে বলে, এভাবে বলা আপনাব ঠিক হয়নি।

বাদশাহ্ আবার বলে ওঠেন — তাহ্‌লে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হল?

খান দউরান বলে — আপাতত পত্রের উত্তর দেওয়া হোক। তারপর শাহের গতিবিধি বুঝে ব্যবস্থা নিলে চলবে।

আজিম আল্লাহ্ খাঁ বলে — তাতে খুব দেবি হয়ে যাবে না তো?

— না।

বাদশাহজাদা বহুক্ষণ ধৈর্য ধরে বসে ছিল। তার মনে হচ্ছিল এরা সব এতক্ষণ ধরে তামাশা করছে। কোন কিছুতে যেন গুরুত্ব নেই। খান জুমান খাঁয়ের কথার মধ্যে যথেষ্ট আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে পারস্যের শাহ সম্বন্ধে। কিন্তু এরা উড়িয়ে দিতে চায়। তার মনে হচ্ছিল বাদশাহ যেন একদল ইয়ারকে নিয়ে মজলিশে বসেছেন। তার অনেকবার মনে হয়েছে খান জুমান খাঁ আর আজিম আল্লাহ্ খাঁয়ের স্বপক্ষে কিছু বলবে। কিন্তু বলতে পারল না। একটা আড়ষ্টতা তাকে চেপে ধরল। মনে মনে ঠিক করে, পরে যেদিন সুযোগ পাবে বলবে। আজ সর্বক্ষণ তার চোখের সামনে খুরশিদা বাইজীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখ ভেসে উঠছিল। মনটা ছটফট করছিল তার কাছে যাওয়ার জন্য। এখন ফুরসত পেয়ে সেইদিকে রওনা হওয়ার জন্য দরবারের বাইরে

পা রাখতেই একজন খোজা এসে খবর দেয় বড় বেগম সাহেবা তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

গর্ভধারিনী তো শুধু নন। বাদশাহের বেগম তিনি। তাঁকে অবহেলা করে খুরশিদা বাইজির কাছে যাওয়ার হিম্মত এখনো হয়নি সুলতান আহমেদের। সুতরাং বেগম মহলের দিকে পা বাড়ায় সে।

উজির আজিম আল্লাহ খাঁয়ের বাসভবনে আলোচনা হচ্ছিল। উপস্থিত হয়েছে আলি হামিদ খাঁ ও খান জুমান খাঁ। আলোচনার বিষয়বস্তু নাদির শাহের অনুপ্রবেশ।

আলি হামিদ খাঁ ক্ষোভের সঙ্গে আজিম আল্লাহ্কে বলে — আপনি নিজে তো উজির। আপনার যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। আপনি কেন বাদশাহকে বোঝাতে পারেন না।

— আমি সব সময় চেষ্টা করি। কিন্তু সাদাত খাঁ আর নিজামুল মুল্‌ক যেন বাদশাহকে সম্মোহিত করে রেখেছে। আপনারা জানেন, ওরা পরস্পরের শত্রু। কিন্তু নাদির শাহ বিষয়ে উভয়েই অদ্ভুত রকমের নরম মনোভাব গ্রহণ করে। আমার সব চাইতে অদ্ভুত লাগে খান দউরানের হালচাল দেখে। আপনারা কয়জন জানেন আমি বলতে পারি না, কিন্তু তাঁর মত বিজ্ঞ বিশ্বস্ত আর দেশপ্রেমিক বোধহয় আমি আপনিও নই। তবু তিনি প্রায়ই বিপরীত আচরণ করেন। আমার ধারণা সাদাত খাঁ আর নিজামের প্রতি বাদশাহ অতিরিক্ত নির্ভরশীল হওয়ায় খান দউবান তিক্ত বিরক্ত। তাঁকে এতটুকুও গুরুত্ব দেন না বলে হতাশায় ওদের সবার মত অগভীর মতামত প্রকাশ করেন।

খান জুমান বলে — আমারও ঠিক সেই কথাই মনে হয়। এদিকে দেখুন সাদাত খাঁ নিজে পারসিক। তাই বলে কি সে বিশ্বাসঘাতক হবে? তেমন তো মনে হওয়া উচিত নয়। কারণ সে অযোধ্যার অধিপতি। জীবনে এর চেয়ে বেশি সুযোগ সে কী আর আশা করতে পারে? তাকে নিশ্চয় দিল্লীর তক্ততাউসে বসিয়ে ফিরে যাবেন না নাদির শাহ।

আজিম আল্লাহ্ বলে — আমি ভাবছি অন্য কথা। আমির-উল-উমর খান দউরান এত নিস্পৃহ কেন? আমি জানি তিনি বাদশাহের হিতৈষী। তাঁর মত বাদশাহের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী খুব কম রয়েছে হিন্দুস্থানে। আমার হাতে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে তার। তবু কেন তিনি এমন নির্লিপ্ত নাদির শাহ সম্বন্ধে? তিনি যেন ওদের হাতে আত্মসমর্পণ করে বসে রয়েছেন।

খান জুমান বলে — একটা কারণ হতে পারে তিনি কোন অবস্থাতেই দিল্লী পরিত্যাগ করতে চান না। নিজামুল-মুল্‌ক যেভাবে ঘন ঘন দক্ষিণ থেকে দিল্লীতে ছুটে ছুটে আসছেন, তাতে তাঁর সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।

আলি হামিদ খাঁ বলে — কিংবা নিছক আলস্য। বয়স হয়েছে। দেহটাও ভারী হয়ে উঠেছে। বহুদিন নিরুপদ্রবে থেকে থেকে এখন আর নড়াচড়া করতে ইচ্ছা হয় না।

— তাই কি ?

— আমার নিজের কথা চিন্তা করে তাই তো মনে হয়। আমাকে যদি আজ বাদশাহ হুকুম দেন লাহোর যেতে, আমি নিশ্চয় চেষ্টা করব সেই হুকুম যাতে ফিরিয়ে নেন। দিল্লী আমাকে

অত্যন্ত মোহগ্রস্ত করে ফেলেছে।

খান জুমান মাথা ঝুঁকিয়ে বলেন — কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়। তবে এই বিপদেব দিনেও কি আলস্য প্রধান কারণ হতে পারে? আজ যদি আলমগীর থাকতেন, কিংবা থাকতেন আকবর বাদশাহ্— তাহলে?

আলি হামিদ হেসে বলে — তাহলে তাঁরা নিজেরা সবচেয়ে আগে প্রস্তুত হতেন। সুতরাং সবাই তাঁদের সঙ্গে যেতে বাধ্য হত।

আরও কিছুক্ষণ আলোচনার পরে প্রসঙ্গান্তরে চলে যায় আলোচনা।

আজিম আল্লাহ বলে — বাদশাহজাদাকে কেমন মনে হয়?

খান জুমান খাঁ বলে — বুদ্ধিমান সন্দেহ নেই। তবে অত্যন্ত অলস।

— মানুষটা খারাপ নয়।

— ভাল হয়ে কি লাভ? পরবর্তী বাদশাহ্ কে হবেন হলফ করে কেউ বলতে পারে না। এখন তো আবার নাদির শাহের হুমকি।

আজিম আল্লাহ্ বলে — নাদির শাহ্ শুধু হুমকি দিয়ে চলে যাবেন বলে মনে হয় না। এতদূর তিনি সখ করে আসেননি। আফগান হানাদারের কথা হলো অজুহাত। বাধ্য হয়ে দেশ ছেড়ে এসেছেন কিছু ধন দৌলত সংগ্রহ করতে।

— সত্যিই কি আপনার ধারণা তাই?

— হ্যাঁ।

— বাদশাহকে বলেন না কেন?

— তিনি সবার কথার সমান গুরুত্ব দেন না। আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি। তিনি খুব বিপজ্জনক ভবিষ্যতের কথা ভাবতে চান না। তিনি চান ভবিষ্যত সেইরকমই হবে যে রকম তিনি ভাবেন। ভাবতে চান। অর্থাৎ তাঁর ভবিষ্যত হবে তাঁর মনের মত।

খান জুমান বলে — খান দউরানের কি এখনো অভিমান যাবে না?

— সেটা তিনিই জানেন। তবে আমার কাছে নাদির শাহের এই আক্রমণ ভাল বলে মনে হচ্ছে না।

আজিম আল্লাহের বসতবাটির সামনে ফাঁকা ময়দানে ভিড় জমেছে। একজন যাদুকর রজ্জুর খেলা দেখাচ্ছে। রজ্জুটি হাঁড়ির ভেতর থেকে সাপের মত উঠে আকাশের দিকে চলছে মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে। সবাই বিস্ময়ে নির্বাক। অদূরে আর একটি স্থানে কিছুটা লোকের জমায়েত। সেখানে হচ্ছে বাঁদর নাচ। একটি বাঁদর স্বামী, অপরটি স্ত্রী। ঘর-গৃহস্থলীর কাজ ছাড়াও নাচ, স্ত্রীর মানভঞ্জন ইত্যাদি। এই ময়দানে প্রতিদিনই এমন সব খেলা হয়। এরা কেউ নাদির শাহের কথা জানে না। বাদশাহ ব্যতীত অন্য কাউকে তোয়াক্কাও করে না। তারা জানে যুদ্ধ বলতে ময়ূরসিংহাসন নিয়ে ভাই বা অন্য কোন আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাদ। সেইসবও হয়েছে তাদের পিতামহ মাতামহের আমলে। সুতরাং সেই বিষয়ে মাথা খারাপের প্রশ্ন ওঠে না।

বাদশাহজাদা সুলতান আহমেদের পত্নী বেগম উমদেন্নেসার বরাবর একটি গোপন গর্ববোধ ছিল। অন্যান্য যে কয়জন বেগম রয়েছে তাদের মধ্যে বাদশাহজাদা তার প্রতি সবচেয়ে বেশি আসক্ত। অনেকের মুখে আভাসে সে শুনেছে যে তার স্বামীর সুন্দরী ললনাদের প্রতি একটু বেশি দুর্বলতা রয়েছে। থাকবে নাই বা কেন? পুরুষ মানুষ, তৈমুরের রক্তের ঝাঁজ তো এখনো একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। তবু উমদেন্নেসা এ পর্যন্ত জানত সবার চেয়ে স্বামীর ভাগ সে অনেক বেশি পায়। সেই জন্য আন্যান্য বেগমদের কাছ থেকে তার দিকে আঁকাবাঁকা অনেক মন্তব্য বর্ষিত হয়ে এসেছে। এজন্য সে কখনো উষ্মা প্রকাশ করেনি। মনে মনে বরং সে আনন্দিত হত অন্যান্যদের ঈর্ষা দেখে।

এহেন স্বামী তাব কাছেও কিছুদিন আসছে না। প্রথমে মনের মধ্যে ছটফটানি, তারপর একবার ভেতরে একবার বাইরে আসা-যাওয়া। একবার পালঙ্কের ওপর শয়ন, পরক্ষণেই ঝরোকার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে উঁকি দেওযা। তবু বাদশাহজাদা আসে না। অন্যান্য বেগমেরা তার কক্ষের সামনে দিয়ে বড় বেশি যাতায়াত শুরু করে। তাদের যত হাসির কথা আনন্দের কথা সবই যেন তার কক্ষের সামনের বারান্দায় মনে পড়ে। অসহ্য। সে বাঁদী কুলসুমকে ডাকে। কুলসুম বয়স্কা এবং তার খুবই অনুগত। তাছাড়া সে অন্দরমহল বাহিরমহল সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল।

কুলসুম সামনে এসে দাঁড়ালে সে বলে — তোমাকে একটা খবর আনতে হবে।

— বলুন।

— বাদশাহজাদা কিছুদিন হল আমার কাছে আসছেন না।

— আমি লক্ষ্য করেছি।

— হারেমে আর আরও কাছে যান কি ?

— না।

— তুমি জান?

— জানব না বেগম সাহেবা? আপনি ছট্‌ফট্ করছেন আর আমি চুপ করে বসে থাকব? উনি হারেমে অন্য কোন বেগমের কাছে গেলে আমি খবর পাব না? আর একবাব হারেমে এলে কোন্ কৌশলে আপনার কাছে নিয়ে আসতে হয় সেটা আমার জানা আছে।

— কি করে?

— সে কথা আপনি আর শুনতে চাইবেন না। বাঁদীর কৌশল কি বেগমসাহেবাদের শুনতে ভাল লাগে?

— থাকগে ওসব কথা। তোমাকে জেনে আসতে হবে কিসের মোহে শাহজাদা এতদিন হারেমের কথা ভুলে রয়েছেন। আমি তোমার মুখেই শুনেছি তিনি আর একটা মহল করেছেন। সেখানে নাকি সুন্দরীরা আসে। সত্যি কি ?

— হাজারবার সত্যি।

— তাই বলে হারেমের বাইরে আর একটা হারেম থাকতে পারে না।

— ছোটখাটো হারেম থাকতে পারে বৈকি।

— কি রকম।

— ধরুন দিল্লীর মধ্যে তিন-চার জায়গায় তিন-চার জন সুন্দরী রেখে দিলেন।

উমদেন্নেসার মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। সে বলে — সম্মানের প্রশ্ন উঠবে তাহলে।

কুলসুম মনে মনে হাসে। ভাবে, আপনি আহামবি সুন্দরী নন বেগমসাহেবা, নিজেকে যাই ভাবুন। মুখে বলে — ছদ্মবেশে যাতায়াত করতে আপত্তি কিসের?

— একটা মেয়ের জন্য এত পরিশ্রম?

— পুরুষদের আপনি এখনো চেনেন না। রহস্য উদ্ঘাটনে তারা আরাবল্লী ডিঙোতে পারে।

— রহস্য? কিসের রহস্য?

— নতুন নারীব বহস্য। একঘেয়েমী তাদেব সয় না। নতুন মুখ, নতুন ধরনের কথা, নতুন চাহনি — সর্বোপরি নতুন দেহলতা।

উমদেন্নেসা আরও বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলে — তুমি আজকের মধ্যে খবর নিয়ে এসো।

— আপনি চিন্তা করবেন না। আমি সঠিক খবর এনে দেব।

কুলসুম কথার খেলাপ করেনি। সেইদিনই সন্ধ্যার পরে সে খুরশিদা বাইজীর বিস্তারিত বৃত্তান্ত জেনে এসে বেগমকে জানাল। শুনে বেগম চোখের জল সামলাতে পারে না। কুলসুম সেই অশ্রুজল দেখে বিস্মিত হয়। মোগল বাদশাহদের ঘরে এই পরিস্থিতিতে অশ্রুজল প্রত্যাশিত নয়। অত্যন্ত শান্তভাবে মেনে নেওয়া যথোচিত কাজ হত। কিংবা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। কিন্তু নূবজাহানের দিন কবে গত হয়েছে। তবে তাঁর তসবির দেখেছে কুলসুম। কী রূপ! চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ওইরকম রূপসীর ক্ষেত্রেই স্ফুলিঙ্গ শোভা পায়। সেই তুলনায় এই সব রূপ তো পানসে। জাহাঙ্গীরের বংশধবেরা তাই রূপের তৃষ্ণায় তৃষিত। হারেমের সৌষ্ঠবহীন জেনানারা তাদের কেমন করে আকৃষ্ট করবে? মুখখানাকে সুন্দর করে তুললেই কি মন ভোলানো যায়? মোগল পুরুষদের প্রতি অঙ্গের জন্য নিজের প্রতিটি অঙ্গকে সুন্দর করতে হবে। তবেই জাহাঙ্গীরকে পাওয়া সম্ভব।

কুলসুম উমদেন্নেসাকে বলে — শুধু শুধু চোখের জল ফেলে কি করবেন বেগমসাহেবা। এটাই আপনাদের ভবিতব্য। এতদিন যে মোটামুটি বেঁধে রাখতে পেরেছিলেন তাই যথেষ্ট।

— আমার কিছুই করার নেই? অভিমান?

— কে দেবে অভিমানের মূল্য? যেখানে ভালবাসা নেই, সেখানে অভিমানেব মূল্য কতটুকু ?

— অমি তাহলে ক্রোধ প্রকাশ করব।

— হ্যাঁ। তাতে নতুনত্ব রয়েছে কিছুটা। কিন্তু পারবেন তো? শাহজাদা যদি বিরক্ত হয়ে আপনাকে অবহেলা করেন?

— তাও সইব। আমি আমির সাহাবুদ্দিনের কন্যা। আজ তিনি বেঁচে নেই বটে, কিন্তু তাঁর রক্ত রয়েছে আমার ধমনীতে। শাহজাদা যে একজন অপদার্থ সেটা প্রমাণ করে ছাড়ব।

কুলসুম বেগমের দিকে চেয়ে থাকে। বুঝতে পারে বেগম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভালই হল। বেগমদের ভীতু ভীতু ভাব দেখে দেখে সে ক্লান্ত। এমন হলে প্রতিক্রিয়া ভালও হতে পারে।

দুদিন পরে সত্যই শাহজাদা এল।

উমদেন্নেসা শাহজাদা ভেতরে প্রবেশ করতেই ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে ওঠে — হঠাৎ?

শাহজাদা থমকে যায়। বেগমেব মুখের দিকে চেয়ে বলে — হঠাৎ মানে?

— হঠাৎ নয়? এদিকে আসার অভ্যাস নেই তো তোমার।

— রসিকতা করছ?

— রসিকতা? তোমার সঙ্গে? রসিকতার মর্মার্থ বোঝো তুমি?

শাহজাদা বেগমের মুখের দিকে ভালভাবে চেয়ে দেখে সে ক্রোধান্বিত। তার খুব অদ্ভুত লাগল। এই প্রথম সে বেগমকে রাগান্বিত হতে দেখল।

— তোমার কি হয়েছে বলতো? শরীর খারাপ?

— শরীর আমার চমৎকার রয়েছে।

— মন?

— আমাদের মন বলে কিছু নেই। তাই খারাপ হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

শাহজাদা হেসে ওঠে।

— হাসছ যে?

— বেশ মজা লাগছে। তুমি রাগ করেছ কিনা। কখনো দেখিনি।

— নাদির শাহের রাগ দেখেছ?

— হঠাৎ তার কথা কেন?

— তার কথাই তো তোমাদের মুখে শোভা পাওয়া উচিত। খুরশিদা বাইজীকে বুকে জড়িয়ে রাখলে কি নাদির শাহের রাগ প্রশমিত হবে?

শাহজাদার মুখ এতক্ষণে গম্ভীর হয়। সে প্রশ্ন করে — খুবশিদার কথা কোথা থেকে শুনলে?

— হারেমে থাকি বলে কি আমাদের বন্দিনী ভাব? চোখ কান সব খোলা রাখতে হয়। তুমি হলে ময়ূর সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। দেশের কী দুর্দিন তাই ভাবি। নইলে দেশের ঘোরতম শত্রু যখন এগিয়ে আসছে, তখন সুন্দরীর মুখের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে সেই দেশের শাহজাদা।

এবারে বেশ উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে শাহাজাদা — উমদেন্নেসা।

— হ্যাঁ যত বীরত্ব হারেমে এসে। তেমন যদি সাহস থাকে সৈনাবাহিনী নিয়ে চলে যাও আফগানিস্তানের দিকে। এখনো বুঝছো না কী ভয়ানক দিন এগিয়ে আসছে!

— তুমি দেখছি হারেমে বসে দুনিয়ার খবর রাখ। কই আমরা তো জানি না যে নাদির

শাহ্ এদেশ দখল করতে আসছেন।

— তোমরা অলস, তোমবা ভীতু, তাই মনগড়া একটা কিছু ভেবে নিয়ে বসে আছ। নাদির শাহের পত্রের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করছ। আর তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে দরবারেরই কয়েকজন। তাদের মধ্যে হয়ত কোন বিশ্বাসঘাতক রয়েছে। কিংবা তাদের দশাও তোমাদের মত।

— আমাদের মানে? আর কার কথা বলছ?

উমদেন্নেসা নিজেকে সামলে নেয়। সে বলে — তোমাদের আমির-উল-উমর, তোমাদের নিজাম-উল-মুল্‌ক — কে নয়?

— তুমি খুব বাড়াবাড়ি করছ বেগম।

— আর তুমি? তুমি কিছু করনি? আমাকে প্রেমের কথা বলে ভুলিয়ে বিশ্বাসঘাতকের মত অন্য নারীর রূপ-সুধা পান করছ না দিনের পর দিন?

শাহজাদা মুহূর্তের মধ্যে ঠিক করে নেয়, ক্রোধ প্রকাশ করে লাভ নেই। বরং এর কাছ থেকে জেনে নিতে হবে এত খবর কিভাবে সংগ্রহ করে। হারেম আর লালকেল্লার ময়দান কি একই অবস্থায় পৌঁছেছে?

সে চোখে মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে আবেগ-পূর্ণ কণ্ঠে বলে -- তোমাকে আমি এতদিন আর পাঁচজন সাধারণ বেগমের মত ভাবতাম। এখন দেখছি তুমি মোটেই তা নও। তোমার শুধু রূপ নেই, সেই সঙ্গে মস্তিষ্কও রয়েছে। আমার খুব ভাল লাগছে।

উমদেন্নেসা ভাবে, কথাগুলো মনের না মুখের? সে চুপ করে থাকে। দেখতে চায় শাহজাদা কতটা বলে।

— জান বেগম, এতদিন পরে আমার মনে হচ্ছে, কথা বলার মত একজনকে পেলাম। নারীদের সঙ্গে আমি মিশি, এতে তো গোপনীয়তা নেই, কিন্তু দুটো বুদ্ধিযুক্ত কথা বলার মত কাউকে পাই না।

— আমার সঙ্গে আগে কথা বলনি?

— বলেছি, কিন্তু সে তো সাধারণ কথা। আমি কি জানতাম তোমার সঙ্গে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলা যায়?

— জানা হল তো?

— ঠাট্টা নয়। এই যেমন ধর নাদির শাহের কথা। দিল্লীর কয়জন মানুষ জানে তাঁর কথা? তিনি যে আফগানিস্তানকে ডিঙিয়ে চলে আসছেন, কেউ জানে না, অথচ তুমি জান। অর্থাৎ তোমাকে এই খবর সংগ্রহ করতে ব্যবস্থা নিতে হয়।

মনে মনে উমদেন্নেসা ভাবে, বেঁচে থাক কুলসুম। তার সর্বত্র অবাধগতি। দরবারের সিপাহী-সান্ত্রীদের সঙ্গে তার ভাব। তার বয়সটা সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। তাছাড়া সে শুধু বুদ্ধিমতী নয়, লেখাপড়াও জানে। কিতাব পড়ে। সব বিষয়ে তার আগ্রহ অপরিসীম। নাদির শাহ্ সম্বন্ধে খবরাখবর সে প্রথম থেকে রাখে।

শাহজাদাকে সে বলে — কতটুকু খবর আর রাখতে পারি।

— তবু তো রাখ। তাছাড়া নাদির শাহ যে খারাপ মতলবে আসছেন সেকথা কি করে বলছ?

— ভুলে যেও না আমার পিতা নাদির শাহের দেশের মানুষ। আর আমি তাঁরই কন্যা। দেশের মানুষের ধাত চিনতে আমার ভুল হবে বলে মনে করি না। এখনো তাঁকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। এটা আত্মহত্যার শামিল। তুমি এই দেশের বাদশাহের পুত্র। খুরশিদা বাইজীর কোলে মাথার রেখে সুখস্বপ্নে বিভোর। অমন হাজার হাজার সুন্দরী নাদির শাহের হারেমে রয়েছে, সেই খবর রাখ? তবু তিনি কাজের কাজ করে যান।

— একথা কোথা থেকে জানলে?

উমদেন্নেসা মনে মনে বলে, একটু আগ্রহ আর একটু বুদ্ধি থাকলে তোমরাও জানতে পারতে। তোমাদের নাদির শাহ সম্বন্ধে খবর তো শুধু তাঁর পত্রের মাধ্যমে। কিন্তু যে ব্যক্তিটি পত্র নিয়ে আসে তার সঙ্গে কাউকে মিশতে দিয়েছ? অতিথিশালায় ভরে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাক। মহম্মদ খাঁ তুর্কোমান এতদিন রয়েছে দিল্লীতে। কোন্ বাইজীর প্রেমে নাকি বিভোর সে। তার সঙ্গে দোস্তি পাতাতে দিয়েছ কাউকে ? তুর্কোমান নাদির শাহের ঘনিষ্ঠদের মধ্যে একজন ছিল। আব্বাস নামে এক খোজার ভেতরের খবর জানার খুব ঝোঁক। সে তুর্কোমানের সঙ্গে ভাব জমিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু জেনেছে। সুরার ঝোঁকে অনেক বেশিই বলে ফেলেছে সে। সেই কথা তার মুখ থেকে কুলসুম শুনেছে। কারণ আব্বাস কুলসুমের ঘনিষ্ঠ হয়েছে এখানকার হারেমের কেচ্ছা জানতে। চতুর কুলসুম বানিয়ে বানিয়ে রসাল করে অনেক কিছু জানায় আর আব্বাসের সংগ্রহের অনেক কাহিনী জেনে নেয়। তার মধ্যে নাদিব শাহও রয়েছেন। উমদেন্নেসার সূত্র হল এটাই।

শাহজাদার প্রশ্নের উত্তরে সে দায়সারা ভাবে বলে — কোথা থেকে আর জানব। তুমি তো আমাকে পরিত্যাগ করেছ। তাই কাজ পাই না বলে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে এক এক জনের কাছ থেকে জানতে পারি। তারা কিভাবে জানে সেকথা বলতে পারব না। কেন? আমি সব ভুল কথা বলেছি?

চিন্তিত শাহজাদা বলে — না ঠিক তা নয়।

— তুমি রাগ কবলে।

— আমাকে আর রাগ করতে দিলে কোথায়? রাগ তো তুমিই করলে।

— আমরা হারেমে থাকি। বাঁদীর মত। আমাদের কি রাগ করা সাজে?

— চালাকি হচ্ছে? মেরে ধরে মালিশ করতে শুরু করেছ।

বেগম হেসে ওঠে একটু উচ্চকণ্ঠেই।

তার হাসি দেখে শাহজাদাও হেসে ফেলে।

যে তার চম্পক-সদৃশ অঙ্গুলিদ্বারা বামবাহুর ওপর হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল তাকে নাদির শাহ প্রশ্ন করেন — তোমার নাম কি ?

— আনোয়ারা।

— বেশ নাম। দেখতেও বেশ।

এবারে ডান বাহুব নারীকে একই প্রশ্ন।

সে মুখ নীচু করে বলে — মেহেরা।

শাহ তার মুখটা আঙুল দিয়ে তুলে বলেন — লজ্জা কিসেব? দেখতে তো ভালই। ভয় করছে?

মেহেরা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে — না।

শাহের দুই পা কোলে তুলে নিয়ে বসেছিল আর একজন। সৈন্যদের সঙ্গে পথ চলার সময় যেরকম মুখ ঢেকে চলে সেইভাবেই মুখ ঢেকে বসেছিল সে।

— আরে তুমি ওভাবে আছ কেন? এখানে রূপ দেখাতে হয়। এটা তো তোমাদের জায়গা। খুলে ফেল ওসব।

সে খুলতে চায় না।

নাদির শাহের মাথা গরম হয়ে ওঠে। তবু অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে তিনি বলেন — আমাকে চেনো না? আমি নাদির শাহ। নাম শোনোনি?

অবগুণ্ঠিতা মাথা হেলিয়ে বলে সে চেনে।

— তবে?

— আমি রূপসী নই। আমাকে ভুল করে ধবে আনা হয়েছে।

নারীর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সুমধুর। শাহের হৃদয় স্পর্শ করে। তিনি কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। বলেন — তবু দেখি একবার। আমি দেখব, আমি স্পর্শ করব বলেই তো তোমরা রয়েছ। খুলে ফেল।

রমণী অত্যন্ত সঙ্কোচে তার অবগুণ্ঠন তোলে। দেখতে সে সত্যই তেমন সুন্দর নয়। কিন্তু প্রথমেই তার আয়ত নয়নদ্বয় শাহের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। ওই চাহনিতে যেন যাদু আছে। সেই সঙ্গে তার কণ্ঠস্বর।

— তোমার নাম?

— সালমা।

— আবার বল।

— সালমা।

— আবার।

— সালমা।

— বাঃ তোফা। আজ তুমি আমার কাছে থাকবে।

অন্য রূপসীরা তাঁর ইশারায় একে একে তাঁবু থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। প্রতিদিনই তিনি তাঁর

পছন্দমত একজন নারীকে বেছে নেন। অন্যেরা সরে যায়। আবার কখনো কখনো তাঁর খেয়াল হয়, একসঙ্গে তিনচার জনকে কাছে রাখেন। সেদিন সুরা পান অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি হয়ে যায়। সাধারণত খুব বেশি সুরা তিনি পান করেন না, আবার একেবারে কমও নয়। তবে মাতাল তিনি বড় একটা হন না। যেদিন হন, সেদিন এদের নিয়ে ছেলেখেলা করেন। প্রথম যৌবনে তিনি নাকি দুর্দান্ত ছিলেন। কিন্তু তখন নারী এত সুলভ ছিল না। তবু গিরিপথগুলোতে দস্যুবৃত্তি করার সময় নারী লুঠও চলত। কোন কোন দিন তিন-চারজনকে পেয়ে যেতেন এবং ভোগ করে ছেড়ে দিতেন। কারণ তখন তাঁর হারেম করার সামর্থ্য ছিল না। তখন তিনি শাহের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বাহিনী গড়ার উদ্দেশ্যে অর্থোপার্জনে ব্যস্ত। সেই সব বহু পুরোনো দিনের কথা শাহ ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে ভাবেন। বয়সের জন্য নারীর প্রতি লোভ তাঁর এখন অনেকটা স্তিমিত। কিন্তু সেই দিনের কথা ভাবলে এখনো রক্ত গরম হয়ে ওঠে। আর আশ্চর্যজনকভাবে এক একজন নারীর মুখ চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে। তাদের জীবনে একদিন কি বড়জোর দুদিন দেখেছেন। তবু ভোলেননি কেন নিজেই বুঝতে পারেন না। হাজার হাজার নারীর মধ্যে ওই কয়েকজনের কথা ঘুরেফিরে তাঁর মনে হয়। অথচ নিজের পুত্রদের মায়ের মুখ তিনি প্রায়শ বিস্মৃত হন। ভেবে মনে করতে হয়।

সালমার মিষ্টি কণ্ঠস্বর শোনার জন্য তিনি তার সঙ্গে অনর্থক অনেক কথা বলেন। সালমার ভয় ভাঙে। সে শাহের ঘনিষ্ঠ হয়। তারপর একসময় তাঁকে ভাললাগতে থাকে। বয়সের ব্যবধান ঘুচে যায়। তার মনে হতে থাকে শাহ যেন তার অতি আপনজন। তাঁর চেয়ে নিকটতম ব্যক্তি পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

রাত শেষ হওয়ার আগে অভ্যাসবশত নাদির শাহের নিদ্রাভঙ্গ হয়। দেখেন তাঁর বাহুর ওপর মাথা রেখে সালমা অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে। তাঁর হাসি পায়। তিনি পারস্যের শাহ, হিন্দুস্থান জয়ের অভিযানে বেরিয়েছেন আর এই যুবতী লুণ্ঠিত সামগ্রীর একটি ব্যতীত কিছুই নয়। অথচ সে এখন তাঁর একটি বাহু নির্ভয়ে দখল করে রয়েছে। যেন তার দাবি। এর সঙ্গে জীবনে আর হয়ত দেখাই হবে না। হাজার রমণীর মধ্যে থেকেও হয়ত কোনদিন এভাবে তাঁর অন্তরঙ্গ হতে পারবে না। জীবনটা সত্যিই বিচিত্র। বিচিত্র বলেই এত আকর্ষণীয়।

সালমা তুচ্ছাতিতুচ্ছ হলেও নিজের বাহু খুব ধীরে ধীরে তার মাথার নিচ থেকে বের করে নেন নাদির শাহ, যাতে তার ঘুম না ভাঙে। এইটুকু মনুষ্যত্ববোধের পরিচয় তিনি নিজের অজ্ঞাতে দিয়ে ফেললেন। তবু সালমা জেগে ওঠে এবং নিজের অসংবৃত বেশবাস সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তার আগেই নাদির শাহ নিষ্ক্রান্ত হন। সালমার মনে হয় গতরাত থেকে এইপর্যন্ত সে সুদীর্ঘ স্বপ্ন দেখছিল। আবার সে হারেমের হাজার নারীদের মধ্যে একজন। শাহ এতক্ষণে বোধহয় তার নামটিও বিস্মৃত হয়েছেন।

জালালাবাদ থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে বাহার সুফলা স্থানটি মনোরম। দিগন্তে অনেক পাহাড়ের সারি। তাদের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা মেঘ ঘোরাফেরা করছে। সেই মেঘ কখনো

কখনো পাহাড় ছেড়ে এগিয়ে আসছে মাথার ওপর। কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে না। সব কিছুই যেন ক্রীড়াচ্ছলে হয়ে চলেছে।

পাহাড়গুলোর সামনে অনুর্বর ভূমিতে অসংখ্য শিবির। নাদির শাহ রয়েছেন সেখানে। একদল অশ্বারোহী দূর থেকে সেই শিবির শ্রেণী দেখে রাশ টেনে ধরল নিজ নিজ অশ্বের। দলপতি একজন তরুণ। তার অধীনে অশ্বসংখ্যা তিনহাজারেরও বেশি। তাছাড়া পশ্চাতে সাধারণ সিপাহীর দল রয়েছে। দলপতি শিবির শ্রেণীর ওপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর যেটির অন্বেষণ সে করছিল সেটি দেখতে পায়। নাদির শাহের পরিচিত নিশান পতপত করছে একটি তাঁবুর ওপরে। দলপতির মুখে হাসি ফুটে ওঠে। সে পাঁচজন অশ্বারোহী বেছে নিয়ে অন্যান্যদের সেখানে অপেক্ষা করতে বলে এগিয়ে যায় শাহের শিবির লক্ষ্য করে। তখন সূর্য মধ্যগগনে তাপ বিকিরণ করছে। অধিকাংশ সৈন্য মধ্যাহ্নের আহার প্রস্তুতে ব্যস্ত। প্রহরীরা অশ্বারোহীদের বাধা দেয়। বাধা পেয়ে তারা কি যেন দেখায় প্রহরীদের। কিছু কথোপকথন হয়। প্রহরীদের একজন একটু দূরে একটি স্থান থেকে একজনকে ডেকে আনে। সে এসেই তরুণ আগন্তুককে দেখে তাকে অভিবাদন জানায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীরাও যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে অশ্বারোহীদের নাদির শাহের শিবিরের দিকে যেতে অনুমতি দেয়। আরও নিকটে এসে তরুণ দলপতি বাকি চারজনকে একটি ফাঁকা স্থানে অপেক্ষা করতে বলে একটু এগিয়ে যায়।

নাদির শাহ আহারে বসেছিলেন। সেই সময় ছায়া দেখে তিনি তড়িৎগতিতে বাঁহাতে কুঠারটি তুলে নিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে সম্মুখে তাকিয়েই স্তম্ভিত হয়ে যান। জ্যেষ্ঠ পুত্র রিজা কুলি সম্মুখে দণ্ডায়মান।

আনন্দে ও উত্তেজনায় তিনি উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন। রিজা কুলি বলে ওঠে — উঠবেন না। খেয়ে নিন।

— তুমি যখন এসে পড়েছ, তোমার খাবার আনিয়ে একসঙ্গে খাব।

— তা তো হবে না। আমার দল নানান জায়গায় অপেক্ষা করছে আমার প্রত্যাবর্তনের জন্য। তারাও অভুক্ত।

— তা অবশ্য ঠিক। তুমি কিন্তু সঠিক দিনেই এসেছ। তোমাকে আজকের তারিখে আমার সঙ্গে এসে দেখা করতে বলেছিলাম।

— সেই জন্যেই ছুটে এসেছি। আপনি নিশ্চয় আনন্দিত হয়েছেন।

—- খুব। তুমি আমাকে অবাক করেছ।

— আমি আজ তাহলে আসি। সব কিছু ব্যবস্থা করে কাল সকালে আপনার কাছে চলে আসব।

— তাই এসো।

নাদির শাহের মনে মনে বড় ইচ্ছা ছিল দুজনা একসঙ্গে আহার করবেন। হল না। পুত্রের যুক্তি খণ্ডন করা যায় না। সামান্য একটু হতাশ হলেন। ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল খুব। এখন আর

ততটা নেই। অনেকটা প্রশমিত আপনা থেকে।

পুত্রকে তিনি সসৈন্যে এখানে দেখা করতে বলেছিলেন। কারণ তার বাহিনী থেকে কিছু সংখ্যক সৈন্য তিনি নিজে নিয়ে পুত্রকে পারস্যে পাঠিয়ে দেবেন। সেখানে এখন কেউ নেই। তিনি হিন্দুস্থানে প্রবেশের পূর্বেই জ্যেষ্ঠপুত্রকে বাল্কের বিদ্রোহী শাসনকর্তাদের দমনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তাদের পরাজিত করার পরও সে তারুণ্যের প্রাবল্যে পিতার নির্দেশমত ফিরে না এসে আরও এগিয়ে যায় এবং শুলুকের দুর্গ অবরোধ করে। সেই সময় নাদির শাহের পত্র। তাতে লিখেছিলেন সত্বর প্রত্যাবর্তনের জন্য। লিখেছিলেন তাঁর নিজের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়েও তার সঙ্গে পরামর্শ করবেন। এতে রিজা কুলি যারপরনাই আনন্দিত হয়েছিল। পিতার মত ব্যক্তিও তার সঙ্গে পরামর্শের গুরুত্ব দিতে শুরু করেছেন।

পরদিন রিজা কুলি যখন পিতার শিবিরে এসে পৌঁছল তখন তার জন্য অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন। স্বয়ং পিতা সবার চেয়ে আগে এগিয়ে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর এল তার নিজের দ্বিতীয় ভ্রাতা মুর্তজা কুলি। তাকে শাহ সঙ্গে সঙ্গে রাখেন সব সময়। মা বলতেন শৈশবে তার কঠিন অসুখ হয়েছিল। বাঁচার আশা ছিল না। নাদির শাহের তখনো সুসময় তেমন আসেনি। তারই মধ্যে তিনি দিন রাত পুত্রের শুশ্রূষা করে তাকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। সেই থেকে তাকে নিজের কাছে রাখতে ভালবাসেন। তাই বলে আশকারা দেননি কখনো। দুই পুত্রকেই সমান পরিশ্রমী করে তুলেছেন। তাঁর তৃতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র ইমাম কুলিও দুই ভাই-এর মত অধ্যবসায়ী, অকুতোভয় এবং যুদ্ধবিদ্যায় এখন থেকেই রীতিমত দক্ষ হয়ে উঠছে।

মুর্তজার পরে অন্যান্য উচ্চপদস্থ সেনানায়করা এসে রিজা কুলিকে অভিবাদন জানায়। পিতা যদি এই অভিযানে মাকে আনতেন তাহলে এরপর সে ছুটত মায়ের কাছে। কিন্তু এই দীর্ঘ অভিযানে মাকে সঙ্গে আনেননি। আসলে মা কোনদিনই পিতার সঙ্গী ছিলেন না। তিনি রাজধানীর প্রাসাদে আবদ্ধ থাকতে ভালবাসেন। মা এড়িয়ে যান এসব। পুত্রদের আবোল-তাবোল বলে বুঝিয়ে দেন। একবার প্রথম জীবনে তিনি স্বামীর সঙ্গিনী হয়েছিলেন। তখন এত সব কদর্যতা আর ব্যভিচার তাঁকে দেখতে হয়েছিল যে তিনি শিউরে উঠেছিলেন। তিনি এত বেশি বিচলিত হয়েছিলেন যে তাঁর জ্বর এসে গিয়েছিল। সেই জ্বর দীর্ঘ দুই মাস পরে নিরাময় হয়েছিল। ফলে তাঁর মাথার চুল সব উঠে গিয়েছিল। পরে অবশ্য অনেক ভাল চুল হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন নিজের কুরূপ গোপন রাখার জন্য ওড়না দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে তিনি স্বামীর আর এক রূপ দেখেছিলেন। তারপর যখনই স্বামী তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়েছেন, যখন তাঁর মুখের স্পর্শ পেয়েছেন, তখনো ভেবে চলেছেন, এই মানুষটার মধ্যে কত কি চাপা রয়েছে। শুধু সুযোগের অপেক্ষা মাত্র। তিনি স্বামীর সম্বন্ধে ভালভাবে জানতে পারেন হামিদার কাছ থেকে। হামিদা এখন তাঁর পরিচারিকা। কিন্তু ছয় বছর আগে শাহের তুরস্ক অভিযানে সে ছিল তাঁর হারেমের একজন সুন্দরী। তখন সে শাহকে খুব কাছ থেকে দেখেছে। বলতে চায়নি কিছু। তাতে জীবনের আশঙ্কা। একদিন মুখ ফস্‌কে একটা আলগা কথা বের হয়ে পড়েছিল।

বুদ্ধিমতী শাহের বেগম কথাটা শুনেই চেপে ধরেন হামিদাকে। তখন সে বাধ্য হয়ে শাহের সচল হারেমের ভেতরের কথা একটু একটু করে বলেছিল আব অনুনয় করেছিল একথা শাহকে না বলতে, কারণ বললে, অবধারিত মৃত্যু। আর সেই মৃত্যু হবে কষ্টদায়ক। সে বলেছিল একদিন মাত্র শাহের শয্যাসঙ্গিনীও হয়েছিল সে। সেই যুদ্ধ থেকে ফেরার আগেই তার অদ্ভুত এক রোগ হয়। গায়ের সমস্ত চামড়া উঠে যায়। প্রথমে শ্বেতী রোগগ্রস্ত মানুষের মত দেখাত তাকে। তারপর নতুন ত্বক সৃষ্টি হতে থাকে। কিন্তু সেই ত্বক ছিল পোড়া পোড়া। এখন যেমন দেখায়। সৌন্দর্য কোথায় চলে গেল। দেহেব গঠনও কেমন বেঢপ হয়ে পড়ল। তারপর একজনের অনুগ্রহে এখানে আশ্রয় পেয়েছে। বেগম সাহেবা যদি অনুগ্রহ করেন, তাহলে সে আজীবন থেকে যেতে পাবে। বেগম সাহেবা তখন বারবার হামিদার দিকে চাইছেন এবং ভাবছেন এই রমণীও তাঁর স্বামীর আস্বাদিত।

মুর্তজা ততক্ষণে নিজের জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বহুদিন পরে কাছে পেয়ে এখানকার অবস্থা সব বলতে শুরু করে। নাদির শাহ সেটা লক্ষ্য করে বাধা দেন না। তিনি শুধু বলেন — আজ তোমার সম্মানে বিশেষ খানার আয়োজন হয়েছে।

শিবিরে বসে অন্যান্য সেনানায়কের সামনে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এ যাবৎকাল যা কিছু হয়েছে সব বিস্তারিতভাবে বললেন। তারপর বললেন — আমার ইচ্ছা দিল্লী পর্যন্ত যাব। তোমার কি অভিমত?

— আমি সদ্য এসেছি। দিল্লী সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। ওরা কতটা শক্তিশালী জানা প্রয়োজন।

নাদির শাহ বলেন — দেখ, ওরা যদি ওদেব শক্তিকে সংহত করতে পারে তাহলে পারস্য ছাড়িয়ে তুরস্ক অবধি ভূখণ্ড পদানত করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু ওদের প্রশাসন অত্যন্ত দুর্বল। নিজেদের মধ্যে ওদের অনৈক্য। পবস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে শত্রুতা করে যাচ্ছে। বাদশাহ নামেই বাদশাহ। তাঁকে কেউ ভ্রূক্ষেপ করে বলে মনে হয় না। যাদের ওপর তিনি নির্ভর করেন, তাদের কেউ আমাদেব দেশেব, কেউ তুর্কী, কেউ আফগান, কেউ পাঠান। কোন মিল নেই। সবচেয়ে বড় কথা হিন্দুস্থান সম্বন্ধে কারও মাথাব্যথা নেই, টানও নেই। শুধু নিজেদের উন্নতির জন্য ব্যস্ত। আর ঐশ্বর্য। এত ঐশ্বর্য ওদের তবু তৃপ্ত নয়।

— আপনার কি তাই মনে হয় যে দিল্লী আক্রমণ করা যায়?

— আমার তো মনে হয়।

— আমি সঠিক জানি না, তবে শুনেছি রাজপুতরা অত্যন্ত শক্তিশালী।

— ঠিকই শুনেছ। শুধু তাদের জন্য আমার একটু দ্বিধা ছিল। আর একজন রয়েছেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয়। পেশোয়াব বাজীরাও। প্রবল পরাক্রমশালী। তবে তাঁর সঙ্গে বাদশাহের এতটুকুও বনিবনাও নেই। আমি আক্রমণ করলে বাদশাহের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াবেন না তিনি।

রিজাকুলি গভীর ভাবে চিন্তা করে বলে — আপনি যখন এতটা ভেতরে ঢুকে পড়েছেন,

আর আপনার বিশ্বাস যখন এত দৃঢ়, তখন দিল্লীর পথে অগ্রসর না হওয়ার কারণ দেখি না।

তার কথায় নাদির শাহের মুখে হাসি ফোটে। অন্যান্য সেনানায়করা হর্ষোৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

কয়েকদিন সেখানে অতিবাহিত করে রিজা কুলি। তারপর তার বিদায় নেওয়ার আগের দিন আর একটি অনুষ্ঠানে নাদির শাহ্ তাকে সমগ্র পারস্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। বলেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রকারান্তরে শাহের ভূমিকাই পালন করবে। সে কোন অঞ্চলের যে কোন প্রশাসককে বরখাস্ত বা বদলি করার ক্ষমতা রাখবে। রিজা কুলি এতে খুবই আনন্দিত হয়।

নাদির শাহ্ আর একটি নিয়মের প্রবর্তন করেন, পারস্যের শাহ্ এবং তাঁর পুত্রদের জন্য। সব দেশে চিরকালের নিয়ম হল, মাথার তাজ-এর বাঁ দিকে পালক শোভা পায় সুলতান বা বাদশাহ এবং অন্যান্য রাজপুত্রদের। তিনি নিয়ম করলেন তাঁর বংশের সন্তানেরা তাজ বা টুপির ডান দিকে জিকা বা পালক ধারণ করবে।

রিজা কুলির স্বদেশে যাত্রার পরের দিনই নাদির শাহ্ সসৈন্যে পেশোয়ারের অভিমুখে রওনা হন। পেশোয়ারের অধিবাসীদের কাছে নাসির খাঁয়ের পরাজয়ের খবর আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। তাই তারা কোনরকম বাধার সৃষ্টি করল না। নাদির শাহ্ ভাবলেন ভালই হল। পেশোয়ারে তিনি কিছুদিন বিশ্রামের আয়োজন করলেন। দিন ভালই কাটছিল। কিন্তু সেই সময় তিনি একটি দুঃসংবাদ পেলেন। তাঁর প্রিয় ভ্রাতা ইব্রাহিম খাঁ শিরবান অঞ্চলে কাখ-এ শত্রুদের হাতে নিহত হয়েছে। তিনি অত্যন্ত মর্মবেদনা অনুভব করলেন। পিতৃহীন অবস্থায় সমবেদনাহীন আত্মীয় এবং শত্রু পরিবেষ্টিত গৃহে কত কৌশলে তিনি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। কখনো কখনো তাকে নিয়ে গোপন কোন আস্তানায় রেখে দিতেন আত্মীয়দের আওতার বাইরে। এত করেও কিছু হল না। সে নিহতই হল। দুনিয়ায় মিত্র বলে কেউ নেই। সবাই দুশমন। তাদের সঙ্গে সেইরকম ব্যবহার করা উচিত। দয়া-দাক্ষিণ্য দেখানো মূঢ়তা।

পুত্র মুর্তজা পিতার মনের অবস্থা অনুমান করে তাঁর কাছে ঘেঁষতে চাইল না। কদিন আগে জ্যেষ্ঠভ্রাতা আসায় কত আনন্দ করল। আর এখন ভিন্ন পরিবেশ। মুর্তজা খুল্লতাত ইব্রাহিম খাঁকে মাত্র একবার দেখেছে জীবনে। তিনি সচরাচর রাজধানীর বাইরেই থাকতেন নানা কাজে। তাঁর পরিবার সব সময় সঙ্গে থাকত। তাই ইব্রাহিম খাঁয়ের কোন পুত্রকন্যাকে সে দেখেনি কখনো। তাঁর মৃত্যু তার মনে বিশেষ কোন ছাপ ফেলতে পারে না। সে অন্যান্য সেনাপতিদের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করে। কারণ এতদিন তারা যেভাবে অগ্রসর হয়েছে এখন থেকে তাদের গতি তেমন অবাধ হবে বলে মনে হয় না। সম্মুখে কয়েকটি নদী রয়েছে আর রয়েছে লাহোরের অধিকর্তা জ্যাকেরিয়া খাঁ। তার সম্মুখীন হতে হবে। সে সহজে পথ ছাড়বে না পারস্যের বাহিনীর। তার সম্বন্ধে খবর রয়েছে যে সে একজন জেদী, সাহসী ও কুশলী যোদ্ধা। তবে দেশের প্রতি তার টান কতটা মজবুত তার প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি।

চেনাব নদীর নিকটবর্তী শহর ওয়াজিরাবাদ। তার ছয়ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র কেল্লা, নাম তার কুঞ্জমাজ্‌রা। দুর্গাধিপতির নাম কালান্দার খাঁ। তার অধীনে ছয় হাজার সৈন্য রয়েছে। সে নাদির শাহের অগ্রগতির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে। লাহোরে জ্যাকেরিয়া খাঁয়ের নিকট নিয়মিত পারসিকদের অগ্রসর হওয়ার বার্তা দিয়ে চলেছে। রাজনীতি সে-ও যে বোঝে না তা নয়, কিন্তু দেশের সমূহ বিপদের দিনেও যে নিজের নিজের লাভক্ষতির হিসাব কষে রাজনীতি চলে সেটা তার কল্পনার বাইরে। জ্যাকেরিয়া খাঁ-এর ওপর তার অগাধ আস্থা। আস্থা না থাকার কারণ নেই। সে জানে মানুষটা সাচ্চা। কিন্তু সাচ্চা মানুষের মনেও অজ্ঞাতে কিংবা অন্যের প্ররোচনায় ঘুণপোকা আশ্রয় নিতে পারে একথা তার জানা নেই। সে জানে না নাদির শাহ কাবুল অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাকেরিয়া বাদশাহকে উৎকণ্ঠিত হয়ে জরুরী পত্র প্রেরণ করেছিল। বাদশাহ সেই পত্রকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেননি। তাই সেই পত্রের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেননি। কিন্তু তার জবাব না পেলেও পরিবর্তে সে দুটি গোপন পত্র পেল দরবারেরই দুই প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকট থেকে। একজন হল দক্ষিণভারতের নিজামুল-মুল্‌ক, অপরজন হচ্ছে অযোধ্যার শাসনকর্তা সাদাউদ্দিন খাঁ বা সংক্ষেপে সাদাত খাঁ। উভয়ের পত্রের মর্মার্থ বলতে গেলে একই। দুজনে দুজনার পত্র প্রেরণের কথা নিশ্চয় জানে না। তবু বক্তব্যে আশ্চর্য রকমের মিল। জ্যাকেরিযা খাঁ প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে যায়। পরে গভীর ভাবে চিন্তা করে। বুঝতে পারে সে যতই প্রতিরোধ গড়ুক না কেন, কোন ফল হবে না। একটা হতাশা তাকে পেয়ে বসে। তবে মনে মনে ঠিক করে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করবে প্রতিরোধের। ফল কখনই হবে না। দিল্লীর দৃঢ় সমর্থন না পেলে সম্ভব নয়। দুই পত্রেই বলা হয়েছে নিষ্ক্রিয় শাহানশাহের জন্য জান কবুল করে লাভ নেই। তার চেয়ে নাদির শাহের আগমন শ্রেয। দিল্লীর তক্তভাউস একটা প্রবল ঝাঁকুনি খাবে। তাতে ফল ভালই হবে। নাদির শাহ জয়ী হলেও কখনো পাকাপোক্ত ভাবে এখানে থাকবেন না পারস্যকে ফেলে রেখে। সুতরাং বাধা দিলেও যাতে নিজের কম ক্ষতি হয় সেটাই দেখবেন।

জ্যাকেরিযা খাঁ দিল্লীর হালচাল যতটুকু জানে সুদূর ওয়াজিরাবাদের একজন সামান্য দুর্গাধ্যক্ষের পক্ষে তার ক্ষুদ্রাংশ জানাও সম্ভব নয়। সে খবর পায় নাদির শাহ পেশোয়ার ত্যাগ করে আসছেন। তাঁর হুকুমে অটোকের নিকটবর্তী সিন্ধুনদের ওপর সারি সারি নৌকা সাজিয়ে সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এই সেতু দেখে নাকি সবাই তাজ্জব বনে গিয়েছে। এটি নির্মাণ করেছে সুদূর ফরাসি দেশের শ্বেত চর্মের বোনাল নামে এক সেতু-বিশারদ। লোকটাকে কোথা থেকে পেলেন নাদির শাহ কে জানে। তবে ওই সেতু দিয়ে তাঁর বাহিনী সহজে পার হতে পারবে সিন্ধুনদ।

কালান্দার খাঁ কুঞ্জমাজরা কেল্লার প্রাকারের ওপর থেকে সব সময় দিকচক্রবালের দিকে চেয়ে থাকে। সে সুনিশ্চিতভাবে জানে একদিন ওই প্রাকার থেকেই দেখতে পাবে ভূচর পঙ্গপালের মত অসংখ্য মানুষের আবির্ভাব ঘটবে দিগন্তের সীমারেখায়। তাদের তুলনায় তার শক্তি তুচ্ছাতিতুচ্ছ। অথচ অন্যরকমও হতে পারত। এই কুঞ্জমাজরাকে ঘিরে একটা গৌরবময়

ইতিহাস রচিত হতে পারত। নাদির শাহ্ প্রচণ্ডভাবে বাধা পেয়ে পরাজিত হয়ে হতোদ্যম অবস্থায় স্বদেশ অভিমুখে পলায়ন করতেন। আর তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে পারত বিজয়গর্বে গর্বিত হিন্দুস্থানের অসংখ্য সেনানী। সেও তাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারত। যৌবনে এর চেয়ে উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা আর কি ঘটতে পারে। এরপর সে প্রৌঢ় হবে বৃদ্ধও হবে। তখন আর এত উৎসাহ অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু নাদির শাহ যেভাবে এগিয়ে আসছেন তার যৌবনেরও ছেদ পড়ে যেতে পারে অকালে।

পৃষ্ঠদেশে কোমল হাতের স্পর্শ। জেনেশুনেও ঘাড় ফেরায় সে। রুবিয়া।

— তুমি রোজ এখানে বসে কি দেখ বল তো?

একটু হেসে কালান্দার খাঁ বলে — নাদির শাহকে।

— তাকে এখান থেকে দেখবে কি করে?

— আজ না হলেও একদিন দেখা যাবে।

— চল আমরা লাহোরে চলে যাই। মায়ের জন্য মন কেমন করছে।

— আমি তো যেতে পারব না। তুমি একা যাবে? সায়েরাকে নিয়ে?

রুবিয়ার ভ্রূতে তিরস্কার। সে বলে — তোমাকে ফেলে?

— আমি পরে যাব সুযোগ মত।

— আমি যেতে চাই না।

— গেলে ভালই করতে। সায়েরা কোথায়?

— ঘুমোচ্ছে।

— ভালই হয়েছে। তুমি একটু কাছে বসো।

রুবিয়া স্বামীর পাশে বসে বলে — অত ধারে বসো না। একটু সরে এসো।

— নীচে পড়লে অদৃশ্য হয়ে যাব।

— খুব হয়েছে। কেল্লার শীর্ষে এত জায়গা থাকতে এখানে বসে যে কি সুখ পাও।

— সেই সুখ অন্য সুখ।

— তা বুঝি। শোন, তুমি আমাকে কিছু বলো না বলে ভেবো না আমি নির্বোধ।

— তোমাকে যে নির্বোধ ভাবে তার চেয়ে বড় নির্বোধ কেউ নেই।

— না, আমি সেই নির্বোধের কথা বলছি না। আমি বলতে চাইছি, নাদির শাহ হিন্দুস্থানে ঢুকে পড়ার পর হালফিল পরিস্থিতির কথা।

কালান্দার খাঁ একটু থমকে যায়। সে বিবির চোখের দিকে চাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু রুবিয়া মস্তক অবনত করে বসে রয়েছে এবং সেইভাবে থাকাটা উদ্দেশ্যবিহীন নয়। সে চায় তার স্বামীর একটু অস্বস্তি হোক।

কালান্দার খাঁ সামান্য ঘুরে বসে বিবির মাথাটা আস্তে করে ধরে থুতনিতে হাত দিয়ে মুখখানা ওপরে তোলে। রুবিয়া হেসে ফেলে।

— কতটুকু জান বেগম?

— সবটুকু। আমাদের বাঁদী হাতিমা স্থানীয় স্ত্রীলোক। তার স্বামী জাকির ওয়াজিরাবাদে কাজ করে। সেখানে অনেক বড় বড় লোকের যাতায়াত আছে।

— কি শুনেছে জাকির?

— শুনেছে এই কুঞ্জমাজরা কখনো অক্ষত থাকবে না। এব ওপর নদির শাহের আক্রমণ হবেই। কারণ এটাই একমাত্র কেল্লা এদিকে যা নাদির শাহকে বাধা দিতে পারে।

— হুঁ। আর কি বলেছে?

— তুমি রাগ করবে না?

— তোমার ওপর?

— বলেছে নাদির শাহের মত তাঁর বাহিনীও নৃশংস। যেখান দিয়ে যায় মেয়েদের ছাড়ে না। তুলে তো নেয়ই। ওদের হাতে পড়লে যা তা করে।

— হুঁ। আর কি বলেছে?

— বলেছে আমাকে এখানে রাখা ঠিক হচ্ছে না।

— একেবারে ঠিক কথা বলেছে। আমিও সেই কথা ভাবছিলাম। বড় দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তোমাকে বলতে ভরসা পাচ্ছিলাম না।

— কেন গো?

— কেন আবার? তুমি আমাকে ছাড়তে চাও না বলে। তার ওপর মেয়েটা রয়েছে। এখন বুঝলে তো?

— তোমাকে ছেড়ে গেলে তো?

— সব শুনেও?

— হ্যাঁ।

— ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা ভেবেও? মেয়েটা?

রুবিয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে কালান্দার খাঁকে জড়িয়ে ধরে। কালান্দার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অনেক মিষ্টি কথা বলে। তার অশ্রুজল মুছিয়ে দেয়।

ওরা সেদিন অনেক রাত অবধি প্রাকারের ওপরে বসে ছিল। রুবিয়া জানে, সায়েরার খাওয়ার সময় হয়েছে। হয়ত মাকে না দেখতে পেয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। হাতিমা ঠিক সামলে নেবে। স্বামীর পাশে বসে অন্ধকাবের দিকে চেয়ে থাকে। শীতল হাওয়া ছুটে আসছে আফগানিস্তানের আরও পশ্চিম দিক থেকে। পাহাড়গুলো আর দেখা যাচ্ছে না। তবে দলে দলে জোনাকী পোকা বের হয়েছে।

ওরা কথা বলে না, তবু কথা হয় উভয়ের মধ্যে। ওরা ভবিষ্যতের চিন্তায় মগ্ন। রুবিয়া জানে, নারীত্ব রক্ষার জন্য তাকে এই কেল্লা ছেড়ে যেতে হবে। কন্যার প্রাণের জন্য লাহোরে ফিরে যেতে হবে। এখানে একা পড়ে থাকবে তার স্বামী। তারপর......রুবিয়া আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে। কালান্দার খাঁ তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। যা অবধারিত তাকে অস্বীকার করবে কে ? রুবিয়া জানে তার স্বামী আত্মসমর্পণ করবে না কখনই। সীমিত শক্তি নিয়ে নাদির

শাহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। তারপর ভাগ্যে যা থাকে তাই হবে।

জ্যাকেরিয়া খাঁ কালান্দারকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল যে তার পক্ষে কোন রকম সাহায্য পাঠানো অসম্ভব। কারণ সে বাদশাহের নিকট অনেকবার অনেকভাবে সাহায্য চেয়েও কিছুই পায়নি। সুতরাং কালান্দার খাঁ ইচ্ছা করলে কুঞ্জমাজরা ছেড়ে চলে আসতে পারে। কারণ ওখানে থেকে কোন লাভ নেই। জ্যাকেরিয়া খাঁ অবশ্য কালান্দারকে জানায়নি যে লাহোরে এসেও কোন লাভ হবে না। কারণ ক্ষমতাশালী ওমরাহদের মধ্যে অনেকেই চায় না নাদির শাহ ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান।

শেষে চেনাব পার হয়ে সদলবলে এল পারস্য বাহিনী। কালান্দারের সৈন্যসংখ্যা খুব বেশি হলে ছয় হাজার। অসম লড়াই। একেবারে সম্মুখ রণে না গিয়ে কালান্দার তার বাহিনীকে এমনভাবে সজ্জিত করল যাতে সারাটা দিন নষ্ট হল তাকে পরাস্ত করতে। নাদির শাহ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন এই সামান্য সংখ্যক শত্রুকে পরাভূত করতে এত সময় এবং এত সেনার জীবন নষ্ট হতে দেখে। শেষে নিজেই তিনি আক্রমণ চালান। সেই আক্রমণের প্রচণ্ডতাকে সামলাবার সাধ্য কালান্দারের ছিল না। তার ঘনিষ্ঠরা পরামর্শ দিল আত্মসমর্পণ করতে। তাহলে জীবন রক্ষা পাওয়ার ক্ষীণতম সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু কালান্দারের মনে হল বড় বেশি ছোট হয়ে যাবে সে দুনিয়ার কাছে। সে ঘনিষ্ঠদের বলে তারা যা খুশি করুক, তার পক্ষে সম্ভব নয় আত্মসমর্পণ করা। তখন সবাই তাকে পরিত্যাগ করে কেল্লার অভ্যন্তরে ছুটে চলে গেল। সে একা দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। এটা বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়। নাদির শাহ ভাবতে পারেননি সেই দুর্গাধ্যক্ষ। তিনি ভাবলেন সে আত্মসমর্পণের তাগিদে ওভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি এগিয়ে যেতেই কালান্দার খাঁ সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে। বিস্মিত নাদির শাহ সরে যাওয়ারও সময় পাননি। তাঁর ঠিক পশ্চাতে যে সিপাহী ছিল সে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে বল্লম নিক্ষেপ করে কালান্দারকে লক্ষ্য করে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। তার স্কন্ধ ভেদ করে সেই বল্লম। কালান্দার খাঁ মাটিতে পড়ে যায়।

নাদির শাহ কুঠার হাতে রাগে কাঁপতে কাঁপতে তাকে জিজ্ঞাসা করেন -- তুমি এভাবে আক্রমণ করলে কেন?

— আমিই এখানকার রক্ষক কালান্দার খাঁ।

অন্য কোন বাদশাহ বা সেনাপতি হলে কি হত বলা যায় না, তবে নাদির শাহ কোনরকম ভাবপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দেন না। সম্ভবত ভাবাবেগ বলে যে একটা কিছুর অস্তিত্ব না থাক অনুভূতি রয়েছে এটা তাঁর সম্পূর্ণ অজানা। তাঁর কুঠার সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে কালান্দার খাঁয়ের শিরকে দেহচ্যুত করে। রুবিয়া আর সায়েরার কথা মনে করার অবকাশ পেল না সে শেষ মুহূর্তে। তবে একা যখন দাঁড়িয়েছিল সে কেল্লার সম্মুখে তখন তাদের কথা মনে হয়েছিল। বিদায়ের সময় শিশুটি যেভাবে দুবাহু বাড়িয়ে দিয়েছিল তার দিকে সেকথা তারা চলে যাওয়ার পরে বারবার মনে হত। সেই মুহূর্তটুকু যেন কোন শিল্পীর আঁকা ছবির মত তার চোখের

সামনে চিরস্থায়ী হয়ে ফুটে থাকত। আর তার মনের মধ্যে গুমরে উঠত যাওয়ার আগের রাতের রুবিয়ার সেই আকুল ক্রন্দন। সেই কান্নার যেন শেষ ছিল না।

নাদির শাহ্ যত এগিয়ে আসছেন, দিল্লীতে তত বেশি চক্রান্তের জাল বোনা হচ্ছে, একের বিরুদ্ধে অপরের। খান দউরান নিজামুল মুল্‌কের দুচোখের বিষ, কারণ বাদশাহ্ তার কথায় ওঠেন বসেন। নিজামুল-মুল্‌ককে খান দউরান দেখতে পারে না, কারণ সে দক্ষিণভারতে থাকলেও রাজধানীতে আসার সঙ্গে সঙ্গে শাহানশাহ্ তার দিকে সম্পূর্ণভাবে হেলে পড়েন। খান দউরান নামে যে একজন ব্যক্তি রয়েছে দরবারে একথা তখন একেবারে বিস্মৃত হয়ে যান। নিজাম ভীষণ চতুর। সে নিজে দক্ষিণে থাকে বলে উজির কামরুদ্দিন খাঁয়ের পুত্র-কন্যার সঙ্গে নিজের পুত্র-কন্যার বদলি বিবাহ্ দিয়েছে। ভেবেছে তাতে এদিকের দল তার প্রতি কিছুটা সদয় থাকবে। কিন্তু কামরুদ্দিন খাঁ ভালমানুষ। সে এইসব চক্রান্তের মধ্যে আছে বলে খান দউরানের মনে হয় না। তবু এই ধরনের আত্মীয়ের বিরুদ্ধাচরণ করাও তো সহসা সম্ভব হয় না। সেইটুকুই লাভ নিজামের। ওদিকে সাদাত খাঁ অযোধ্যা থেকে মাঝে মাঝে এসে কুয়াশার সৃষ্টি করে। তার মতলব যে কী, বোঝা দুষ্কর। সে যেন উচ্চস্বরে কথা বলতেই জানে না। সব সময় এর ওর কানের কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে। খান দউরানের কানের কাছেও মুখ আনে। তবে তাকে যে সমস্ত কথা বলে সেগুলো দরবারে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়েও বলা যায়। এটাই বোধহয় তার কৌশল। সবাই ভাববে সাধারণ কথা এইভাবে বলা তার অভ্যাস। কিন্তু আসল সময় আসল কথা আসল লোকের কানে পৌঁছে দেয় এইভাবে।

সেদিন শাহনশাহ্ মহম্মদ শাহ দরবারে এসে সাধারণ দুএকটি কথার পর কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকেন। এই বসে থাকাটা তাঁর পিতামহীর পরামর্শে। গত রাতে অশীতিপর পিতামহী বেগম মেহের পরভির তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। পিতামহীর অস্তিত্বের কথা বিস্মৃত না হলেও তাঁর সক্রিয়তাব কোন লক্ষণ বাদশাহ অনেক দিন পাননি। তাই রীতিমত বিস্মিত হন।

তাঁর কক্ষে প্রবেশ করতেই বৃদ্ধা বেগম প্রশ্ন করেন — নাদির শাহ্ কে ?

— আপনার কানে এই নাম কে ঢোকালো?

বৃদ্ধার শ্রবণশক্তি অনেকটা হ্রাস পাওয়ায় তিনি একটু উচ্চকণ্ঠে কথা বলেন এবং বেশ দাপটের সঙ্গেই বলেন এখনো। তিনি বলেন — দরবার ছাড়া যে নাম নিম্নস্বরে মহলের সবাই আলোচনা করছে সেই নাম আমার কানে ঢোকানোর লোকও রয়েছে। আমার কড়া হুকুম রয়েছে দেশের নতুন পরিস্থিতির কথা আমাকে যেন সম্যক জানানো হয়। নইলে শাস্তি হবে হাত-পা বেঁধে যমুনার জলে বিসর্জন। কারও সাধ্য নেই আমাকে অমান্য করে। শাসন চালাতে গেলে দেহের শক্তির চেয়েও অনেক বেশি শক্তি প্রয়োজন মনের। দুর্বল মন নিয়ে হারেমে বসে থাকা যায়, দরবারে নয়। নাদির শাহ কে আমার জানা আছে। এবারে বল নাদির শাহ এখন কোথায়।

বাদশাহ একটু অপ্রস্তুত হন। তিনি বলেন — তিনি আফগানিস্তানে। সেখান থেকে কিছু লোক প্রায়ই তাঁর দেশে ঢুকে পড়ে বলে শাস্তি দিতে এসেছেন।

— তোমার দেশে? কোন্ অধিকারে?

— অধিকার আবার কি ? ফিরেই তো যাবেন।

— বিশ্বাস কর সে কথা?

— না কবার কি আছে?

— তুমি হয়ত জান না হিন্দুস্থানের ভেতরে প্রবেশ করার মত বুকের পাটা কোন দেশের ছিল না। তোমরা কোথায় টেনে নামিয়েছ দেশটাকে। আমি তো জানি মোহব আব টাকা পয়সা নিয়ে নয়ছয় হচ্ছে। সবাই ধনী হতে চায়, শহরে মহল বানাতে চায়। দেশের দিকে কারও লক্ষ্য নেই। মুষ্টিমেয় যারা চিরকাল ভাল থাকে, তেমন কিছু লোক এ পর্যন্ত দেশটাকে নিরাপদে রেখেছিল আব পারল না। পারল না তোমার আশেপাশের লোকগুলোর দৌবাত্ম্যে আর অতি লোভে।

— আমাকে ডেকে এনে হঠাৎ এত কটু কথা শোনাচ্ছেন কেন?

— বুঝতে পারছ না? যাতে তোমার হুঁশ হয়। তুমি ভাবছ এখনো, যে নাদির শাহ ফিরে যাবে। হিন্দুস্থানের শাহানশাহ হয়ে একথা ভাবছ কি কবে? দেশের ইতিহাস না জেনে ময়ূরসিংহাসনে বসে পড়েছ বলে এই দশা। নাদির শাহ যতবড় যোদ্ধাই হোক না কেন, এদেশে প্রবেশের আগে পাঁচশোবার চিন্তা করেছে। তারপর রীতিমত শক্তিসঞ্চয় করে এসেছে। তুমি ভাবছ সে চলে যাবে?

— আমি একা নই, আমির ওমরাহ সবার একই ধারণা।

— তাদের অধিকাংশ অলস, কেউ ভীরু এবং কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতকও।

— আপনি হারেমে বসে থেকে এভাবে বলবেন না। আপনার তো বাহিরের জগত সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই।

— ধারণা করতে হলে চরে বেড়াতে হয় নাকি? অন্তর্দৃষ্টিব প্রয়োজন। এই অন্তর্দৃষ্টি ছিল আগেকার বাদশাহদের। যাহোক, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, তুমি তো দরবারে যাচ্ছ। আজ গিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে কিছুক্ষণ। দেখবে কেউ নিজে থেকে নাদির শাহ সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে কি না। তাহলেই বুঝতে পারবে ওরা কতটা আগ্রহী। ওদেরও ঘন ঘন পরীক্ষার মধ্যে ফেলতে হয়। নইলে যে মানুষ তেমার গর্দান নিতে চায়, তাকেও চিনতে পারবে না।

বাদশাহ মহম্মদ শাহ তাই তক্তাউসে বসে নীরব থাকেন কিছুক্ষণ। দরবার কক্ষও স্তব্ধ। বাদশাহ দেখেন নিজামুল মুল্ক আবার এসেছে। প্রায় মাসখানেক সে ছিল না। নিজের রাজ্যে ছিল। সঙ্গে পুত্র গাজীউদ্দিনকে এনেছে দেখা যাচ্ছে। উজির কামরুদ্দিনের কন্যার সঙ্গে গাজীর বিবাহ হয়েছে। বাদশাহ বুঝলেন কোন মতলব রয়েছে নিজামেব হয়ত।

কিন্তু দাদী তো ঠিকই বলেছেন। এরা নাদির শাহ সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য কবছে না। তবে সামসামুদ-দৌলা খান দউরান মুচকি হাসছে। নিজামুল-মুল্ক-এর পেছনে লাগবে এরা এবাব।

নিজাম উঠে দাঁড়াতেই একজন বলে ওঠে — দক্ষিণ ভাবতের বাঁদর নাচতে শুরু করেছে। সঙ্গে সঙ্গে হাস্যধ্বনি। বাদশাহ্ হাসেন না। তাই দেখে হাসি বন্ধ হয়ে যায়। বাদশাহ গম্ভীর হয়ে ভাবেন, বৃদ্ধ বয়সে মেহের পরভিনের মস্তিষ্ক যতখানি পরিষ্কার রয়েছে, তাঁর তাও নেই। এরা সব দরবারকে মজলিস করে তুলছে আর এর জন্য সব চাইতে দায়ী তিনি নিজে। তাঁর অক্ষমতা আর অলসতা এদের উৎসাহিত করে তুলেছে। নিজেরাও আলস্যকে প্রশ্রয় দিচ্ছে।

নিজামের মুখমণ্ডল রাগে লাল হয়ে ওঠে। সে বলে — মেহেরবান দরবার গুরুত্ব বিষয় নিয়ে আলোচনার স্থান। এটা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অপমান করার স্থান নয় বলে আমার বিশ্বাস।

বাদশাহ্ বলেন — আমারও তাই বিশ্বাস। কিন্তু অতীতে আপনিও এই ধরনের আচরণকে প্রশ্রয় দিয়েছেন দেখেছি। তাই কিছু বললাম না আজকের দোষী ব্যক্তিদের। বলতে পারলাম না। আমি জানি দরবারের ব্যক্তিদের রুচি থেকে শুরু করে সবকিছু এত নিম্নমানের হয়ে গেল কি করে? আমার অপদার্থতার জন্য কি ?

একসঙ্গে অনেকে না না করে ওঠে। ময়ূর সিংহাসন থেকে দুই হাত ওপর দিকে উঠতেই সবাই নীরব হয়।

— আমি আশা করেছিলাম, আজ আপনারা অন্তত নাদির শাহ সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করবেন। আজও দেখলাম আপনারা নির্ভাবনায় রসিকতা শুরু করেছেন।

সাদাত খাঁ বলে ওঠে — সেটা কখনই উচিত হয়নি। মশকরা করারও সময় রয়েছে। তাও শালীনতা বজায় রেখে। অনেক গুরুগম্ভীর আলোচনার পর তক্তুতাউস থেকে হালকা কথা শোনা গিয়েছে সেই বাদশাহ্ আকবরের সময় থেকে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে নয়। তবে একটা কথা আমি বিশ্বাস করি যে নাদির শাহ্ ফিরে যাবেন।

— এখনো একথা বলতে পারছেন?

— হ্যাঁ জাহাঁপনা। শেষ চিঠিতেও সেই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তিনি।

— তাঁর কথা বিশ্বাসযোগ্য?

— অবিশ্বাসের কাজ এখন পর্যন্ত তিনি করেননি।

— ভবিষ্যতে করলে?

— সম্ভাবনা কম। তবে আমরা রুখে দাঁড়ালে তাঁর সাধ্য নেই অগ্রসর হওয়ার।

— কিন্তু কবে রুখে দাঁড়াব? তেমন কিছু করতে হলে আমাদের প্রস্তুতির প্রয়োজন।

নিজামুল মুলক বলে — সাদাত খাঁ যথার্থ বলেছেন খোদাবন্দ। নাদির শাহ দিল্লীর দিকে এলে আমরা বাধা দিলে পালাবার পথ পাবেন না।

— কি জানি, কোন উদ্যোগ তো দেখছি না।

সেই সময় একজন এসে ঘোষণা করে লাহোরের অধিকর্তা জ্যাকেরিয়া খাঁ-এর পুত্র ইয়াহিয়া খাঁ বাদশাহের দর্শনপ্রার্থী। শুনে নিজামুল ও সাদাতের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। কিন্তু অধিকাংশ আমির-ওমরাহের মুখে ঔৎসুক্য ফুটে ওঠে। এবারে আসল পরিস্থিতি বোঝা যাবে।

বাদশাহ মহম্মদ শাহ্ তাকে ভেতরে নিয়ে আসতে বলেন।

একটু পরে ইয়াহিয়া খাঁ এসে প্রবেশ করে শাহানশাহকে আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করে।

বাদশাহ তাকে দেখে মুগ্ধ হন মনে মনে। অল্পবয়সী তরুণ। ছিপছিপে গড়ন, গৌরবর্ণ। চোখে-মুখে তার সপ্রতিভ ভাব। উজ্জ্বল দুই নয়ন। নিজের পুত্রের কথা ভাবেন তিনি। ইয়াহিয়ার মত দীর্ঘদেহী নয় সুলতান আহমেদ, কটিদেশ তার এত ক্ষীণ নয়, সেখানে মেদের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এর মধ্যেই। ইয়াহিয়াকে দেখে মনে হচ্ছে, সে খুবই পরিশ্রান্ত।

বাদশাহ ধীরে ধীরে বলেন — নাদির শাহের বাহিনী কতদূর অবধি এসে থেমেছে?

ইয়াহিয়ার চোখে বিস্ময়। সে বাদশাহকে বলে — জাহাঁপনা, তিনি লাহোর আর দিল্লীর মধ্যে যত সড়ক রয়েছে সব জায়গায় সৈন্য মোতায়েন করেছেন। আমি অনেক কৌশলে রাতের অন্ধকারে একদল সৈন্য নিয়ে নাদির শাহের বাহিনীর মধ্য দিয়ে চলে এসেছি।

দরবার স্তব্ধ। নিজামুল মুলক আর সাদাত খাঁয়ের মধ্যে চোখ চাওয়াচাওয়ি হয়। দাদীর কথাগুলো মনে পড়ে শাহানশাহের। তিনি বংশপরম্পরায় অর্জিত ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা দিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন — কাবুলের নাসির খাঁ কি করল?

এতক্ষণে ইয়াহিয়া বুঝতে পারে নাদির শাহকে বাদশাহ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দিবানিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। এতদিন তাই তার পিতা জ্যাকেরিয়া খাঁ কয়েকবার সাহায্য চেয়েও পায়নি। সে গোপনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে — সে তো অনেক দিন আগের ঘটনা জাহাঁপনা। নাসির খাঁ আর শারজা খাঁয়ের কীর্তি ওখানকার সবাই জানে। শুনেছি নাদির শাহ্ নিজে এবং তাঁর বাহিনীর অনেকেই তাদের বীরত্বে মুগ্ধ হয়েছেন। ওদের সাহসিকতার তুলনা হয় না। খাদ্য নেই, পোশাক নেই, তবু ওরা শত্রুকে রুখে দিয়েছিল। একজন বিশ্বাসঘাতকের জন্য নাসির খাঁকে পরাস্ত হতে হল। কাবুল তার কথা কোনদিন ভুলবে না। শুনেছি, এখানে তাকে বলা হত ভিখারী। অমন ভিখারী যদি সবাই হত তাহলে নাদির শাহ্ অনেক আগে এই দেশ থেকে বিদায় নিতেন। কত কষ্ট করে নাসির খাঁ সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন, অস্ত্র যোগাড় করেছিলেন। একজন সিপাহীর মুখে এসব কথা শুনেছি আমরা। আসলে তারাই আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে। নইলে আমাদেরও তো কিছু নেই। কয়েকবার সাহায্যের জন্য পিতা জানিয়েছিলেন।

দরবার স্তব্ধ।

ইয়াহিয়ার প্রতিটি বাক্য শাহানশাহের বুকের মধ্যে যেন আঘাত করছিল। এত সব বিশিষ্ট ব্যক্তি। তারাও যেন নিজের নিজের মুখ লুকিয়ে ফেলতে ব্যস্ত।

ইয়াহিয়া একটু অপেক্ষা করে বলে — আমি এখনি রওনা হব। ততদিনে যদি লাহোরের পতন না হয়, তাহলে কি আমার পিতা সাহায্য আশা করতে পারেন?

শাহানশাহ্ ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকেন — খান দউরান?

— মেহেরবান। আমি যত শীঘ্র পারি সৈন্যদল পাঠাতে চেষ্টা করছি।

ইয়াহিয়া খাঁ বলে — কিছু অর্থের প্রয়োজন ছিল খুব।

খান দউরান সঙ্গে সঙ্গে বলে — অর্থ সেই সঙ্গেই যাবে।

ইয়াহিয়ার চোখের দৃষ্টিতে অবিশ্বাস ফুটে ওঠে। তবে সে তার নিজের কর্তব্য করেছে। তাই বাদশাহকে অভিবাদন জানিয়ে দ্রুত প্রস্থান করে।

বাদশাহ ডাকেন — আমির-উল-উমর?

খান দউরান উঠে ত্রস্ত জবাব দেয় — খোদাবন্দ।

— আপনি তো বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। খরচখরচাও আপনার হাতে।

— হ্যাঁ জাহাঁপনা।

— আপনাব একটি গুপ্তচর বাহিনী থাকার কথা।

— আছে জাহাঁপনা।

— তারা কাজ করে?

নিজামুল মুল্‌ক ঝোপ বুঝে কোপ মারে। বলে — ওরা ওসব কাজ করবে কি জাহাঁপনা? আমির-উল-উমরের খেতের কাজ, বাগিচার কাজে অনেক লোকের দরকার হয়।

খান দউরান ফুঁসতে থাকে। কিছু বলার নেই তার। নাদির শাহের গতিবিধি সম্বন্ধে কোন হদিস সে দিতে পারেনি। নাদির শাহকে সে এত বেশি উপেক্ষা করেছে যে গুপ্তচর বাহিনীকে সক্রিয় কবে তোলার প্রয়োজন বোধ করেনি। আলি হামিদ খাঁ আজিম আল্লা খাঁ আজ অনেক কিছু বলতে পারত। কিছু বলে কোন লাভ নেই। এখনো মনে হচ্ছে এদের নিদ্রা ভঙ্গ হয়নি।

আলি হামিদ খাঁ বলে — জাহাঁপনা আমার মনে হয় খান দউরান এখানে বসে না থেকে এখনি বড় সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করুন।

অনেকে তাকে সমর্থন করে।

খান দউরান বাদশাহের অনুমতি নিয়ে দরবার ত্যাগ করে।

উজির আজিম আল্লাহ খাঁ বলে — আমার মনে হয় খোদাবন্দ, আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত যেসব বাহিনী রয়েছে তাদের সুসজ্জিত করে প্রস্তুত রাখা প্রয়োজন।

বাদশাহ ঘাড় ঝাঁকান। তিনি যেন একটু হতাশ এবং বিরক্ত। ভাবেন, লাহোর তো বলতে গেলে ঘরের কাছে। এতটা পথ চলে এল বিদেশীরা, এত যুদ্ধবিগ্রহ হল, একটা বার্তা অবধি এল না? কেউ কি বিশ্বাসঘাতকতা করছে? কে করবে? করেই বা কি লাভ হবে? হ্যাঁ নাদির শাহ প্রভূত অর্থের প্রলোভন দেখাতে পারেন কাউকে। এমন কি ময়ূর সিংহাসনের লোভও। বাদশাহ বুঝতে পারেন নাদির শাহের পত্রগুলো তাঁকে নিষ্ক্রিয় রাখার ফন্দি মাত্র। সীমানা ডিঙোনোতে যে কোনরকম আপস চলে না একথা তাঁকে বুঝিয়ে দেয়নি কেউ। তাই আজ এই দুরবস্থা। চূড়ান্ত অপমানও বটে। এতটা পথ মুষ্টিমেয় কয়েকজন একক প্রচেষ্টায় বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে মাত্র।

কিন্তু এখন তো অনেক কিছু করার আছে। ওমরাহরা অমন বাঁকা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে কেন? তিনিই তো এতদিন তাদের পরামর্শে চলেছেন।

উজির কামরুদ্দিন খাঁ বলে — জাহাঁপনা, আজ রাতে আবার দরবার ডাকলে ভাল হয়।

— কেন?

— এখন সবাই গৃহে যাক। নিরিবিলি চিন্তা করুক। তারপর রাতে মানচিত্র নিয়ে বসতে হবে। আমাদের সম্ভাব্য যুদ্ধক্ষেত্রগুলোকে নির্দিষ্ট করতে হবে। এখন আর ঢিলেঢালা আলোচনা করার সময় নেই। নির্দিষ্ট একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে এবং দ্রুত।

বাদশাহ্ মনে মনে কামরুদ্দিনকে প্রশংসা করেন। সে যে বিশ্বস্ত একথা তিনি বরাবরই জানেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন — বেশ, সন্ধ্যায় আবার দরবার বসবে।

সবাই প্রস্থান করতে উদ্যত হলে বাদশাহ্ কামরুদ্দিনকে বলেন — আপনি সন্ধ্যার আগে একবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন আমার মহলে।

কামরুদ্দিন বলে — অবশ্যই যাব খোদাবন্দ।

এই সময়ে এই বাতায়নের কাছে বসলে সূর্যাস্তের রূপ দেখা যায়। খুরশিদা শৈশব থেকেই সৌন্দর্যের পিয়াসী। মা হামেশা বলতেন — অত সুন্দর সুন্দর না করে নিজে সুন্দরী হ', তাহলে কাজে দেবে।

— কি করে?

— তোর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হবে কোন নবাব বাদশা।

খুরশিদা হেসে বলত — সেই সুন্দর নয়। তুমি কিছুই দেখতে পাও না। একটা গাছ কিংবা ফুল, আকাশে মেঘ কিংবা চাঁদ বা সূর্য, একটা পাখি কিংবা একটা প্রজাপতি—

তার কথা শেষ না হতেই মা চেঁচিয়ে উঠত — ওসব দেখে পেট ভরবে না।

— মন ভরবে।

আসলে সে তখন কিছুই বুঝত না। মা রেগে উঠলে তার মজা লাগত। আজ কত বেশি বোঝে। তবু পশ্চিমের আকাশের সূর্য দেখতে এখানে ঠিক সময়ে এসে বসবেই। সেই সময় যদি ছড়ানো-ছিটানো মেঘের টুকরো থাকে তাহলে কত রকমের যে ছবি আঁকা হয়ে যায়। খুরশিদা তন্ময় হয়ে দেখে।

আজ কিন্তু এমনিতেই কোন ছবি দেখা যেত না। কারণ আজ আকাশ মেঘে ঢাকা। যদি মেঘ না থাকত, তাহলেও দেখতে পেত না। আজ ওই বাতায়নের পাশে তাকে জড়িয়ে ধরে বসে রয়েছে শাহাজাদা সুলতান আহমেদ। রইস খাঁ তাকে নিয়ে আসার পরে শাহাজাদা এই নিয়ে চারদিন এল। মানুষটার বুদ্ধি আছে, কিন্তু বড় বেশি আয়েশী। সেই জন্য বোধহয় তার শরীরের কোথাও অস্থি অনুভূত হয় না, অন্তত যতটুকু ছোঁয়া লাগে। মানুষটা বেশ আবেগপ্রবণ। যখন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, তখন এক এক সময় মনে হয় সত্যি কথাই বুঝি বলছে। তাকে নিবিড়ভাবে ভালবেসে ফেলছে বুঝি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় সে তো শাহাজাদার অনেক রমণীর একজন। তাছাড়া তার নিজের বেগমও রয়েছে। সেই বেগমের কাছ থেকে একটি স্ত্রীলোক লুকিয়ে দেখা করতে এসেছিল এক রাতে। নাম তার কুলসুম। স্ত্রীলোকটি ভাল।

সে বলেছিল, সে বেগমদের বাঁদী বটে, তাই বলে তো আব শাহাজাদার শত্রু হতে পারে না। তাই খুরশিদাকে এমন কিছু করতে বলবে না যাতে শাহাজাদা মনঃক্ষুণ্ণ হন। তাতে তারও ক্ষতি এটা সে বুঝেছিল। শুধু বলেছিল যদি সম্ভব হয় এক-আধবার বেগমের প্রসঙ্গ যেন উত্থাপন করে। কুলসুমের কাছ থেকেই শুনেছিল, বেগম খুব সুন্দরী না হলেও, ভালই। তবে এটাও স্বীকার করেছিল, খুরশিদা অনেক বেশি মিষ্টি দেখতে আর তার কথায় মধু ঝরে।

— তুমিও আমার কাছে আসতে শুরু করবে নাকি ?

হেসে কুলসুম বলেছিল — আমি পুরুষ হলে নির্ঘাত আসতাম।

শাহাজাদার কোলে বসে কুলসুমের কথা মনে হতেই খুরশিদা ভাবে একবার বেগমেব প্রসঙ্গ তুললে কেমন হয়? সে শাহাজাদাব বুকের ওপর এলিয়ে পড়ে বলে — বেগম সাহেবাও তো এভাবে বসেন আপনার কোলে।

খুরশিদা লক্ষ্য করে শাহাজাদার এতক্ষণের স্বতস্ফূর্ততা হঠাৎ বাধা পায়। তিনি এতক্ষণ যেভাবে তার গায়ে হাত বোলাচ্ছিলেন, তার মুখচুম্বন করছিলেন সব কেমন যেন থমকে যায় কয়েক মুহূর্তের জন্য। তাঁর নাসিকার নিঃশ্বাসের প্রচণ্ড উষ্ণতাও সহসা অনেক হ্রাস পেল। খুরশিদা ভাবে, খুব ভুল করে ফেলেছে। বেগম সাহেবার মঙ্গল-চিন্তা মাথায় না রাখাই ভাল। অন্তত বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে। সে হেসে শাহাজাদার গালের সঙ্গে গাল স্পর্শ করে মৃদু হেসে ফিসফিস কবে বলে ওঠে — যদি চিরকাল আপনার সঙ্গে এইভাবে থাকতে পারতাম।

শাহাজাদা আবার উষ্ণ হয়ে ওঠে। সে বলে — থাকবে। নিশ্চয় থাকবে। চিরকাল আমি তোমাকে এইভাবে রেখে দেব।

সেই সময় দ্বারে করাঘাত।

শাহাজাদা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কার এতবড় দুঃসাহস যে এই বিশেষ মুহূর্তে বাধা দেয়?

খুরশিদা এগিয়ে গিয়ে দ্বার খুলে দেখে তার পরিচারিকা দাড়িয়ে রয়েছে।

— কি হল? তোর কি বুদ্ধি নেই?

পরিচারিকা ফিসফিস করে বলে — আমি কি করব? দরবার থেকে সিপাহী এসেছে। বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শাহাজাদা বাতায়নের কাছ থেকেই জিজ্ঞাসা করে — কি হয়েছে?

খুরশিদা তাব কাছে গিয়ে বলে — দরবারের লোক এসেছে আপনার কাছে।

বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলে — আসার কি আর সময় পেল না? কি করে জানল আমি এখানে রয়েছি?

এই প্রশ্নের উত্তর হয় না বলে খুরশিদা নীরব থাকে।

শাহাজাদা কক্ষ থেকে বেরিয়ে দেখে মহলের শেষ প্রান্তে একজন সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে খুব সজ্ঞান যে এখানে আসা তার পক্ষে অনুচিত। কিন্তু বাদশাহের হুকুম তাকে শুনিয়েছে স্বয়ং উজির। তাই বাধ্য হয়ে এসেছে। শাহাজাদা নিকটে আসতেই সে ঝুঁকে তাকে কুর্নিশ কবে। কিন্তু তাতেও শাহাজাদার ভ্রুকুঞ্চন একটুও কমল না।

সে প্রশ্ন করে — এখানে কে পাঠিয়েছে।

— উজির সাহেব।

লোকটা জানে, এর পরে যে প্রশ্নই করুক না কেমন বাদশাহ্জাদা, তার উত্তর জানা নেই তার। সে জানে উজির একজন নয়, অনেক। সে জানে, প্রতিটি উজিরের নাম রয়েছে এবং সব নাম সে জানে না। সুতরাং শাহাজাদা যদি প্রশ্ন করে "কোন উজির?", সে বলতে পারবে না। কিন্তু তার ভাগ্য ভাল তেমন প্রশ্ন করল না শাহাজাদা।

প্রশ্ন করল — কেন?

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বার্তাবাহক বলে বাদশাহ্ বলেছেন আজ সন্ধ্যার পরে আবার দরবার বসবে। সেখানে আপনার উপস্থিতি খুব জরুরী।

— যাও।

লোকটি চলে যেতে যেতে একবার পেছনে ফিরে চেয়ে দেখে শাহাজাদা তখনো তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। নিজেকেই একটা অশ্লীল গালাগালি দিয়ে সে সোজা চলতে শুরু করে। এই সব বড় বড় ব্যাপারে বেশি ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে নেই। পেছন ফিরে ওভাবে তাকানো শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। শাহাজাদা ইচ্ছা করলে তার গর্দান নিতে পারত।

শাহাজাদা ভাবে, এভাবে দরবার তো কখনো হয় না। এর মধ্যে এমন কি ঘটল? সেই অহেতুক নাদির শাহ্ ভীতি এর কারণ নয় তো? সে আবার খুরশিদার কক্ষে প্রবেশ করে।

ইতিমধ্যে খুরশিদা অন্য এক ধরনের আতরে নিজেকে সিক্ত ও সুবাসিত করে নিয়েছে। শাহাজাদা তাতে আকৃষ্ট হয়। সে খুরশিদাকে কোলে তুলে নিয়ে বাতায়নের পাশে এসে আসনে বসে এবং তাকে আদর করতে থাকে। চুলোয় যাক নাদির শাহ্। দরবারে যেতে একটু দেরি হলে আর কি করা যাবে। খুরশিদার ক্ষীণ তনু তুলতে বেশ ভালই লাগে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় মায়ের সেই বাঁদীর কথা। কি যেন নাম? ফুলজান। খুরশিদার দ্বিগুণ ভারী হবে বোধহয়। পরীক্ষা করা হয়নি এখনো। আর এইসব উঁচু ধরনের প্রেম নিবেদন তার সহ্য হবে বলে মনে হয় না। তাকে তুলতে গেলে সে হয়ত হাত-পা ছুড়তে শুরু করবে। তবু ফুলজানের মধ্যে একটা বন্যভাব আছে যার আকর্ষণ অন্য ধরনের। কেউ বাগানের গোলাপ, কেউ বনের মহুয়া। কারও সুগন্ধ, কারও মধু। খুরশিদা বুকের মধ্যে মিশে থাকলে এক ধরনের মোহ, ফুলজান তার সবল বাহুদ্বয় দ্বারা জড়িয়ে ধরলে অন্য ধরনের মুগ্ধতা।

এমনি করে কি দিন যায় চিরকাল? নাদির শাহ্রা আছে কি করতে? পাহাড়পর্বত ডিঙিয়ে এতদূর আসতেও ইচ্ছে হয় তাদের? তাদের ওখানকার নারীরা শোনা যায় সবাই পরমা সুন্দরী। এখানে মুষ্টিমেয় ওদেশের যে কয়জন রয়েছে তাদের হারেমের খবর শুনলেই তো বোঝা যায়। তবু কেন যে এতদূর আসে কষ্ট করে। নিশ্চয় প্রাচুর্যের অভাব। শুধু সুন্দরী দিয়ে তো পেট ভরে না।

— আপনাকে আজ অন্যমনস্ক দেখাছে।

— হব না? দেখলে তো কি রকম বাধার সৃষ্টি করে।

— একদিন রাতে আসুন। সারা রাত —

— জানি। কিন্তু সময় করতে পারি না। তুমি গান জান?

— এই প্রশ্ন প্রথম দিনেও করেছিলেন ভুলে গিয়েছেন। না জানলে, বাইজী হলাম কি করে?

— কার কাছে শিখলে?

— মা একজন ওস্তাদ ঠিক করে দিয়েছিল। সেই ওস্তাদ মাকেও শিখিয়েছিলেন। খুব নাম ডাক। আমার মায়েরও নাম ডাক রয়েছে। এখনো শুধু গানের জন্য ডাকতে আসে।

— নাদির শাহ্ মিটে যাক, তখন একদিন সত্যিই তোমার গান শুনব। সেদিন তোমাকে স্পর্শ করব না।

— গানের পরেও না?

— না।

— তাহলে আমার মনে হবে, গান শুনে আপনি খুশি হননি।

— কী সুন্দর কথা বল তুমি।

খুরশিদার একবার মনে হয় প্রশ্ন করে, বেগমের চেয়েও সুন্দর কি না। সাহসে কুলোয় না। কারণ সে জানে বেগম তেমন কিছু আহামরি নয়।

দরবারে প্রবেশ করার মুখে রইস খাঁয়ের সঙ্গে দেখা। তাকে দেখলেই আজকাল খুরশিদার কথা মনে হয়। সুতরাং শাহাজাদার মুখে মৃদু হাসি ফোটে। রইস খাঁ বুঝল, মেজাজ ঠিক রয়েছে। ইনি যদি ভবিষ্যতে বাদশাহ হন, তাহলে একটা উচ্চপদ পেতেই হবে। সে একটু নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করে — কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো শাহাজাদা?

— না না। সব ঠিক আছে। কিন্তু এখানকার ব্যাপার কি? হঠাৎ অসময়ে দরবার?

রইস খাঁ জানে সকালের দরবারে আহমেদ অনুপস্থিত ছিল। তাই সে আগ্রহের সঙ্গে জ্যাকেরিয়ার পুত্র ইয়াহিয়া খাঁ বাদশাহকে যা যা বলেছে সব বলে। শাহাজাদা খুরশিদার কাছ থেকে যেটুকু আমেজ সঙ্গে করে এনেছিল সব উধাও হয়। সে গম্ভীর মুখে ভেতরে গিয়ে তার জন্য নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করে।

আমির-উল-উমর খান দউরান বলে — আমরা যদি ধরে নিই নাদির শাহ্ লাহোর অধিকার করে এগিয়ে আসছেন, তাহলে কোথায় তাঁকে আমরা বাধা দেব? এখন আলোচ্য বিষয় মুখ্যত এটাই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নিজামুল্ মুল্‌ক সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে — লাহোরে পরাজয় হয়েছে এটা ধরে নেব কেন? জ্যাকেরিয়া খাঁ অত সহজে ছেড়ে দেবেন নাকি? তাছাড়া আপনি তো যথাসাধ্য সাহায্য পাঠাচ্ছেন।

খান দউরান মনে মনে ভাবে সেই সাহায্য কবে গিয়ে পৌঁছবে তার ঠিক কি? তাই লাহোরকে বাদ দিয়ে সমর-কৌশল স্থির করা ভাল। তবু সে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বলে — লাহোরে

সাহায্য যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু নাদির শাহের গতি সেখানে রুদ্ধ হওয়া কঠিন। তাই একটু পেছনেব কোন স্থান নির্বাচন করা উচিত। কারণ সাহায্য পৌঁছানোর আগেও নাদিব লাহোব দখল করে ফেলতে পাবেন।

নিজামুল মুল্‌ক সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে — না, লাহোরেই একটা হেস্তনেস্ত কিছু কবাতে হবে। লাহোব দখল মুখেব কথা নয়।

খান দউরান চটে গিয়ে বলে — আপনি যুক্তিগ্রাহ্য কিছু বলার চেষ্টাই কবছেন না চিন কিলিক খাঁ। আমাব প্রতি কথার বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে বলেই শুধু দরবারের কাজে বাধা দিয়ে চলেছেন।

চিন কিলিক খাঁ নামটা দরবারের অনেকের মনে থাকে না। অনেকে হয়ত জানেই না। নিজামুল মুলক উপাধিতেই সে প্রসিদ্ধ। তাই একটু থমকে গিয়ে সে বলে ওঠে — আমার নাম ধরে না ডেকে আমার পদবী ব্যবহার করা উচিত। আমি বাদশাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নিজামুল মুল্‌কের আচরণে শাহাজাদাও বিরক্ত হয়ে উঠছিল। সে বলে — অনেকেরই তো পদবী রয়েছে। অথচ তাদের নাম ধবে ডাকা হয়। আপনিও ডাকেন শুনেছি। অনেকের অবশ্য পদবী প্রাধান্য পায়। যেমন শাহানশাহ, যেমন শাহাজাদা। খান দউরানকে আপনি আমির-উল-উমর বলে তো ডাকেন না?

দরবারের কেউ একটা কথাও বলে না। খান দউরানের চোখে সপ্রশংস দৃষ্টি।

ময়ূরসিংহাসন থেকে ভেসে আসে— কাজের কথায় আসুন।

মুজাফফব খাঁ বলে — পানিপথে আমাদের মূল শিবিব স্থাপন করলে ভাল হবে বলে আমাব বিশ্বাস।

বাদশাহ বলেন— সাদাত খাঁ আজ নীরব কেন? আপনার মতামত জানান।

— আমি জাঁহাপনা আলোচনা শুনছি। যদি মনে হয় অন্য কিছু করলে ভাল হবে তখন জানাব।

এবারে খান দউরান বলে — পানিপথ মোটামুটি ঠিকই আছে। তবে আমি আর একটু এগিয়ে কাবনালে ছাউনি ফেলার পক্ষপাতী। সব দিক দিয়ে সেটা ভাল হবে। নদী খাল আর জঙ্গল থাকায় নিরাপত্তার দিক দিয়েও সুবিধাজনক।

আলি হামিদ খাঁ বলে — খুব ভাল প্রস্তাব। লাহোবের দিকেও এগিয়ে যাওযা সম্ভব হবে সেখান থেকে।

উজির আজিম আল্লাহ খাঁ বলে — নাদির শাহ কী ধবনের মানুষ আমাদের জানা নেই। তবে অমৃতসবের স্বর্ণমন্দিবের দিকে একটু দৃষ্টি রাখলে বোধহয় ভাল হয়।

বাদশাহ বলেন — মন্দ বলেননি। আমিব-উল-উজির এ বিষয়ে অবশ্যই চিন্তা ভাবনা কববেন।

খান জুমান খাঁ প্রশ্ন করে - যাত্রা শুরু কবে থেকে?

মুজাফফর খাঁ বলে — তিনদিনের মধ্যে অবশ্যই হওয়া উচিত।

খান দউরান বলে — তার চেয়ে বেশি কখনই নয়। আজ রাত থেকেই আমাদের প্রস্তুতি শুরু হবে।

সাদাত খাঁ বলে — এত তাড়াহুড়োর প্রয়োজন ছিল?

উত্তরে খান দউরান বলে — এর পরেও দেরি করলে জেগে ঘুমানো হবে।

শাহজাদা ভাবে, পিতা হয়ত সঙ্গে তার হারেম নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবেন, কিন্তু খুরশিদাকে নিয়ে যাওয়া বোধহয় সম্ভব হবে না। তার মাতা মালিকা-উল-জুমানি যদি পিতার সঙ্গিনী হন, তাহলে ফুলজানকে পাওয়া যেতে পারে। তবে ওই অল্প পরিসরে কোন কিছুই গোপন থাকে না। খুরশিদাকে অন্য কারও হারেমে ঢুকিয়ে দেওয়াও নিরাপদ নয়। হাতছাড়া হয়ে যাবে। যুদ্ধক্ষেত্রে শাহাজাদাকে সম্ভ্রম জানানোর মত অবকাশ আর পরিবেশ তেমন থাকে না। শাহাজাদার কল্পনাতেও নেই নাদির শাহের বিপুল আয়তনের হারেমকে তিনি কিবকম বজ্রমুষ্টিতে ধরে রেখেছেন। ধারণা থাকতে পারত, যদি তিনি অন্তত বাদশাহ আলমগীরের পুত্র হতেন।

খাইবার গিরিপথের মুখে যুদ্ধে আহত এবং বন্দী নাসিব খাঁয়ের কাছে একজন হাকিমকে রেখে নাদির শাহ সসৈন্যে চলে গিয়েছিলেন পেশোয়ার জালালাবাদ হয়ে লাহোরের পথে। হাকিমকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন চিকিৎসার ত্রুটি না রাখতে। যদি বেঁচে যায় কিংবা যদি তার মৃত্যু হয় শুধু তাহলেই এই স্থান ছেড়ে সে যেন সোজা তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছোয়। অশ্ব এবং আরও দশজন অশ্বারোহীকে তিনি রেখে গিয়েছিলেন হাকিমের দেহরক্ষী হিসাবে।

অচেতন নাসির খাঁয়ের জ্ঞান ফিরলে সে দেখে তাকে পূর্বের খোলা জায়গা থেকে এনে একটি গৃহে রাখা হয়েছে এবং একজন অর্ধ-বৃদ্ধ ব্যক্তি তার সেবা করছে। ধীরে ধীরে তার সব কথা মনে পড়ে যায়। সে একটু বিস্মিত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বসার চেষ্টা করে।

অর্ধ-বৃদ্ধ গম্ভীর হয়ে বলে — উঁহুঁ, নড়াচড়া করবেন না।

— আপনি কে ?

— হাকিম।

— আমার জন্যে ?

— হুঁ।

— আশ্চর্য !

— কেন ?

— আমাকে তো মরে যাওয়ার জন্য ফেলে রাখা হয়েছিল।

— তাই নাকি ?

— আমার হিতৈষী রয়েছে দেখছি কাবুলে।

— বোধহয় তেমন কেউ নেই কাবুলে।

— আপনাকে কে পাঠাল?

— নাদির শাহ।

— বিশ্বাস করি না। তিনি আমাকে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন যাতে আমি আস্তে আস্তে মরে যাই।

— তাহলে আমি এলাম কি করে?

অল্প কথা বলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল নাসির খাঁ। সে বলে — কিছু ভাবতে পারছি না। যদি সুস্থ হই, পরে ভেবে দেখব। এখন একটু ঘুমোই।

হাকিম বুঝতে পারে জ্ঞান যখন ফিরেছে এবং সব কথা মনে পড়েছে তখন নাসির খাঁয়ের মৃত্যুর আশঙ্কা কেটে গিয়েছে। নিবাময় হতে তার বড়জোর মাসখানেক লাগবে। তখন নাদির শাহের কাছে গিয়ে খবর দিতে হবে নাসির খাঁ সম্বন্ধে। সেই রকমই হুকুম।

মাসখানেকের আগেই নাসির খাঁ তার অসামান্য জীবনী-শক্তির দৌলতে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। হাকিম তাকে বলে — এবারে আমাকে যেতে হবে।

— কোথায় যাবেন?

— নাদির শাহের কাছে। সেই রকমই হুকুম ছিল।

— তিনি এখন কোথায়?

— শেষ যা খবর পেয়েছিলাম, তিনি লাহোরের পথে কোন এক জায়গায়।

নাসির খাঁয়ের মন খারাপ হয়ে যায়। ভাবে অতদূর? কেউ এসে বাধা দিল না? সে আর কি করতে পারে। চেষ্টা করেছিল সাধ্যমত। নিশ্চয় কোন বিশ্বাসঘাতক নাদির শাহকে অন্য পথে তার পেছনে নিয়ে গিয়েছিল। সামনে দিয়ে এলে মরতে হত ওদের। অন্তত প্রচুর ক্ষতি হত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

— আমাকে কোথায় বন্দী করে রাখা হবে?

— বন্দী থাকবেন কোন্ দুঃখে? আপনি স্বাধীন। তবে কাবুলের বাইরে নিশ্চয় যাবেন না।

— সেখানে কেউ নেই। এখানেও অবশ্য তেমন কেউ নেই। তবে অনেকদিন রয়েছি বলে পরিচিতজনেরা রয়েছে। তাদেরও কয়েকজনের আসল রূপ দেখে ফেলেছি। তবু এখানেই থাকব। আমার ডেরায় থাকতে পারব তো?

— নিশ্চয়।

— অপমানজনক হলেও সেখানেই থাকব।

— অপমানজনক কেন?

— নাদির শাহের কাছে পরাজিত হয়ে আবার তাঁরই দাক্ষিণ্যে নিজের গৃহে থাকছি বলে।

— যে শত্রুর ওপর শ্রদ্ধা নেই তাকে নাদির শাহ নিজে হাকিম রেখে বাঁচিয়ে তোলেন না।

হাকিমেব কথাটা ভাবায় নাসির খাঁকে।

হাকিম বিদায় নেয়।

কুঞ্জমাজরা কেল্লার ভেতরটা একবার ঘুরে দেখে সেখানে কিছু সংখ্যক সেনা রাখার ব্যবস্থা করে বাইরে এসে নাদির শাহ্ দেখলেন তখনো কালান্দার খাঁয়ের ছিন্নশির দেহটা পড়ে রয়েছে। তিনি হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন — এখনো এটা সামনে পড়ে রয়েছে? সরিয়ে ফেল।

একসঙ্গে আটদশজনে ছুটে এল। কালান্দার খাঁয়ের হাতে একটা তাবিজ ছিল। শৈশব থেকে যৌবনে পদার্পণের সময় তার মা তার হাতে পরিয়ে দিয়েছিল, সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পেতে। সেটি সোনার। একজন ছিঁড়ে নিয়ে লুকিয়ে ফেলল। সেটি অন্যজন দেখে ফেলে কাড়াকাড়ি করতে যায়। নাদির শাহ্ অদূরে দাঁড়িয়ে একজন সেনানায়কের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাই যারা কাড়াকাড়ি করছিল তাদের একজনের পেছনে ক্যাঁত করে পাশের একজন সজোরে লাথি মারে। লাথি খেয়ে সে আর্তনাদ করে উঠেই নাদির শাহ্কে দেখতে পেয়ে কাড়াকাড়ি বন্ধ করে শান্ত হয়ে যায়। অপরজন তাবিজটা কামিজের ভেতরে ঢুকিয়ে কালান্দারের ছিন্নশিরটা তুলে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে অন্যান্য যেসব দেহ পড়েছিল তার মধ্যে ফেলে আসে। ধড়টা টানতে টানতে সরিয়ে নিয়ে যায় বাকিরা।

নাদির শাহের বাহিনী ওয়াজিরাবাদে গিয়ে লুটপাট শুরু করে দেয়। অনেক দিন তারা তেমন জনপদ পায়নি। মাঝে মাঝে এদের আলগা করে না দিলে ভেতরে ভেতরে যে গুমরোতে থাকে একথা নাদির শাহের জানা আছে। তাঁর নিজের ধমনীর রক্তের সঙ্গে এদের রক্তের কোথায় যেন সাদৃশ্য রয়েছে। সবার দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ কম-বেশি একই রকম বলতে গেলে। সেই পাহাড়, নদী, অনুর্বর ভূমি কোথাও উর্বর। আখরোট পেস্তা গোলাপ ফুল।

ওয়াজিরাবাদের নিকটে ছাউনি ফেলেন নাদির শাহ্। এখান থেকে লাহোর অভিযান শুরু হবে। সেদিন সন্ধে হয়ে আসছিল। উত্তর দিক থেকে শীতল ঝোড়ো হাওয়া বইছিল। তিন দিন অতি ব্যস্ত থাকায় হারেমে যাওয়া হয়নি। কাবুল থেকে কয়েকজন নেওয়া হয়েছে।

নিজের তাঁবুর সামনে বসে নাদির শাহ্ হাঁক দেন — হাজি খাঁ।

হাজি খাঁ মানেই সরাব। সেও আশেপাশে অদৃশ্য হয়ে থাকে। হাঁক দিতেই সরাবের পাত্র নিয়ে হাজির হয়। আর সেই সময় একজন সিপাহী এসে খবর দেয় একজন ব্যক্তি শাহের দর্শনপ্রার্থী।

শাহ্ বিরক্ত হন। এই অসময়ে কে তাঁর সঙ্গে দেখা করার দুঃসাহস দেখায়? নিশ্চয় জরুরী কোন খবর। তিনি হাজির করতে বলেন আগন্তুককে।

অন্ধকার নেমে এসেছে তখন। অসংখ্য তাঁবুতে আগুন জ্বলছে। খানা প্রস্তুত হচ্ছে। ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের খাদ্যের ঘ্রাণও পাওয়া যায়। যদিও সেই সমস্ত তাঁবু অনেক দূরে। বোধহয় ফাঁকা জায়গা বলে ঘ্রাণ ভেসে আসছে। আর তাঁবুগুলো উত্তর দিকে বলে। কারণ হাওয়াটা সেইদিক থেকেই আসছিল আজ।

আগন্তুক সামনে এসে কুর্নিশ করে।

— কে তুমি?

— আমি হাকিম হুজুর।

— হাকিম খাঁ? তেমন কাউকে আমি চিনি না।

— আমার নাম হাকিম নয়। হাকিমী আমার পেশা। আপনার হুকুম মত দেখা করতে এসেছি। আমার নাম ইয়াকুব খাঁ।

— বল, কী হুকুম ছিল আমার।

— আপনি আমাকে কাবুলের আলি মসজিদে রেখে এসেছিলেন নাসির খাঁয়ের চিকিৎসার জন্য।

— এবারে মনে পড়েছে। তার কি মৃত্যু হয়েছে?

— না, সুস্থ হয়ে উঠছেন।

— ভাল হয়েছে। আমারও ধারণা হয়েছিল অত সহজে মরার জন্য সে জন্মায়নি। সেই বিশ্বাসঘাতক না থাকলে আজ আমি এখানে এসে পৌঁছোতে পারতাম না। সে কি বলে?

— আপনার দাক্ষিণ্যে নিজ গৃহে মুক্ত অবস্থায় থাকতে তিনি অস্বস্তি বোধ করছেন।

— ঠিক আছে। অস্বস্তি দূর করার ব্যবস্থা করছি। আমি কালই লোক পাঠাচ্ছি তাকে আগের মত কাবুলের শাসনভার গ্রহণ করার জন্য। সে ভুলে যাক্ যুদ্ধের কথা।

— মন জোড়া লাগবে কি?

— তুমি হাকিমি কর, রাজনীতি নিয়ে ভবিষ্যতে কথা বলবে না আর। বিপদে পড়বে। মন ঠুন্কো হলে জোড়া না লাগাই ভাল। নাসির খাঁ ইচ্ছে করলে অপছন্দের লোকজনকে ফাঁসি দিতে পারবে।

হাকিম ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে চায়। নাদির শাহ্ বুঝেছেন এই ইয়াকুব সাধারণ হাকিম নয়। নাসির খাঁকে তিনি দেখেছিলেন। দেখে মনে হয়েছিল দেহের শেষ রক্তবিন্দুও তার অবশিষ্ট নেই। তাকে বাঁচিয়ে তুলেছে।

হাকিম অভিবাদন জানিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই তিনি বলেন — দাঁড়াও।

হাকিম বুঝল সে বেশি কথা বলে ফেলেছে। ফলভোগ করার জন্য প্রস্তুত হয়। তার ছেলেও হাকিমী করে। খুবই তরুণ। আসার আগে সাদি দিয়ে এসেছে। তাদের কথা মনে পড়ে।

নাদির শাহ্ বলেন — তোমার ওপর আমি হারেমের চিকিৎসার ভার দিলাম। আর একজন আছে বটে। তার ওপর আমার তেমন ভরসা নেই। মনে হয় মেয়েদের রোগ সম্বন্ধে ধারণা নেই। সে-ও থাকবে, তবে তোমার সাহায্যকারী হয়ে। তোমার এ বিষয়ে কিছু বলার আছে?

ইয়াকুব খাঁ মনে মনে খুব উৎসাহিত হয়। কারণ মেয়েদের রোগ সে খুব ভাল বোঝে। গ্রামে তার দাদীর নামডাক ছিল মেয়েদের রোগের হাকিম বলে। অনেক কিছু জানত। কোন রোগের কি লক্ষণ, সন্তান প্রসবের আগে ও পরের কী কী জটিলতা। অতি সামান্য কারণে মানসিক বিকার আবার অল্প চিকিৎসাতে তার নিরাময় ইত্যাদি অনেক কিছু দাদী জানত। তার আগ্রহ দেখে দাদী দিনের পর দিন সেই সব তাকে শিখিয়েছে। কোনটার ওষুধ গাছের মূল। কোনটার ওষুধ পাতা, কোনটায় ফুল ব্যবহার করা হয়। আবার রোগীর কাছে কয়েকদিন

গিয়ে কথা বলেও সুস্থ করে তোলা যায়।

সে নাদির শাহকে বলে — নারীদের চিকিৎসায় আমার বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতা আর পারদর্শিতা রয়েছে।

— ভাল। আজ থেকেই বহাল হলে তবে। যাও, বুঝে নাও গে।

হাকিম চলে যেতেই হাজি খাঁ অদৃশ্য কোণ থেকে আবির্ভূত হয় এবং হাতের সুদৃশ্য পাত্র থেকে সুরা ঢেলে দেয়।

আকাশে চাঁদ ছিল না। অনেক তারা ফুটে উঠেছে ইতিমধ্যে। আরও ফুটবে। ফুটতে ফুটতে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলবে। মনে হবে পৃথিবীর দিকে ঝুঁকে পড়ে অবাক বিস্ময়ে এখানকার কাণ্ডকারখানা দেখছে। নাদির শাহের কদাচিৎ এইসব দৃশ্য চোখে পড়ে। পড়লেও এগুলো অর্থবহ হয়ে ওঠে না তাঁর কাছে। মন তাঁর ততটা অনুভূতিপ্রবণ নয়। অমন মন হলে কাজের কাজ কিছু হয় না।

মাঝরাতের আগে তো হারেমের দিকে পা বাড়ান না শাহ। তিনি ধীরে ধীরে পান করতে থাকেন একাকী। তারপর কি মনে হতে হাজি খাঁকে বলেন — কাসেম বেগ খাঁ আর তমাস খাঁ উকিলকে আসতে বল।

হাজি খাঁ লম্বা কুর্নিশ করে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পরে ওরা দুজনা হন্তদন্ত করে ছুটে এসে নাদিব শাহের পায়ের কাছে বসে পড়ে। নাদির শাহ মুখের মধ্যে কিছুটা ভাজা মটর ফেলে দেন। তারপর এক ঢোক সরাব পান করে নিয়ে বলেন — কি বুঝছ তোমরা? ওদের কথাবার্তা শুনে কি মনে হচ্ছে?

তমাস খাঁ বলে — চমৎকার। লাহোরে যাওয়ার জন্যে পাগল।

কাসেম বেগ বলে — একটু বেশি আশা করছে ওরা।

নাদির শাহ বলেন — ওখানে না হলেও শেষ পর্যন্ত সব আশাই পূর্ণ হবে ওদের। তোমরা শুধু দেখবে ওরা যেন ধৈর্য ধরে থাকে। লাহোর টাহোরের কথা বাদ দিয়ে দিল্লীর রঙিন ছবি তুলে ধর ওদের সামনে।

তমাস বলে — কাল থেকে তাই করব।

নাদির শাহ বলেন — তোমরা দুজনা প্রত্যেকে দুশো জন লোক নির্বাচন কর। শুধু বুদ্ধিমান হলেই চলবে না তাদের। গল্পটল্প বানাতে পারে এমন লোকদের বাছতে হবে। তারা এদের মধ্যে দিল্লীর গল্প শোনাবে।

ওরা দুজনা বারবার ঘাড় কাত্ করে সায় দেয়। আরও কিছুক্ষণ কথা বলে নাদির শাহ ওদের বিদায় দেন। মাঝরাত্রি হতে আরও অনেক বাকি। তাই সুরা নিয়ে বসে থাকেন তিনি একাকী। পাশে দাঁড়িয়ে হাজি খাঁ। অন্য কেউ হলে এই নিশীথে কল্পনায় গা ভাসাত। কিন্তু নাদির শাহের মধ্যে কল্পনা ঠাঁই পায় না, ঠাঁই পায় শুধু পরিকল্পনা।

নাদির শাহের কাছে হারেম হল সিপাহী ও খোজাবেষ্টিত একটি নিশ্ছিদ্র স্থান সেখানে তিনি

ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই। হারেম যেন তিন অক্ষরে বিমূর্ত কিছু। বাহিনীর প্রতিটি মানুষের কর্মক্ষমতা ও সক্রিয়তার দিকে নজর দিতে দিতে তিনি বিস্মৃত হয়েছেন, মানুষ শুধু রক্তমাংসের যন্ত্র নয়। তারও ওপরে আরও কিছু রয়েছে। পশুরও অবশ্য রয়েছে। তাদের ব্যথা-বেদনা রয়েছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে রয়েছে যৌক্তিকতা আর রয়েছে অনুভূতি। শক্তি আর ভীতি প্রদর্শনের নিগড়ে তাকে সব সময় বেঁধে রাখা যায় না।

হারেমের এত সহস্র রমণী দৈহিক দিক দিয়ে দুর্বল হলেও মন বলে কিছু তো রয়েছে তাদের। তারা জানে প্রকারান্তরে তারা নাদির শাহের বন্দিনী। তাঁর ভোগবিলাসের বস্তু হিসাবে তারা রয়েছে। নানা পাত্রে খানা পরিবেশিত হলে সেই খানা নেড়েচেড়ে দেখে যেটা পছন্দ হয় সেটাই গ্রহণ করে খাদ্যরসিক। তারাও যেন নাদির শাহের খাদ্যসামগ্রী। তিনি আসবেন, দেখবেন, নাড়াচাড়া করবেন, তারপর একটিকে তুলে নেবেন রাতের জন্য। এভাবে তিনি সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয়ে প্রতি প্রাতঃকালে হৃষ্টমনে নির্গত হন বটে। কিন্তু তারা? যে তাঁর সেদিনের নির্বাচিত খাদ্য ছিল সেও কি তৃপ্ত? একেবারে বুভুক্ষু থাকার চাইতে হয়ত কিছুটা তৃপ্ত। কিন্তু এই তৃপ্তি কি সেই তৃপ্তি যা নারীকে মমতাময়ী করে তোলে, সন্তানের জননী হওয়ার স্বপ্ন দেখায়? শাহ্ যখন কাউকে নির্বাচিত করেন, তখন সে গর্বে অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে ওঠে। কারণ আর কিছুই নয়, একঘেয়ে জীবনে এই টুকুই বৈচিত্র্য। আর তাতে সেদিনের মত সে জয়ী। অন্যান্যেরা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে। আবার তারাই যখন নিভৃতে ভাবতে বসে কখনো, তখন বুঝতে পারে এক রজনীর এই জয়ের কোন অর্থ নেই, গুরুত্বও নেই। আজ যে জয়ী কালই শাহ্ শয্যাত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সে হাজার নারীর মধ্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। সামান্য কয়েকজন হয়ত চিম্‌টি কেটে জিজ্ঞাসা করবে — শাহকে কেমন বুঝলি?

অতৃপ্ত দেহমনের নিঃশব্দ হাহাকার এক এক সময় বাধা না মেনে পথ খোঁজে। তারা যেমন দিনের পর দিন হেঁটে আসছে তেমনি তাদের আগুপিছু চলেছে তাদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি পুরুষ জাতি। দৃষ্টিবিনিময় কি হয় না আচম্বিতে? নাদির শাহের নিগড় যত বজ্রকঠিন হোক না কেন, প্রকৃতির কাছে সেই নিগড় অনেক সময়ে ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। নারী যদি একবার দুঃসাহসিনী হয় তাহলে সে পুরুষকে হার মানায়। মুষ্টিমেয় হলেও হারেমের কয়েকজন অমন হয়ে ওঠে। অতীতেও হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে।

হারেমের সঙ্গে সিপাহী ছাউনির দুস্তর ব্যবধান। তবু কি করে ইশারার আদান প্রদান হয়, কি করে সময় ঠিক হয় কেউ বলতে পারে না। তবু হয়। এইভাবেই সর্বদেশে সর্বকালে হয়ে আসছে বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে।

ফরজানা একবার তার শিবিরের চারদিকে সন্তর্পণে দেখে নেয়। সবাই নিদ্রিত। সে পর্দা তুলে বাইরে উঁকি মারে। ঘোর অন্ধকার। অন্ধকারই তো সে চায়। চাঁদের আলোর মধ্যে দয়িতের স্পর্শ পাওয়া তার বুকে মাথা রাখা এ জীবনে হবে না। এইভাবেই চুপি চুপি চোরের মত আস্বাদন পেতে হবে। নাম জেনে নিয়েছে তার। ইকবাল। তার দেশের নয়, তাই দূর থেকে দেখতে অত কোমল। হাসি কী সুন্দর। তার সর্বশরীর কেঁপে ওঠে। সে আস্তে করে বাইরে পা

রাখতেই ভেতর থেকে ফিস্‌ফিস্ আওয়াজ — মরবি।

চমকে উঠে পেছনে ফেরে। তনবীর তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। ফরজানা তনবীরের কাছে দ্রুত গিয়ে তার পাশে বসে কানের কাছে বলে — এখন বুঝি খুব বেঁচে আছিস্?

— আছি। নিঃশ্বাস নিচ্ছি। খাচ্ছি দাচ্ছি।

— একে বাঁচা বলে?

— কপালে এইটুকুই আছে। মেনে নিতে হবে।

— আমি মানতে পারি না।

— তাই তো বলছি। মরবি।

— তাও ভাল। শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থেকে সুখ কোথায়?

— মরগে যা তবে।

তনবীর চোখ বোজে। ফরজানা ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। আশেপাশে কোথাও বোধহয় সাময়িকভাবে ঘোড়ারাখার আস্তাবল করা হয়েছে। তার গন্ধ ভেসে আসছে। ঘোড়ার গায়ের গন্ধ ভাল লাগে ফরজানার। তার পিতার ছিল একটা। বরাবর সেই ঘোড়া সংসারের বহু কাজে লাগত। তারপর একদিন বৃদ্ধ হয়ে মরে গেল। বাড়ির সবার খুব কষ্ট হয়েছিল। আজ আস্তাবলের গন্ধে শৈশবের কথা মনে পড়ে গেল। তারপর মনে পড়ল আরও অনেক কথা। ভেসে উঠল জালালের মুখ। জালাল যখন কিশোর তখন একদিন বালির ঢিবির আড়ালে ফরজানাকে চুম্বন করেছিল। সেই চুম্বনের স্বাদ এখনো লেগে রয়েছে। তার খুব ভাল লেগেছিল। তবু জালালকে ভয় দেখিয়েছিল বলে দেবে বলে। জালাল তাকে কোথা থেকে একটা গোলাপ ফুল এনে হাতে দিয়ে বলেছিল, বলবে না তো? ফরজানা 'না' বলতে জালাল আর একবার তাড়াতাড়ি চুম্বন করে পালিয়ে ছিল। সব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিজের ওষ্ঠে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে সে অন্ধকারে এগিয়ে যায়। সেই জালাল কি এখন আর কিশোর রয়েছে? সে এখন পরিপূর্ণ যুবক। কত ফরজানা তার জীবনে এসেছে। যে রকম দুরন্ত ছিল।

অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল ইকবাল। একেবারে নির্দিষ্ট জায়গায়। ফরজানাকে পেয়ে পাগলের মত বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। দুজনার তৃষ্ণায় কোন ফারাক নেই। শত নাদির শাহও যদি বলে তাকে বেগম করে নেবে, ফরজানা যাবে না। তারা দুজনা দুনিয়াটার কথা একেবারে ভুলে যায়। আবোল তাবোল বকতে থাকে। ফরজানার বেশবাস কোথায় চলে যায়। সে ভাবে এই রাত যেন দুনিয়ার শেষ রাত হয়।

অকস্মাৎ দুটো মশাল জ্বলে ওঠে আশেপাশে। ধরা পড়ে যায় তারা। দুনিয়ার শেষ রাত না হলেও তাদের দুজনার জীবনের শেষ রাত ঘনিয়ে আসে। নাদির শাহের কড়া নির্দেশ অমান্য করার দুঃসাহস কারও নেই।

স্ত্রী আর পুরুষের দুটি খণ্ডিত দেহ ভোর অবধি পড়ে রইবে ওখানে।

ওয়াজিরাবাদের পর আমিনাবাদ হয়ে শাহদৌলা সেতু অতিক্রম করে নাদির শাহের বাহিনী

এসে উপস্থিত হয় দেঘনালায়।

লাহোরের অধিকর্তা জ্যাকেরিয়া খাঁ অনেক আগে থেকে জানত যে নাদির শাহ তাঁর বাহিনীকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত দেঘনালাতে উপস্থিত হবেন। লাহোরের ওপর আক্রমণ চালাতে হলে প্রস্তুতি পর্বে দেঘনালাই সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। পুত্র ইয়াহিয়া খাঁকে সে পাঠিয়েছে দিল্লীর দরবারে। অনেক অর্থ, অনেক সৈন্যের প্রয়োজন। সে জানে পুত্র নিরাশ হয়ে ফিরে আসবে। কারণ সেখানে নিজামুল-মুল্‌ক আর অযোধ্যার শাসনকর্তা সাদাত খাঁ কলকাঠি নাড়া থেকে বিরত হবে না। আর শাহানশাহের তো তাদের ওপর অগাধ আস্থা। খান দউরান মানুষটিকে যতটুকু জানে, পেছন থেকে এভাবে ছুরি চালাতে সে কিছুতে পারবে না। তাছাড়া যে দেশে তার জন্ম, যেখানে বিচরণ করে সে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় সেই দেশের সর্বনাশ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু বাদশাহ তার ওপর আস্থা রাখলেও নিজাম আর সাদাত খাঁ যদি এককাট্টা হয়ে কিছু বলে, তাহলে ফেলতে পারেন না তাদের কথা। তাই ইয়াহিয়া শূন্য হাতে ফিরে আসবে। সুতরাং নিজামদের উদ্দেশ্য সফল। দিল্লীর রাজনীতি এতদূরে বসে অনুমান করা সহজ নয়। একবার মনে হয়েছিল ওদের দুজনার পত্র পুত্রের হাতে দিয়ে বাদশাহের কাছে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু ভরসা পায়নি। পুত্র সোজা বাদশাহের হাতে দিতে চাইলেও ওদের দুজনার বাধাদানের ফলে হয়ত দিতে পারত না। ওদের হাতেই পড়ত। তাতে ইয়াহিয়ার প্রাণ সংশয় হত। আর ভবিষ্যতে লাহোরের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ত নানা অজুহাতে। আজ যদি ঔরংজেবও থাকতেন, তাহলে নাদিরের পক্ষে চেনাব আর ঝিলম অতিক্রম করে লাহোরের দরজায় আঘাত করার কথা স্বপ্নেও স্থান পেত না। ইয়াহিয়া যদি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয়, তাহলে বলার কিছু নেই। কিন্তু অন্যের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে যাবে কেন সে? তার মত দুঃসাহসী তরুণের জন্য সামনে পড়ে রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তাই দিল্লীর মুখাপেক্ষী হয়ে বসে না থেকে নিজের বিবেকের অনুশাসন মেনে চলবে বলে ঠিক করে জ্যাকেরিয়া খাঁ। সাধ্যমত সৈন্য সংগ্রহ করার জন্য সচেষ্ট হয় সে। আদিনা নগরের জমিদারকে জরুরী বার্তা পাঠায়, সে যেন তার সমস্ত সৈন্য সামন্ত নিয়ে লাহোরে চলে আসে। বার্তায় বিস্তারিতভাবে জানায় কোন পরিস্থিতিতে পড়ে আদিনা নগরের সাহায্য চাইতে হল। দিল্লীর কাছ থেকে ছিঁটেফোঁটা সাহায্যও প্রত্যাশা করে না সে। অনেক চেষ্টায় চোদ্দ হাজার অশ্বারোহী সংগ্রহ করে জ্যাকেরিয়া খাঁ। সে জানে, এই সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। তবু উপায় নেই। এই সৈন্য নিয়ে সে রাভি নদীর তীরে প্রতিরোধ প্রাচীর গড়ে তুলল। মনে তখনো ক্ষীণ আশা, তার সম্মান আর নিরাপত্তার কথা না ভাবলেও লাহোরের কথা তো ভাববেন শাহানশাহ। অতীতের অনেক স্মৃতি বিজড়িত রয়েছে সবার প্রিয় এই নগরীর সঙ্গে। তাই শেষ পর্যন্ত হয়ত ছুটে আসবে মোগল বাহিনী।

কিন্তু এল না। সৈন্য সাজিয়ে আদিনা নগরের জমিদারের আশায় বসে থাকে জ্যাকেরিয়া খাঁ। সে জানে না শুধু দিল্লীর শাহানশাহ নন, বিধাতাও তার প্রতি বিরূপ। তার কাছে এত বেশি সৈন্য ছিল না যে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে তাদের নানা দিক দিয়ে শত্রুদের ওপর নজর রাখার জন্য পাঠাবে। অনেক সময় নাদির শাহ সম্ভাব্য পথে না এসে ঘোরাপথে এসে চমকে

দেন। এটা তার প্রিয় রণকৌশল। নাসির খাঁকে এইভাবে ফাঁদে ফেলেছিলেন খবর আছে। এখানেও সেইভাবে আসতে পারেন। তবু কিছু করার নেই।

জ্যাকেরিয়ার অনুমান সত্যে পরিণত হল। নাদির শাহ সোজা পথে না এসে পূর্ব দিকে ঘুরে লাহোর বাহিনীর পশ্চাতে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু একেবারে নির্বিঘ্নে আসা হয়ে ওঠেনি পারস্যের শাহের। আদিনা নগবের জমিদার যে বাহিনী নিয়ে লাহোরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তাদের মুখোমুখি হতে হল নাদির শাহকে। জমিদারের সৈন্যসংখ্যা তেমন কিছু নয়। তবু তারা প্রচণ্ড বাধা দিল। তারপর যুদ্ধ কবতে করতে পবাজয় নিশ্চিত জেনে তারা লাহোরের দিকে ছুটল, যাতে জ্যাকেরিয়ার সাহায্যে লাগে। নাদির শাহের বাহিনী তাদের ছেড়ে দিয়ে লাহোরের মূল বাহিনীর দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

মধ্যাহ্নকাল। শীতের সময়। নদীতে তেমন জল নেই, সূর্যেরও উত্তাপ নেই। বর্ষার সময় হলে নদী অতিক্রম করে এত তাড়াতাড়ি লাহোরের দ্বার প্রান্তে এসে উপস্থিত হওয়া কখনই সম্ভব হত না।

শত্রুসৈন্যকে পশ্চাতে দেখে জ্যাকেরিয়া খাঁ হতাশ হয়। পুত্র ইয়াহিয়াকে ডেকে প্রশ্ন কবে — এবারে কি করবে?

ইয়াহিয়া বলে — যুদ্ধ।

— নিশ্চিত পরাজয়। কী বিবাট বাহিনী দেখেছ?

— সে তো জানা কথা।

পুত্রের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে জ্যাকেবিয়া যখন অন্যান্য সেনানায়কের মতামত চাইল তাবা একবাক্যে বলে আত্মসমর্পণ করলে লাহোর বাঁচবে।

— তা ঠিক।

একজন প্রবীণ সিপাহী অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল। সে চিৎকাব করে ওঠে — আত্মসমর্পণ কখনই নয়।

তার স্পর্ধা দেখে জ্যাকেরিয়া বিস্মিত হয়। কিন্তু একজন তাকে অনুচ্চ কণ্ঠে বলে — এই হল সেই মির্জা আজিজ বেগ, যে সেবারে একা হানাদারদের বিধ্বস্ত করেছিল এই নদীর আরও উত্তরে। সেবারে আপনাকে সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিল।

— তাই নাকি ? চিনতে পারা যায় না।

— দাঁড়ি গোঁফ একেবারে পেকে গিয়েছে।

জ্যাকেরিয়া খাঁ মির্জা আজিজ বেগকে বলে — অত দূর থেকে আলোচনা করা যায় না। কাছে এসো আজিজ।

মির্জা আজিজ বেগ ছুটে এসে জ্যাকেরিয়া খাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

— এবারে বল কি বলবে।

— আমরা যুদ্ধ করব।

— তাহলে লাহোরের ধ্বংসস্তূপ পড়ে থাকবে শুধু।

— তাই বলে আত্মসমর্পণ?

— তুমি তো অনেক অভিজ্ঞ। দুই দলের পার্থক্য বুঝতে পারছ না?

— পারছি। কিন্তু প্রথমেই ধরা দেব কেন? আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ওদেরও কিছু রক্ত ঝরুক।

— তুমি জান না আমরা যে যুদ্ধ করি তাতে দিল্লীর অনেকের সায় নেই।

— শাহানশাহের?

— তিনি কখনই চাইবেন না, নাদির শাহ্ দিল্লী অধিকার করুন।

— এইটুকুই যথেষ্ট মেহেরবান। আমি চেষ্টা করতে চাই। আমাকে অনুমতি দিন।

জ্যাকেরিয়া খাঁ প্রবীণ যোদ্ধাটিকে অনুমতি না দিয়ে পারল না। অশ্বারোহীর অর্ধেকের ভার তার হাতে সমর্পণ করে বলে — যাও, এরা সব তোমার।

সাদা গোঁফ দাড়ির ফাঁক দিয়ে আজিজের দাঁত ঝলসে ওঠে। সে কুর্নিশ করে পেছনে ফিরে তার দণ্ডায়মান অশ্বটির ওপর লাফিয়ে ওঠে।

এমন প্রচণ্ড আক্রমণের স্বাদ নাদির শাহ্ প্রথম পেলেন। তিনি ভাবতেও পারেননি এভাবে তাঁর বিশাল বাহিনীর ওপর কয়েক হাজারের এক অশ্বারোহী দল অমিতবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ফলে ক্ষয়ক্ষতি হল প্রচুর। যুদ্ধও চলল বহুক্ষণ। দূর থেকে জ্যাকেরিয়া যুদ্ধের আলোড়ন দেখতে পাচ্ছিল অস্পষ্ট ভাবে। সে ভেবেছিল মির্জা আজিজের শক্তি অল্পেতেই নিঃশেষিত হবে। তা কিন্তু হল না। সে একাই যেন শত অশ্বারোহীর শক্তি নিয়ে লড়ে যাচ্ছে। নাদির শাহ্ নিজের সৈন্যের এত মৃত্যু দেখে প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হন প্রথমে। তিনি আজিজকে বহু আগেই চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। কারণ এই আক্রমণ যে সে-ই পরিচালিত করছে সহজেই বোঝা যাচ্ছিল। একবার তাঁর মনে হয়েছিল নিজেই ছুটে গিয়ে তাকে শেষ করে দেবেন। তারপর তার অশ্বচালনা আর অসিচালনা দেখে বিমুগ্ধ নয়নে চেয়ে রইলেন। তাকে হত্যা করার কথা ভুলে গেলেন।

কিন্তু কতক্ষণ লড়বে আজিজ। তার শক্তিরও তো শেষ রয়েছে। তাছাড়া তার অশ্ব তীর আর বল্লমের সহস্র ক্ষত নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। মাটিতে পড়ে গেল। সেই সময় নাদির শাহ্ নিজে ছুটে এলেন তাঁর অশ্ব নিয়ে। একজন সিপাহী মির্জা আজিজ বেগের মাথায় তলোয়ার তুলেছিল। নাদির শাহ্ হুংকার দিয়ে ওঠেন — থামো।

সবাই থেমে যায়। নাদির শাহ্ আহত আজিজের দিকে একটু চেয়ে থেকে একজনকে বলেন — একে বন্দী কর। হাকিমকে খবর দাও একে দেখতে। যেন এর মৃত্যু না হয়।

অপরাহ্নের শেষ বেলায় নাদির শাহের কাছে জ্যাকেরিয়ার পত্র আসে। তাতে লেখা রয়েছে :

আমি আত্মসমর্পণ করছি। শিবিরে অপেক্ষা করছি। লাহোরের আরও গণ্যমান্য ব্যক্তিও রয়েছেন এখানে। আপনি যদি আমাদের হত্যা করতে চান, করতে পারেন। যদি লাহোর নগরী লুঠ করতে চান স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারেন সেখানে। নগরী এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

আমাদের দ্রব্যসামগ্রী সব সেখানে পাবেন। উঠিয়ে নিতে পারেন। আর যদি অর্থ চান তাহলে মেরেকেটে এক কোটি টাকা দিতে পারি। তার বেশি এক কপর্দকও দেওয়ার সাধ্য নেই লাহোরবাসীর।

নাদির শাহ্ পত্র পাঠ করে একটু ভাবেন। তারপরে জ্যাকেরিয়ার কাছে খবর পাঠান আলোচনার জন্য। জ্যাকেরিয়া খাঁ নাদির শাহের সঙ্গে আলোচনায় বসেন।

কিন্তু আসল আলোচনার আগে নাদির শাহ্ বলেন — আপনার এত কম অশ্বারোহী কেন? আর সব গেল কোথায়?

— আমার এই কয়জনই।

— মোগল সৈন্য কোথায় গেল?

— আসেনি।

— কেন?

— বলতে পারছি না।

— আমি বলতে পারি। দিল্লীতে এখন প্রশাসনের অস্তিত্ব নেই। থাকলে এভাবে প্রায় বিনা বাধায় আমি এতদূর আসতে পারতাম না। এখানে যেমন আপনি, কাবুলে তেমনি নাসির খাঁ। আপনি এখানে আত্মসমর্পণ করলেন, কিন্তু কাবুলে নাসির খাঁ শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছিলেন তাঁর সীমিত সামর্থ্য নিয়ে। দিল্লী শুধু ঘুমোয়। আমি বারবার দিল্লীতে পত্র দিয়েছি, জবাব পাইনি। দূত পাঠিয়েছি, সেই দূত শুধু হাতে ফিরে আসে। একজন তো ওখানেই পড়ে রইল। আর একজন খুন হল। আমি কি এসব কথা ভুলে যাব? দিল্লীর বাদশাহ্ আমাকে অবহেলা করেছেন, ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করেননি। এখন বোধহয় খুব বেশি দেরি হয়ে গিয়েছে। তবে আমি তাঁর শত্রু নই। অতবড় বংশের বংশধর। তাঁকে শত্রু বলে ভাবতে দুঃখ হয়। তবু সহ্যেরও তো একটা সীমা রয়েছে? আপনি কি বলেন? আপনার নাম কি যেন?

— জ্যাকেরিয়া খাঁ।

— হ্যাঁ, জ্যাকেরিয়া খাঁ, আপনার অভিমত কি ?

— আমি শাহানশাহ নই, তাঁর মতামত পেশ করার অধিকার আমার নেই।

— তা বটে। আপনার আমি ক্ষতি করব না কোন। কি লাভ? শুনলাম আমার নামে খুব দুর্নাম রটেছে। সব পুড়িয়ে দিয়ে হত্যা করে এগিয়ে আসছি নাকি। সে তো একটু হবেই। সবাইকে বুকে জড়িয়ে কোলাকুলি করতে আসিনি ঠিকই। আমার এতবড় বাহিনীর চরিত্র গঠন তো আমি করিনি। তাদের নানান রুচি। কেউ অর্থের জন্য লালায়িত, কেউ স্ত্রীলোক দেখলে নিজেকে সামলাতে পারে না। কারও পুরুষ দেখলেই খুন করতে ইচ্ছা হয়। কারও মনে শান্তির নীড় দেখলেই পুড়িয়ে দেওয়ার উদগ্র বাসনা জাগে। কারণ তারা বহুদিন ঘর-ছাড়া। এমন শান্ত পরিবেশে সুখের সংসার দেখলে ঈর্ষাবশত হত্যা করে দগ্ধ করে এক ধরনের আনন্দ পায়। আমি তো প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে বেছে নিয়ে তাদের চরিত্র সংশোধন করতে যাব না। সুতরাং এসব চলবে। কি বলেন?

— আমি আর কি বলব? আপনি যা বলছেন আমি শুনছি।

— আপনার কি মনে হয় আমি যুক্তিহীন কথা বলছি?

— কখনই নয়। আপনার নিজস্ব যুক্তি অবশ্যই রয়েছে। নইলে মনের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পাবেন কি করে?

নাদির শাহ জ্যাকেরিয়া খাঁয়ের মুখের দিকে সামান্য একটু চেয়ে থেকে বলেন — আপনি বুদ্ধিমান। যাহোক, দুর্নাম রটলেও আমি শাহানশাহর শত্রু নই। শত্রু হলে নাসির খাঁকে আবার কাবুলের শাসনকর্তা করে দেব কেন?

জ্যাকেরিয়া অবাক হয়ে বলে — তাঁর মৃত্যু হয়নি?

— হতো। আমি হতে দিই নি। একজন হাকিমকে রেখে এসেছিলাম তাঁর চিকিৎসার জন্য। তিনি ভাল হয়ে উঠেছেন। আজ আপনার একজন প্রবীণ ব্যক্তি, সাধারণ সিপাহী বলেই মনে হল। কিন্তু সে-ই দেখলাম আপনার অশ্বারোহী দলকে পরিচালনা করল। কী অদ্ভুত শৌর্য প্রদর্শন করল। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

— সে মারা গিয়েছে?

— না, মরতে দিইনি। হাকিমের কাছে রেখেছি। ভাল হলে আপনি ফেরত নেবেন।

এতক্ষণে জ্যাকেরিয়া নাদির শাহের দিকে ভালভাবে চেয়ে দেখে। সেই মুখ সবটাই প্রায় শ্মশ্রু গুম্ফ দ্বারা আবৃত। তবে অতি উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় দৃশ্যমান। সে কিছুক্ষণ সেই চাহনির দিকে চেয়ে থেকেও মানুষটার মনের নাগাল পেল না। তবে নাদির শাহের যে এক ধরনের নীতিবোধ রয়েছে এটা তার বোধগম্য হল। তাঁর অগ্রগতির পথে যে সব অমানুষিক নিপীড়ন লুণ্ঠন আর হত্যা চলে তারও একটা চমৎকার যুক্তি খাড়া করেছেন তিনি।

লাহোর, লুণ্ঠনের হাত থেকে রক্ষা পেল বটে, তবে নাদির শাহ এমন ভাব দেখাতে শুরু করলেন যেন তিনিই হিন্দুস্থানের প্রকৃত মালিক। পূর্বে তো নাসির খাঁকে তার পূর্ব পদে বহাল করেছেন, এখানে জ্যাকেরিয়া খাঁকেও বললেন আগের মত তার প্রশাসনিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে। ফকরুদ্দৌল্লা ছিল কাশ্মীরের পূর্বতন প্রশাসক। তাকে বিদ্রোহীরা সেখান থেকে বিতাড়িত করার পর লাহোরে এসে অসীম দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করছিল। নাদির শাহ ফকরুদ্দৌলাকে কাশ্মীরে পুনর্বহাল করে বিদ্রোহীদের কাছে নির্দেশ পাঠালেন কোন রকম বাধার সৃষ্টি করলে সহ্য করা যাবে না। ভাবখানা, নির্দেশ যেন যাচ্ছে দিল্লীর তক্ততাউস থেকে।

জ্যাকেরিয়া খাঁকে তিনি হঠাৎ বলেন — এই যুদ্ধ কে পরিচালনা করল জানেন?

— না।

— আমার দ্বিতীয় পুত্র মুর্তজা কুলি।

— ও খুব বুদ্ধিমান।

— বয়স কত জানেন?

— কি করে জানব?

— একুশ।

— খুব কম বয়স দেখছি।

— আপনাদের শাহানশাহেরও পুত্র আছে জানি। তার বয়স কত ?

— সেও তরুণ, তবে একুশ কখনই নয়। পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে।

— আমার এই পুত্রকে কালকে একটা খেতাব দেব। কাল থেকে সে আর মুর্তজা কুলি থাকবে না। সে হবে নসরুল্লা মির্জা।

— সুন্দর নাম। সুন্দর অর্থ, আল্লার বিজয়।

— হুঁ। এই নাম দেব বলে উপযুক্ত সময়ের জন্য এতদিন অপেক্ষা করেছি। তাই কাছে রেখেছি। জ্যেষ্ঠ পুত্র রেজা কুলি বলতে গেলে দিগ্বিজয় করে ফিরেছে দেশে। আমার সঙ্গে দেখা করে গিয়েছে। তার বয়সও বেশি নয়। মাত্র পঁচিশ।

— আপনার পুত্রভাগ্য ভাল।

নাদির শাহ বুঝলেন বোধহয় দ্বিতীয় পুত্রের সাফল্যে তিনি আজ একটু বেশি প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছেন। তাই একজন আঞ্চলিক শাসন কর্তাকে এতটা গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছেন। তিনি হঠাৎ অসম্ভব রকম গম্ভীর হয়ে বলেন — আপনি এখন যেতে পারেন। আপনার টাকা পেয়ে আমি আপাতত সন্তুষ্ট। তবে কারও কোন বেয়াদপি দেখলে আপনাদের এই সাধের শহর গোরস্থান হয়ে যাবে।

জ্যাকেরিয়া খাঁ নাদির শাহের উক্তি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে করতে স্থানত্যাগ করে। তার অনেক কাজ বাকি পড়ে রয়েছে। একটা ফয়সালা হয়ে গিয়ে ভালই হয়েছে। দিল্লীর যখন গরজ নেই তখন কি আর করা যাবে? এখন অন্তত নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এর পরে দিল্লী বুঝুক। এখন তার প্রথম কর্তব্য কাউকে নাদির শাহের ছাউনিতে পাঠিয়ে আজিজ বেগের অবস্থা জেনে নেওয়া। তার জন্যে গর্ববোধ হয় জ্যাকেরিয়ার। নাদির শাহ যার কৌশলে মুগ্ধ সে সাধারণ মানুষ নয়। সে যে সাধারণ নয় সে কথা অজানা ছিল না। কিন্তু সেই অসাধারণত্বের মর্যাদা পায়নি সে। তাকে সাধারণ সিপাহীদের চেয়ে কিছুটা উঁচু পদে রাখা হয়েছিল। তবে জ্যাকেরিয়া খাঁ তাকে সব সময় কাছাকাছি রাখত, কারণ তার ওপর অগাধ আস্থা ছিল। নইলে এক কথায় অতবড় এক অশ্বারোহী দলের অধিপতি করে নাদির শাহের বিরুদ্ধে কখনই পাঠানো হত না।

নাদির শাহের হারেমের সুন্দরীরা নিজের হাতে রুটি পাকানো থেকে মুক্ত। তাদের খাদ্য সরবরাহ করা হয়। তবে কারও যদি বিশেষ কিছু খাওয়ার বাসনা জাগে অনেক সময় চুলা এনে করে নেয়। তেমন খুব কমই হয়। কারণ খাদ্যের অভাব হয় না তাদের। তবু শৈশবে মায়ের হাতে তৈরি যে সব খাদ্য তারা খেয়েছে, সবই তো মুখে লেগে রয়েছে। তাই সাধ জাগে মাঝে মাঝে। অনেকদিন থেকেই তনবীরের মনে হচ্ছিল মায়ের হাতের মকাই দিয়ে তৈরি এক

ধরনের খাদ্যের কথা। কিন্তু কিভাবে তৈরি করতে হয় সে জানে না। যখন মা তার হাতে তুলে দিতেন তখন দেখে শেখার বয়স হয়নি। তারপবে তো মায়ের সেই অদ্ভুত মৃত্যু হল আব পিতার ঘরে এল নতুন বিবি। তার নিজের আশ্রয় জুটলো খালার গৃহে। তারপর তার জীবন এক জটিল আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত নাদির শাহের হারেমে। হ্যাঁ, সৌন্দর্যের খ্যাতি তার বরাবরই ছিল। সেই রূপই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল শেষ পর্যন্ত। তনবীরের মনে হয় তার সংস্পর্শে যে আসে সে বাঁচে না। প্রথমে মা গেল। তারপর খালা। খালার ওখানে যে তরুণটিকে দেখে সে আকৃষ্ট হয়েছিল তাকেও একজন হঠাৎ খুন করে ফেলল। আর সেদিন চলে গেল ফরজানা। তারই সমবয়সী কিংবা একটু ছোটই হবে। যৌবন-জ্বালা ধরে রাখতে শেখেনি। সব সময় ছটফট্ করত। নানাভাবে তাকে তনবীর কত বুঝিয়েছে অমন করে লাভ হয় না কোন। ফরজানা কর্ণপাত করেনি। এই জীবন তাব পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ইচ্ছে করেই মৃত্যুকে বরণ করে নিল বলে মনে হয়। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে যখনি সে দুটো মশাল জ্বলে উঠতে দেখল তখনি বুঝল ফরজানা শেষ হয়ে গেল।

ওই ফরজানাই তাকে ঠিক মৃত্যুর আগের দিনে মায়ের হাতে তৈরি মকাই-এর মত জিনিস দিয়েছিল। খেয়ে তৃপ্তি পেয়েছিল খুব। কোথা থেকে এনে দিয়েছিল সেই রহস্য উদঘাটন হয়নি আর। বেঁচে থাকলে হতে পারত।

তনবীর শুনেছে তারা নাকি লাহোরের পাশে আছে। খুব নামডাক এই নগরীর। এখানে এসে খাদ্যবস্তু অনেক ভাল পাচ্ছে। শহরকে চোখে দেখতে না পেলেও তার আভাস পায়। সে শুনেছে নাদির শাহের পুত্র নাকি খুব নাম করেছে। যে যুদ্ধ করতে পারে সে নিশ্চয় বালক নয়। তনবীবেব মনে প্রশ্ন জাগে তার নিজের হারেম নেই? না থাকলে শাহ তাঁর হারেমের খানিকটা তো ছেড়ে দিতে পাবেন। সে জানে কথাটা মুখ দিয়ে প্রকাশ করলে মুহূর্তে আসল জায়গায় পৌঁছে যাবে এবং তার ফল হবে মাবাত্মক — ফরজানার চেয়েও ভয়ঙ্কর। সবাই বোবার মত থাকে বটে, কিন্তু কারও কোন গলদ পেলে সঙ্গে সঙ্গে কানাকানি হতে হতে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যায়। একঘেয়ে জীবনে সেটাই বৈচিত্র্য। তাতে কারও প্রাণ যদি যায় তো যাক্। উত্তেজনা অনুভব কবা যায়। বন্দিনী জীবনে উত্তেজনার বড়ই অভাব।

রাত বাড়ছিল। তনবীর মাথার নীচে দুই হাত রেখে ওপর দিকে চেয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। ফবজানা ঠিকই করেছে নিজেকে শেষ করে দিয়ে। এই কি জীবন? বাহিনীর সঙ্গে আসতে আসতে কত দৃশ্য চোখে পড়ে। স্ত্রী-পুরুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দূর থেকে তাদের দিকে চেয়ে থাকে। কখনো দেখে মায়ের বুকে শিশু। অমন একটা শিশু পেলে সারা জীবন সে আর কিছু চাইত না। শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে জীবন কাটিয়ে দিত। কিন্তু কে দেবে শিশু?

বাইরে কয়েকটি পদশব্দ বেশ জানান দিয়ে এগিয়ে আসছে। নারীর পায়ের শব্দ তো এত ভারী হয না। কে যেন একজন সবাইকে বাইবে বের হয়ে আসতে বলছে। তনবীর ভাবে এই রাতেই রওনা হতে হবে নাকি? কিংবা ফরজানার মত কেউ পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছে?

তাকেও বাইরে যেতে বলা হয়। সে বাইরে গিয়ে দেখে তারই মত জনা দশেক সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের সম্মুখে স্বয়ং নাদির শাহ। সে গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ায়। আরও ডাকতে যাচ্ছিল একজন খোজা।

নাদির শাহ্ বলেন — থাক।

নাদির শাহ্ সোজা তনবীরের কাছে এসে আলোয় মুখ দেখেন। সর্ব অবয়ব একবার দেখে নিয়ে তার হাত ধরেন।

সেই কবে একজন তরুণ তার রূপে আকৃষ্ট হয়ে প্রাণ দিয়েছিল অন্যের ঈর্ষায়, তারপর এতদিন সেই ফুল ছিল অনাঘ্রাতা অবস্থায়। ভ্রমর আসেনি। এতদিন পরে এই স্বল্প আলোতেও এক প্রবীণ ভ্রমরকে আকৃষ্ট করল। তবু তো করল। এতেই পাশের সুন্দরীরা হিংসায় জ্বলছে। ওই মমতাজ, যার সঙ্গে তার এত ভাব, তার চোখেও আগুন ঝলসে উঠল। ওই যে গুলজার, সেও ভ্রূভঙ্গি করল। সব দোষটা যেন তনবীরের। নাদির শাহ যে পাকা জহুরী এটা তাদের মাথায় ঢুকল না। কিন্তু এবারে তার কর্তব্য?

নাদির শাহের সঙ্কেতে অন্য সবাইকে নিজেদের শিবিরে ফিরে যেতে বলা হল। হারেমের ঠিক মাঝখানে নাদির শাহের রাত্রির আবাস। সেই তাঁবুটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এবং উচ্চতায় অনেক বড়। দূর থেকে কত দেখেছে তনবীর। সৌভাগ্যবতীরা জীবনে একবার কিংবা বড়জোর দুইবার ওই শিবিরে প্রবেশ করার অধিকার পায়। আজ তনবীর পেয়েছে। আনন্দ যে তার হচ্ছে না একেবারে, তা নয়। কারণ আগামী কাল সবাই তার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকবে। হয়ত রাত্রিবাসের কোন চিহ্ন আবিষ্কারের অত্যুগ্র উৎসাহে। আনন্দের সঙ্গে অহঙ্কারও মনের ভেতরে বাসা বাঁধে। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা ভয় তাকে ধীরে ধীরে অবশ করে দিচ্ছে যেন। নাদির শাহ তাকে শয্যাসঙ্গিনী করার জন্য নিয়ে চলেছেন। কিন্তু তাঁকে কিভাবে আনন্দ দিতে হবে সে জানে না। তার কোন ধারণাই নেই। নিশ্চয় তিনিই সব ব্যবস্থা করে নেবেন। তবু মনের ভেতরে একটা সংশয় জাগে। যদি সে ব্যর্থ হয়? যদি শাহ কুপিত হন? ব্যর্থ হয়ে জীবন দিতে হয়েছে এমন কারও কথা সে এ পর্যন্ত শুনতে পায়নি। তবু শরীরের ভেতরে শির শির করতে থাকে। এমনিতেই খুব ঠাণ্ডা, ভয়ে সে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে যেতে থাকে।

নাদির শাহ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন — কি হল?

— কিছু না খোদাবন্দ।

— চল।

তাঁবুতে প্রবেশ করতে চোখ জুড়িয়ে যায়। অনেক বাতি সেখানে। ভেতরটা কারুকার্যময়। কল্পনাও করেনি কখনো তনবীর এমন হতে পারে। কত রঙ। একপাশে সুন্দর শয্যা পাতা। জীবনে এমন শয্যা সে দেখেনি। এ কোথায় এল? স্বপ্নেও যে এমন দেখা যায় না।

নাদির শাহ্ শয্যায় বসে তাঁর পাদুকা এবং বাইরের পোশাক সব খুলে ফেলেন। তাকে কাছে ডাকেন এবং একেবারে কোলের কাছে টেনে এনে তার পোশাকও খুলতে থাকেন। সে জানে তাঁকে এইভাবে পরিশ্রম করতে দেওয়া উচিত হচ্ছে না। তবু সে আড়ষ্ট হয়ে যায়। কিছু

করতে পারে না।

— একি, তোমার হাত বরফের মত ঠাণ্ডা। ভয় করছে?

তনবীর আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। তার মুখ দিয়ে কথা ফোটে না।

তাকে যখন শয্যায় তুলে দেন শাহ তখন তার দেহে আচ্ছাদন বলতে অবশিষ্ট কিছুই থাকে না। তনবীর বোঝে তার নিজের করার কিছু নেই। তবে শাহের পাশে শুয়ে তার শীতলতা কমতে থাকে। শাহের স্পর্শে সে একটু একটু করে সতেজ হতে থাকে। বুঝতে পারে আগামী কালের সূর্যালোক তার মধ্যে এক নতুন নারীর সন্ধান পাবে। সহসা কিছু না ভেবে সে শাহকে জড়িয়ে ধরে।

সবচেয়ে প্রথমে রওনা হল আলি হামিদ খাঁ তার সৈন্যদল নিয়ে। গন্তব্যস্থল কারনাল। দিল্লীর অধিবাসীদের খুব কৌতূহল হয়। কিছু কিছু সৈন্যসামন্তের চলাচল, তারা আগে দেখেছে বটে, তবে এমন বিপুল ভাবে তাদের নড়াচড়া করা এই প্রথম দেখছে। তারা শুনে ফেলেছে পারস্যের শাহ হিন্দুস্থানের মধ্যে ঢুকে পড়ে অনেক দূর এগিয়ে এসেছেন। বিশ্বাস না করলেও শুনেছে যে শত্রুরা দিল্লী অবধি চলে আসতে পারে। পারস্য নামে একটা দেশ রয়েছে এটা তারা জানে। কারণ অনেক পারসিক রয়েছে এখানে যাদের বাস দুতিন পুরুষ হয়ে গেল। সদ্য সেই দেশ থেকে আসা পারসিকও অনেক দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তারা এদেশ আক্রমণ করবে কেন, একথা বুঝে উঠতে পারে না। তাছাড়া তারা এমন কিছু বাঘ ভাল্লুক নয় যে ভয়ে সিঁটিয়ে যেতে হবে। তাই নাদির শাহকে নিয়ে তাদের মধ্যে কোনরকম দুর্ভাবনা নেই। দুর্ভাবনা রয়েছে শুধু তাদেরই, যাদের পরিবারের কেউ না কেউ যুদ্ধে রওনা হয়েছে কিংবা রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

দাদী মেহের পারভীন ডেকে পাঠান শাহানশাহকে। এই মুহূর্তে দাদীর তলব তাঁকে বিরক্ত করে। কারণ আর কিছুক্ষণ পরেই তাঁর মহলের প্রশস্ত কক্ষে রাজধানীর বিখ্যাত সব ভবিষ্যদ্বক্তা, ঐন্দ্রজালিক ও গণৎকারদের ডেকে পাঠিয়েছেন তিনি। আমির ওমরাহ যারা এখনো দিল্লীতে রয়েছে তাদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এর মধ্যে বৃদ্ধা যে কেন ডেকে পাঠালেন। এমন কিছুই তো বলবেন না। তবু তাঁকে অস্বীকার করার অভ্যাস নেই।

তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে দেখেন তিনি বাতায়ন পথে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছেন। কতটুকু দেখতে পাচ্ছেন তিনিই জানেন, কারণ তার শ্রবণশক্তির মত দৃষ্টিশক্তিও বেশ ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

— আমাকে ডেকেছেন?

বৃদ্ধা ঘাড় ফিরিয়ে পৌত্রকে দেখতে পান। একটু ব্যস্ত হওয়ার ভান করে বলেন — আমি

অশক্ত, তাই আপনাকে অভিবাদন জানাতে পারছি না শাহানশাহ্।

— এখন রসিকতা ভাল লাগছে না। আগামী কাল রওনা হচ্ছি। খুব ব্যস্ত।

এবারে বৃদ্ধা কঠোর স্বরে বলেন — নিজের কর্মফল নিজে ভোগ করছ। এখন অমন ধৈর্য হারিয়ে লাভ নেই।

— কর্মফল বলছেন কেন?

— ওই নাদির শাহকে প্রথমে ঢুকতে দিয়েছ নিজের দেশে সেটাই ভুল হয়েছে।

— সে এতদূর আসবে কখনো বলেনি।

— শত্রু কখনো সত্য কথা বলে না। তুমি শাহানশাহ হয়েও একথা বুঝতে পারনি! অথচ তোমার পূর্বপুরুষরা সবাই বুঝতেন।

— এখন ওসব নিয়ে আলোচনার সময় নেই। আপনি ডেকেছেন কেন বলুন।

— ডেকেছি একটি কথা বলতে। আশা করি সেটা মনে রাখবে।

— কি কথা।

— নাদির শাহের কোন কথা এর পরে বিশ্বাস করবে না।

— এখন তো যুদ্ধ হবে। বিশ্বাস করার মত অবস্থায় আর নেই।

— কিছুই বলা যায় না।

— মনে থাকবে।

— আর একটা কথা। ভুলেও তাকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ জানাবে না।

— সেই প্রশ্ন উঠছে কেন?

- বলা যায় না। হয়ত সে জিতে গেল।

— অত সহজ নয়। আমি সমস্ত গণৎকার, জাদুকরদের আসতে বলেছি। এতক্ষণে তারা হয়ত এসে পড়েছে। তারা সব বলে দেবে।

বৃদ্ধা পিতামহীর চোখে বিস্ময় ফুটে ওঠে। তিনি তাড়াতাড়ি বলেন — ওদের এখনি বিদায় কর। তোমার সর্বনাশ হবে!

— কেন?

— ওরা তোমাকে তুষ্ট করতে ভাল ভাল কথা বলে অনেক ইনাম নিয়ে চলে যাবে। ওদের ওপর বিশ্বাস করলে এখানেই যুদ্ধে তুমি অর্ধেক হেরে বসে থাকবে।

মৃদু হেসে বাদশাহ বলেন — ঠিক আছে। আমি এখন আসছি।

তাঁর যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে বৃদ্ধা বলে ওঠেন — শত্রুকে দিল্লীতে এনো না। ওদের একটা কথাও বিশ্বাস করো না।

তাঁব কথা শেষ হওয়াব আগেই শাহানশাহ কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হন। বৃদ্ধা আবার আনমনে বাতায়ন পথে দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। কতদূর সেই দৃষ্টি যায়, তিনি নিজেও হয়ত জানেন না। আসলে তাঁর দৃষ্টি চলে গিয়েছে অতীতের গর্ভে যেখানে অনেক মণিমুক্ত ছড়ানো রয়েছে। তাদের ঔজ্জ্বল্য তাঁব মনকে ভাঁও দেয়। বর্তমানের কথা মনে থাকে না। তিনি আবিষ্ট হয়ে

থাকেন অতীতের মধ্যে ডুবে গিয়ে।

দাদীর কক্ষ থেকে ফিরে এসে বাদশাহ্ দেখেন আমির ওমরাহ সবাই হাজির। দরবেশ, গণৎকার ঐন্দ্রজালিকরাও এসেছে। তাঁরই প্রতীক্ষায় ছিল এতক্ষণ তারা। তিনি আসতে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে।

শাহানশাহ প্রথমেই একজন দরবেশকে প্রশ্ন করেন — আপনি বলুন পারস্যের শাহ্ এতদূর চলে এসেছেন কেন? তিনি কি আমার শত্রু?

দরবেশ গম্ভীর হয়ে বলে — এতদূর যখন এসেছেন তখন তাঁকে দোস্ত বলে ভাবা ভুল হবে। তিনি আফগানিস্তানে প্রবেশ করেই থেমে যেতে পারতেন।

— তিনি তো পত্র পাঠিয়েছিলেন, লোক পাঠিয়েছিলেন বারবার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।

— তবু লাহোর অবধি আসা উচিত হয়নি। লাহোর তো হিন্দুস্থানের মধ্যস্থল।

শাহানশাহ গম্ভীর হন। তারপর তিনি একজন গণৎকারকে জিজ্ঞাসা করেন — আমরা তো লড়াই এর জন্য প্রস্তুত, যাত্রাও আরম্ভ হয়েছে। এবারে বলুন এই যুদ্ধের ফলাফল কি হবে?

গণৎকার মহলের পরিষ্কার মেঝেতে খড়ি দিয়ে ছক আঁকে। তারপর অনেকক্ষণ ধরে মনে মনে অনেক কিছু গণনা করে। শেষে তার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সে বলে — নির্ঘাত বিজয়।

একজন আমির জিজ্ঞাসা করে — এত নিশ্চিত হলেন কি করে?

— গণনা কখনো মিথ্যা হয় না। গণনায় যদি দেখা যায় আগামী কাল সূর্যোদয় হবে না, তাহলে কখনই হবে না।

— তেমন কখনো হয়নি।

— জানি, তাই গণনাতেও তেমন ফলাফল হবে না।

বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করেন — শত্রুর মৃত্যু হবে?

আবার গুনতে বসে, আবাব খড়ির দাগ দিতে থাকে। মাঝে মাঝে ঠোঁটের ওপর দুটো আঙুল রেখে ভাবতে বসে। শেষে বলে — আচ্ছা নাদির শাহের পুত্র রয়েছে কোন?

আমিরদেব একজন বলে — আছে।

ভ্রু কুঁচকে গণৎকার বলে — পিতার কথা স্পষ্ট হয়ে উঠছে না, তবে পুত্রের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

শাহানশাহ একটু হেসে বলেন — তাতেই হবে। একেবারে ভেঙে পড়বেন নাদির শাহ্।

এবারে বাদশাহ্ একজন জাদুকরের দিকে ফিরে বলেন আপনার মতামত জানতে ইচ্ছা করে।

জাদুকর হেসে বলে — ওঁরা সব তো ভবিষ্যদ্বাণী করছেন গুনে গুনে। আমার ওসব বালাই নেই। আমি আমার অমোঘ মন্ত্রদ্বারা অনেক কিছু করতে পারি।

অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করে বাদশাহ্ জানতে চান — আপনি কি করতে পারেন আমার জন্য?

— আপনি নিশ্চিন্তে যুদ্ধযাত্রা করুন। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি মন্ত্রবলে নাদির শাহের হাত পা বেঁধে ফেলব। তাই দেখে তাঁর অশ্বারোহী সৈন্য দল পালাবার পথ পাবে না। তখন নাদির শাহকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় আপনার পায়ের সামনে এনে ফেলা হবে।

বাদশাহ হৃষ্ট হন। সবাইকে ইনাম দিয়ে বিদায় করে ওমরাহ্‌দের বলেন — কেমন বুঝলেন?

অনেকেই যেন এসবে বিশ্বাস করে কিছু কিছু ওমরাহের তেমনি এসবে আস্থা নেই। তারা ভাবে বুজরুকি। তবু বাদশাহের অতিরিক্ত বিশ্বাস দেখে তারা কোন মন্তব্য করে না। দাদীর সাবধানবাণী বাদশাহের মন থেকে তাঁর কক্ষ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মুছে গিয়েছে। তিনি তুক্‌তাকের ফল জেনে মানসিক দিক দিয়ে বলীয়ান হয়ে ওঠেন।

নিজের আনন্দের ভাগ দেবার জন্য তিনি তাঁর খাস বেগম মালিকা-আল্‌-জুমানির কক্ষের দিকে রওনা হলেন।

সেখানে দেখেন বেগমের সেই হৃষ্টপুষ্ট বাঁদীটি তাঁর পরিচর্যায় ব্যস্ত। তিনি হেসে বলেন—সবাই এসেছিলেন। গণনা শেষ হল।

বেগম ইঙ্গিতে বাদশাহকে নীরব থাকতে বলে বাঁদীকে বলেন — এখন তুই যা ফুলজান। পরে ডাকব।

ফুলজানের নড়ার ইচ্ছা ছিল না। সে খবর পেয়েছিল মহলের নীচের ঘরে অনেকে এসেছে তুক্‌তাক্‌ করার জন্য। বাদশাহ নিশ্চয় সেই কথা জানাতে এসেছেন বেগমকে। শোনা হল না।

সে চলে যেতে শাহানশাহ মহম্মদ শাহ সব কথা বিস্তারিতভাবে বলেন। শুনে বেগমের মুখে চোখে কোনরকম আগ্রহ বা উৎসাহ প্রকাশ পেল না। তাই দেখে বাদশাহও কেমন যেন মনমরা হয়ে পড়েন।

— তুমি কিছু বললে না তো?

— তুমি তো জান আমার এখন এসবে বিশ্বাস নেই। আমার বেলায় কিছুই ফলল না।

— ওদের গণনায় ভুল ছিল কোন।

— ভুল একবার হতে পারে। ভুল একজনের হাতে পারে। কিন্তু অনেকের অনেকবার ভুল হবে কেন? সেই থেকে আমার ওদের বিশ্বাস নেই। একটা মেয়ের সাধ ছিল, পূর্ণ হল কই?

— আমার কিন্তু অনেক কিছু মিলে গিয়েছে।

— তোমার বিশ্বাস নিয়ে তুমি থাক। এটা ওদের অর্থ উপার্জনের ফন্দি। মানুষ মানসিক দিক দিয়ে বড় দুর্বল। সেই দুর্বলতার ফায়দা তোলে ওরা এইভাবে।

— তোমার মন আজ বিক্ষিপ্ত। আমি অন্য একটা বিষয়ে আলোচনার জন্য এসেছিলাম। আগামী কালই রওনা হচ্ছি। তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও।

— আমাকে যেতে হবে?

বাদশাহ হেসে বলেন — তোমাকে ছেড়ে কখনো থাকিনি। পুত্রের বয়স পঁচিশ হয়েছে আর তার বেগম এসেছে বলে, নিজেকে বৃদ্ধা ভাব নাকি? ভুলে যেও না তোমার ষোল বছর বয়সে আমার বেগম হয়েছিলে।

— আমার একটু দ্বিধা রয়েছে। নাদির শাহ্ খুব দ্রুত এগিয়ে এসেছেন। সাধারণ শত্রুর মত আদৌ নন। তুমি হারেম নিয়ে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়বে না তো?

মহম্মদ শাহের আঁতে ঘা লাগে। মনে মনে ভাবেন, শেষে তুমিও? দাদী আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন না। তাঁর কথার মধ্যে সেটা ফুটে উঠেছিল। এখন তুমিও এরকম ভাবছ?

মুখে বলেন — তুমি কি ভুলে গেলে আমি তামাম হিন্দুস্থানের বাদশাহ? হিন্দুস্থান পারস্য নয়। তাব চেয়ে অনেক — অনেক বড।

— জানি। কিন্তু সেই হিন্দুস্থানের অনেকটা এলাকা পার হয়ে নাদির শাহ্ লাহোরে পৌঁছে গিয়েছেন বিনা বাধায়।

— কে বলল বিনা বাধায় ?

— মহলের বাঁদীরাও একথা বিশ্বাস করে। সুতরাং এর মধ্যে সত্য রয়েছে। যারা বাধা দিয়েছে তারা নিজেদের চেষ্টায় দিয়েছে। দিল্লী তাদের কোন সাহায্য দেয়নি।

—একথা কি করে রটলো?

— সত্য কখনো রটে না। গুজব রটে। সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। সাধারণ মানুষ এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাই বলে তারা বুদ্ধিহীন বলে ভেবো না। শত্রু দ্বারে করাঘাত করলে সাধারণ মানুষও বাধ্য হয়ে ভাবতে বসে। তখন সত্য আপনা থেকেই প্রতিভাত হয়।

এতদিনের নিষ্ক্রিয়তার জন্য শাহানশাহ নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার ছিলেন না। তাই বেগমের অনুযোগের উত্তর তিনি দিতে পারেন না। তিনি ভালভাবে জানেন আমির ওমরাহদের নিজের ইচ্ছানুযায়ী চালনা করার শক্তি তাঁর নেই। তারা জোর করে যখন কিছু বলে তিনি তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারেন না। তাদের মতামতের ওপর নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করার মত মনের জোর পান না তিনি। তাই অধিকাংশ সময়ে তাদের ইচ্ছামত তাঁকে চলতে হয়। নাদিব শাহের বেলাতেও তাই হয়েছে। ওমরাহেরা নাদির শাহের পত্র এবং তার প্রেরিত দূতকে কোন গুরুত্ব দিতে চায় না। তিনি তাই মেনে নিয়েছেন। তাঁর ভালই লেগেছিল। কারণ ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট ধাতে সয় না। এখন বুঝছেন বড় দেরি হয়ে গিয়েছে।

তিনি বেগমকে বলেন— ভুলভ্রান্তি যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। তাই নিয়ে এখন ভেবে লাভ নেই। এখন আমরা শাহের সম্মুখীন হতে চলেছি। তোমাকেও সেখানে যেতে হবে।

— যাব। তবে দেখো বে-ইজ্জত না হতে হয়।

— নাদিব শাহ্ কিন্তু একবারও বলেননি যে তিনি আমার শত্রু। তিনি আমাদের বংশকে শ্রদ্ধা করেন। পত্রে কয়েকবার তার উল্লেখ করেছেন।

— এখনো স্বকপোলকল্পিত রাজ্যে বাস করছ। ওসব মন থেকে মুছে ফেল। শত্রুকে শত্রু

বলে ভাবতে শেখ। নইলে তার ওপর ক্রোধ জন্মাবে কি ভাবে? আর ক্রোধ না জন্মালে তাকে বিনাশ করবে কেমন করে?

শাহানশাহ বেগমের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। তাঁকে যেন আজ প্রথম দেখছেন। শৈশবের শিক্ষানুসারে নারী জাতিকে তিনি কখনো বুদ্ধিযুক্ত প্রাণী বলে ভাবার চেষ্টা করেননি। আজ দেখছেন, তাঁর দাদী, তাঁর বেগম যা বলছেন ওমরাহরা সেভাবে বললে কাবুলের পরে আর এক পাও অগ্রসর হতে পারতেন না নাদির শাহ্। তখন কাবুলের নাসির খাঁকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। আর সেই বিদ্রূপে তাল দিয়েছেন তিনি। নাসির খাঁ যে কতখানি বিচক্ষণ কত বড় যোদ্ধা এখন বুঝতে পারছেন। লাহোরের জ্যাকেরিয়া খাঁ অনেকবার সাহায্য চেয়েছে। নিজের পুত্রকে দরবারে পাঠিয়েছে মরিয়া হয়ে। তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি আজও। এখন আফসোস হচ্ছে। হলে কি লাভ? নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর যার আস্থা নেই, কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা পর্যন্ত যে হারিয়ে ফেলেছে বিলাসিতায় মগ্ন থেকে, নিজের ওপর আস্থা রাখার হিম্মৎ তার যে থাকে না সে কথা তিনি আজ বুঝছেন। কিন্তু এখন বুঝে লাভ কি? এখন কি সাদাত খাঁ নিজামুল মুলক ইত্যাদি অন্যান্য ওমরাহের সৈন্যদলকে সাজিয়ে পরিচালনা করার সাহস তাঁর আছে? এখন তারা নিজের নিজের মত চলবে। বড় জোর খান দউরানের সঙ্গে পরামর্শ করবে। কারণ খান দউরান সর্বাধিনায়ক। যদিও পদ অনুযায়ী মর্যাদা সেও পায় না এদের কাছ থেকে। সব কিছুই ঢিলেঢালা। বাঁধুনিটাই নেই যেন। শাহানশাহ জানেন সব দায় তাঁর।

বেগমের সঙ্গে তাঁর আরও কিছুক্ষণ কথা হয়। কথা হয় পুত্র সুলতান আহমেদ সম্বন্ধেও। পুত্রেব ওপর বেগম খুব তুষ্ট বলে মনে হল না। স্বাভাবিক। কাউকে তুষ্ট করার মত কাজ শাহাজাদা করে না। শাহানশাহ নিজেও তার প্রতি মাঝে মাঝে বিরক্ত হন। বিশেষ করে নারীর প্রতি তার উদগ্র লালসা দেখে। শুধু সেই জন্যই খুব কম বয়সে তাকে বেগম এনে দিয়েছেন। তাতে তার কুলোয় না। যুদ্ধবিদ্যা দায়ে পড়ে যতটুকু শেখার শিখেছে। তার বেশি নয়। ব্যক্তিত্বও তার তাঁর চেয়ে বেশি আছে বলে মনে হয় না। তবে অনেক ক্ষেত্রে সে তার বুদ্ধির পরিচয় রেখেছে। কিন্তু শুধু বুদ্ধি থাকলে বড়জোর একজন আমির হওয়া যায়, বাদশাহ্ নয়।

বেগমের কক্ষ থেকে বেরিয়ে অলিন্দে পা দিতেই থমকে যান শাহানশাহ। দেখেন তাঁর পুত্র একজন হৃষ্টপুষ্ট স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলছে এবং স্ত্রীলোকটির মুখে হাসি। তিনি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। পুত্র তাঁকে প্রথমে দেখতে পায়নি। শাহানশাহ্ স্পষ্ট বুঝতে পারেন, স্ত্রীলোকটি বেগমের কক্ষে দেখা সেই বাঁদী। তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। বেগম মালিকা আল-জুমানিও তাঁর জীবনের একমাত্র নারী নন। তাই বলে তাঁর রুচি এত ঘৃণিত পর্যায়ে নেমে যায়নি কখনো।

বাঁদীই তাঁকে প্রথম দেখতে পায়। দেখেই ছিটকে চলে যাবার চেষ্টা করতে বেগমের কক্ষ থেকে তালি বেজে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে বাঁদী তাড়াতাড়ি তাঁর পাশ দিয়ে ছুটে ভেতরে ঢুকে পড়ে। শাহানশাহের সম্মুখে একা শাহাজাদা। তাকে বিপর্যস্ত দেখায়। তার ওই অবস্থা দেখে ক্রোধান্বিত

হলেও একটু কৌতুক অনুভব করেন তিনি। ঠিক করেন কোন কথা না বলে তিনি অপেক্ষা করবেন। পুত্রের মুখ থেকে বাক্যনিঃসৃত হোক প্রথম। দেখা যাক সে কি বলে।

শাহজাদা বলে — বেগম সাহেবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

— খুব জরুরী?

— হ্যাঁ। না, তেমন জরুরী নয়। তবু কারনালে যাওয়ার আগে একবার দেখা করতে ইচ্ছা হল।

— একটু পরে যেও। কে যেন একজন ঢুকল।

— ও তো বাঁদী।

— তাই বুঝি। যাও তবে।

বিতৃষ্ণায় শাহানশাহের মন ভরে ওঠে। হারেমের বাঁদীদের নিয়ে টানাটানি কেন? ওর মধ্যে যা দেখে মন মজেছে, সেই জিনিস অন্য কোন নারীর মধ্যেও পাওয়া যাবে। তাকে তুলে আনুক। কিংবা বেগমসাহেবাকে বলে ওর বাঁদীগিরি ঘুচিয়ে দিয়ে নিয়ে গিয়ে রাখুক কোথাও। এভাবে নিজের মর্যাদা বজায় রাখা যায় না।

শাহানশাহ রওনা হবেন পরশু। কিছু সময় দরবারে বসে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করতে গেলেন। তিনি চলে যাওয়ার পরে খান দাউরান, উজির কামরুদ্দিন খাঁ, উজির আজিম আল্লা খাঁ এবং জাঠ নেতা কৃপা রাম ও সিরবুলিন্দকে নিয়ে দরবারের পাশের একটি কক্ষে গিয়ে আলোচনায় বসে।

প্রথমেই খান দাউরান নিজামুল মুলক আর সাদাত খাঁয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। বলে— এঁরা দুজনা অদ্ভুত এক নিস্পৃহ ভাব দেখাচ্ছেন। আমি জানি, কেন তাঁরা এমন করছেন। আমার সর্বাধিনায়কত্ব তাঁরা মেনে নিতে পারছেন না। ভাবছেন, আমার তুলনায় তাঁরা ছোট হয়ে গিয়েছেন সবার চোখে। মস্ত ভুল করছেন তাঁরা। দুজনাই তাঁরা উত্তর আর দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের শাসনকর্তা। বলতে গেলে তাঁরাই স্থান দুটির অধীশ্বর। তবু আমাকে আমির উল-উমর করা হয়েছে। কারণ আমি সব সময় দিল্লীতে থাকি বলে ওঁদের দুজনার চেয়ে অধিক পরিচিত। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ওঁরা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেও বাদশাহের মূল বাহিনী আমার অধীনে রয়েছে। দিল্লী আক্রান্ত হলে সেই বাহিনীই দিল্লীকে রক্ষা কববে। তেমনি শাহানশাহ যেখানে যাবেন, মূল বাহিনী যাবে তাঁর সঙ্গে। আসলে তিনিই হলেন হিন্দুস্থানের সমস্ত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। আমি দিল্লীতে থেকে তাঁর যেমন প্রতিনিধিত্ব করেছি, যুদ্ধক্ষেত্রেও করব। এই সহজ কথাটা ওঁরা দুজনা মেনে নিতে পারেন না।

সিরবুলন্দ বলে— সেটা ওঁদের বুঝবার দোষ । তাই নিয়ে এই সময় মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আমাদের আসন্ন যুদ্ধের কথা ভাবতে হবে।

উজির আজিম আল্লা খাঁ খান দউরানকে প্রশ্ন — করে কারনালে আমাদের বাহিনী কি ভাবে সাজাতে হবে বলে আপনি ঠিক করেছেন? কারণ রণক্ষেত্রের বাহিনী আপনার

পরিচালনায় চলবে।

খান দউরান বলে— শাহানশাহের মূল শিবির যেখানে থাকবে তার সামনে শাহানশাহের ডান দিকে থাকবেন নিজামুল মুলক এবং বাঁয়ে থাকবেন সাদাত খাঁ।

সিরবুলন্দ বলে— তাঁরা একমত হবেন তো?

— এটা একটা ব্যূহ রচনা করা হচ্ছে। ওঁদের দুজনাকে সব চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধ শুরু হলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওঁদের নিস্পৃহতা কেটে যাবে। সর্বশক্তি দিয়ে ওঁরা শাহানশাহ এবং দেশকে রক্ষা করবেন।

আজিম আল্লা খাঁ বলে — আমাকে কোথায় রাখলেন?

খান দউরান হেসে বলে— সবার কথাই বলছি। কাউকে বাদ দেওয়া হবে না।

কৃপা রাম বলে— সেই জন্যই ধৈর্য ধরে বসে আছি।

— শুনুন তবে। সিরবুলন্দ থাকবেন শাহানশাহের ঠিক পেছনে আর তাঁর ডানদিকে কৃপা রাম তাঁর জাঠবাহিনী নিয়ে প্রস্তুত থাকবেন।

কৃপা রাম বলে — আমাকে পেছনে সরিয়ে দিলেন কেন?

— যদি কোন বিপর্যয় ঘটে, সেই বিপর্যয় থেকে শাহানশাহকে রক্ষা করার জন্য আপনার চেয়ে বেশি আর কারও ওপর নির্ভর করা যাচ্ছে না। এখানে কোন রকম পক্ষপাতিত্ব কিংবা তোষণের স্থান নেই। অঙ্কের মত সাজাতে হয়েছে ভেবে ভেবে। শাহানশাহের ডান দিকে থাকব, প্রথমে আমি তারপর মুজাফফর খাঁ, মীর গুলাম, আর খান জুমান খাঁ। শাহানশাহের বাঁ দিকে থাকবেন কামরুদ্দিন খাঁ, আজিম আল্লা খাঁ আর সৈয়দ নিয়াজ খাঁ। কামরুদিন খাঁয়ের দিকেই তাঁর জামাতাকে রাখলাম।

সবাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বলে যে মোটামুটি সব ঠিকই আছে, তবে কারনালে পৌঁছে সব কিছু না দেখা অবধি চূড়ান্ত করা যাবে না কিছু।

খান দউরান বলে — একটা বিষয়ে বাদশাকে কিছুতে বোঝাতে পারছি না।

আজিম আল্লা বলে— কোন বিষয়ে?

—বাদশাহ ওঁর অঞ্চলটি শক্ত কাঠ কিংবা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে বলেছেন।

— কেন?

— যাতে শত্রুরা বিনা বাধায় তাঁর এলাকায় ঢুকে পড়তে না পারে।

— বিনা বাধায় কেন? এতবড় বাহিনী।

— তবু যদি তাদের পরাজয় ঘটে?

— আমাদের সৈন্যদের পরাজয় ঘটলে ওই বেড়া শাহানশাহকে কি করে বাঁচাবে?

— এই কথাটাই তিনি বুঝতে চাইছেন না। ওঁকে বলেছি, "বেড়া দেওয়া থাকলে আপনার রক্ষী বাহিনী অকেজো হয়ে যাবে। তারা লড়তে পারবে না। আপনিও বেড়ার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকবেন।" শুনলেন না বাদশাহ।

কৃপা রাম বলে— আমার মনে হয় এটা ঠিক হল না। এ যেন ওদের কাছে আত্মসমর্পণ।

যুদ্ধেব আগেই নিজের বন্দিত্ব স্বীকার করে নেওয়া।

সবার মুখ গম্ভীর হয়। তবে এখন এসব ভেবে লাভ নেই। বিকেল হয়ে আসছে। ভিস্তিওয়ালা ভিস্তির জল দিয়ে দরবারের প্রাঙ্গণের ধুলো ভিজিয়ে দিচ্ছে।

সবাই উঠে দাঁড়ায়। আগামী কাল থেকে আর কোন অবকাশ নেই। এর মধ্যেই অনেক ছোটাছুটি করতে হয়েছে নিজ নিজ বাহিনীকে একত্রিত করার জন্য। সারা রাত ধরে প্রত্যেকের অস্ত্র পৃথক পৃথক ভাবে পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে। এই সময় অনেকে নিজের অসুস্থতার অজুহাত দেখায় কিংবা বলে পরিবারের কেউ ভীষণ অসুস্থ। সাধারণত স্ত্রী কিংবা মায়ের অসুস্থতার কথা বলে। তাদের মৃত্যু হলে বোধহয় কিছু এসে যায় না। সবার মনে ভয়, মিথ্যা বললে যদি সত্যই ফলে যায়। তাহলে মুশকিল। সেক্ষেত্রে স্ত্রী কিংবা মা কম ওজনদার। স্ত্রীর মৃত্যু হলে স্ত্রী পাওয়া যায়। তাছাড়া একাধিক স্ত্রী যাদের থাকে, তাদের একটার মৃত্যু হলে অনুভবই করা যায় না। আর মায়ের মৃত্যু-- সে তো স্বাভাবিক ঘটনা।

খান দউরান উদ্যোগী হয়ে রাজপুত দম্পতি জয় সিং এবং অন্যান্য রাজপুত রাজাদের কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করেছিলেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। কিন্তু তারা কেউ উৎসাহ দেখাল না। ঔরঙ্গজেবের রূঢ় আচরণের কথা রাজপুতরা আজও ভোলেনি। দিল্লীর তক্ততাউসকে তারপর থেকে শত্রু বলে ভাবে তারা। সাহায্য দূরের কথা, তারা মহারাষ্ট্রের সহায়তায় দিল্লীর জোয়াল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে স্বাধীন হওয়ার পরিকল্পনা করছে এই মুহূর্তে। কোথাকার কোন নাদির শাহ দিল্লীকে বিপাকে ফেলেছে এতে তাদের বিন্দুমাত্র এসে যায় না। বরং খুশি তারা। আর কেউ না জানুক খান দউরান জানে বাদশাহ নিজে পেশোয়া বাজীরাওকে শেষপর্যন্ত সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনিও নীরব। সুতরাং সম্পূর্ণ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে অগ্রসর হতে হচ্ছে। আমির ওমরাহেরা নিজের সৈন্যদল গড়ে তুলছে। আজ যদি রাজপুতানা আর মহারাষ্ট্র স্বপক্ষে থাকত তাহলে শাহানশাহের শক্তি অনেকগুণ বৃদ্ধি পেত। নাদির শাহ নিশ্চয় জানতে পেরেছেন মারাঠা আর রাজপুতদের নিস্পৃহতার কথা। তাতে নির্দ্বিধায় এগিয়ে আসছেন। নইলে এতটা দুঃসাহস তাঁর কখনই হত না।

উমদেন্নেসা মূলত পারস্যের মেয়ে। তাব পিতা পারস্য থেকে অতি অল্প বয়সে এদেশে এসে দিল্লীতে না এসে সোজা চলে যায় ঔরাঙ্গাবাদে। সেখানে নিজের বুদ্ধিবলে এবং নানা কৃতিত্ব দেখিয়ে ধীরে ধীরে উন্নতি করে সে। উমদেন্নেসা তার প্রবীণ বয়সের সন্তান। একবার শাহানশাহ এই ঔরাঙ্গাবাদে আসে এবং পারস্যের বিশেষ এক ধরনের পুষ্প দেখার জন্য উমদেন্নেসার পিতার গৃহে পদার্পণ করে তাকে কৃতার্থ করেন। সেই সময় উমদেন্নেসাকে দেখে ফেলেন।

— এই কিশোরী কে?

— আমার কন্যা। একমাত্র কন্যা।

— বেশ দেখতে। আপনি একবার দিল্লীতে আসুন। আপনি দিল্লীতে বরাবর থাকতে চান?

— না মেহেরবান, আমার এই স্থানটি খুব ভাল লাগে।

— বেশ, এখানে থাকুন। তবে কিছুদিনের মধ্যে একবার দিল্লীতে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

আসলে উমদেন্নেসার রূপ যতটা না হোক তার দেহের কাঠামোর প্রতি বাদশাহের দৃষ্টি পড়ে। খুব মজবুত গঠন। মোগল বংশধরদের মধ্য থেকে তৈমুরের দেহের ঋজুতা আর দৃঢ়তা ধীরে ধীরে লোপ পেতে বসেছে। তাঁর ইচ্ছা সেই দৃঢ়তা আর ঋজুতা ফিরে আসুক আবার। তাই পুত্রের জন্য নারী নির্বাচন। উমদেন্নেসার পিতা এতটা কল্পনা করেনি। শাহানশাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট। তাই দিল্লীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে কোন পদোন্নতির কথা বলবেন কিংবা পুষ্প সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। দুটি ক্ষেত্রেই শাহানশাহের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ । তাই যারপরনাই আনন্দিত হয়েছিল সে।

এরপর সাদি হল। খুবই আড়ম্বরের সঙ্গে হয়েছিল। হিন্দুস্থানের যে কোন নারীর পক্ষে এর চেয়ে সৌভাগ্যবতী হওয়ার কথা কল্পনা করা যায় না। অথচ জীবনের অমন একটি দিনে উদ্‌ভিন্নযৌবনা উমদেন্নেসার মুখ ভার। সবাই ভাবল প্রিয়জনদেব ছেড়ে আসার জন্য। কিন্তু আসলে তো তা নয়। কৈশোর অতিক্রম করার আগেই সে একজনকে ভালবেসে ফেলেছিল। সেই তরুণের বিষণ্ণ মুখ আর গভীর চাহনি দেখলে তার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠত। তার সঙ্গে দুটো কথা বললে তৃপ্তিতে তার মন ভরে যেত। মাত্র একদিন, একটিবার শুধু মুখতার তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করেছিল।

সে যে কী অসহ্য সুখ, ভাবলে আজও তার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে যায়। সুখ যে মানুষকে অচেতন করে দেয় জীবনে সেই প্রথম আর শেষ অনুভব করেছিল সে। সেদিন সামনের মিনারের পাশ দিয়ে চাঁদ উঁকি দিয়ে তাদের দুজনকে আলোকিত করে তুলেছিল। তাদের গোপনীয়তা যে প্রকাশ্য হয়ে পড়েছিল, বুঝতে পারেনি। তবে ধরা পড়ে গিয়েছিল শুধু একজনের কাছে। সে হল তার প্রিয় হরিণশাবক। সে ছুটে এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। সেই স্পর্শে চেতনা ফিরে পেয়েছিল। নইলে অন্য কেউ দেখে ফেললে মুখতার বাঁচত না। আজ মুখতার কোথায়? সে যদি একবার এসে ডাকে, তাহলে এই মুহূর্তে সবার অজ্ঞাতে সে শাহজাদার হারেম পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারে। মুখতারের কী যে দুঃখ, সে জানে না। ওই দুঃখ ভুলিয়ে তার মুখে হাসি ফোটানোর জন্য আজও তার হৃদয় টনটন করে ওঠে। অত ঘটা করে যার সঙ্গে তার সাদি হল, দেখল তার মুখ সবসময় হাস্যময়। বড় সস্তা বলে মনে হল তাকে। দেখে মনে হল জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও তার হৃদয়ে দুঃখের আঁচ লাগেনি। এমন মানুষকে নিয়ে সুখী হওয়া যায়? বড় অগভীর হয় এরা— সেই সময় একটি কিশোরীব তাই মনে হয়েছিল।

আজ উমদেন্নেসা অনেকটা পরিণত। দু-চার বছরে এইটুকু পরিণত হওয়া খুব স্বাভাবিক, বিশেষ করে নারীর ক্ষেত্রে। তারা তো আর সমুদ্র কিংবা স্রোতাস্বিনীর মৎস্য নয়। ওই বৃহৎ

ক্ষেত্রে চিন্তাহীন অবস্থায় মনের সুখে বিচরণ করা যায়। তাই সেই সব স্থানের জলচর প্রাণীরা হয় উদার। ফাঁদ ফন্দির কথা তাদের কল্পনার বাইরে। কিন্তু উমদেন্নেসার যে বদ্ধ জলাশয়ে বাস। এখানে চলতে ফিরতে অনেক কায়দা কানুন। প্রতিটি পদক্ষেপে মস্তিষ্কচালনা না করলে বঞ্চিত হতে হয় কিংবা বিপদে পড়ার সম্ভাবনা। তাই এখানে অনেক বেশি পরিণত হয়ে ওঠে সবাই।

কুলসুম তার বাঁদী হলেও মনের অনেক কথা তাকে বলতে হয়। তাছাড়া কুলসুম হল তার দৃষ্টি। সে অনেক নতুন নতুন খবর নিয়ে আসে বাইরে থেকে। সে এলে মনে হয় দমকা হাওয়া যেন এসে ঢুকল। তার কাছ থেকে জানতে পেরেছে উমদেন্নেসা যে মালিকা- আল জুমানি বাদশাহের সঙ্গী হতে প্রায় রাজি হয়েছেন। অগুনতি, মানুষ আর অস্ত্রের ঝনঝনানির মধ্যে ওভাবে পড়ে থেকে যে কি সুখ বুঝতে পারে না সে। যৌবন বিদায় নিতে তো বেশি বাকি নেই, এখনো এসব কেন? কুলসুমের কাছে মনের কথা বলে ফেলতেই হাসিতে গড়িয়ে পড়ে সে বলেছিল— যৌবন কি শুধু দেহের? মনেরও। বয়স হোক, তখন বুঝবেন।

— তোর বুঝি খুব বয়স হয়েছে? তাই বুঝি বসে আছিস?

— আমার কেন? অন্য বাঁদীরা নেই। তাদের অনেকের বেগম সাহেবা আজ প্রায় বৃদ্ধা। তাদের কাছে তাঁরাও মনের কথা কত বলেছেন।

— সর্বনাশ। তুই আমার কথাও ফাঁস করে দিবি তাহলে ?

— তোবা, তোবা। আপনি আমরা আশ্রয়দাতা। আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে এই মুহূর্তে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন। আপনার সঙ্গে নিমকহারামী করব আমি?

— সবার বাঁদীই একই কথা শোনায় বেগমদের।

কুলসুমের মত বুদ্ধিমতী নারীও হঠাৎ কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। বেগম সাহেবাকে সে খুবই পছন্দ করে এবং ষোল আনা বিশ্বস্ত বলে কোন উত্তর দিতে পারে না। তার চোখে জল এসে যায়।

— তুই কাঁদছিস নাকি?

চোখে ওড়না চেপে ধরে ঘাড় নাড়িয়ে সে বলে যে কাঁদছে না। উমদেন্নাসা তাকে চিনে ফেলে মুহূর্তে। বলে— কাঁদিস না কুলসুম। আমি মজা করছিলাম।

ঠিক সেই সময়ে শাহাজাদার প্রবেশ। বেগম একটু বিস্মিত হয়। এই সময়ে হারেমে সাধারণত আসে না সে। কুলসুম ছুটে কক্ষ থেকে পালিয়ে যায়।

শাহজাদা বলে— তোমার এই বাঁদীটাকে আমার পছন্দ হয় না।

— সেই জন্যেই তো রেখেছি। পছন্দ হলে রক্ষা ছিল?

— কী যা তা বলছ?

— কেন, মিথ্যা বলছি?

— হাজারবার।

— মলিকা আল-জুমানি নামে একজন বেগম রয়েছেন হারেমে। সে কথা জান ?

— তুমি মায়ের কথা বলছ?

— হাজারবার। তাঁর একজন বাঁদী আছে, জান?

শাহজাদার মুখের ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পায়। কোনরকমে বলে— সবারই বাঁদী থাকে। এতে নতুনত্বের কি আছে?

— তাঁর বাঁদীর মধ্যে নিশ্চয় নতুনত্ব কিছু আছে। বোধহয় শাহাজাদাকে পাগল করার মত কিছু। আমি অবশ্য বুঝতে পারি না। খুবই গ্রাম্য সে। তবে আমি শত হলেও তো পুরুষ নই।

— কী সব বলছ?

— যাকগে। ওসব কথা তোমাকে বলতে আমার ঘৃণা হয়। তুমি তো ভবিষ্যতের শাহানশাহ। যুদ্ধ সম্বন্ধে ভাবনাচিন্তা করেছ কিছু?

— সেই কথা বলতেই তো এসেছি। তুমি এমন সব শুরু করলে—

— বেশ বল।

— বাদশাহের হারেম তো যাচ্ছে। আমার হারেমও সেই সঙ্গে যাবে নিশ্চয়।

— এটা কি যুদ্ধ সম্বন্ধে ভাবনাচিন্তা?

— নিশ্চয়। অত বড় রণক্ষেত্রে হারেমের জন্য নিরাপদ স্থান খুঁজে নিতে হবে না?

— আমিররা কে কোথায় থাকবেন সৈনা নিয়ে, ঠিক হয়ে গিয়েছে?

— ওসব দেখার জন্য খান দউরান আছেন। তাঁকে পরামর্শ দেওয়ার লোকের অভাব নেই।

— তুমি কোন দিকে থাকবে?

— রণক্ষেত্রের মানচিত্র দেখেছ নাকি? কথা শুনে মনে হচ্ছে সব জেনে বসে আছ।

শাহজাদাকে উত্তপ্ত দেখেও ভ্রূক্ষেপ করে না উমদেন্নেসা। সে বলে— কিছুই জানি না। কিন্তু তোমার যদি স্পষ্ট ধারণা থাকত আমাকে বুঝিয়ে বলে দিতে পারতে।

— তোমাকে? বললে বুঝতে?

— বোধহয় বুঝতাম। যাহোক, এটুকু বুঝেছি যে তুমি কোন খোঁজখবরই রাখ না। শুধু হারেমের জন্য তুমি পাগল হয়ে উঠেছ। বাদশাহজাদার হারেম না থাকলে চলে? তুমি নিশ্চিন্ত থাক। বেছে বেছে কিছু সংগ্রহ করে নাও। কিন্তু আমি না গেলে তো নানা প্রশ্ন উঠবে। তোমাকে বিপদে ফেলব না। আমিও যাব। নিজে অসুস্থ বলে নাও যেতে পারতাম। কিন্তু যাব।

শাহাজাদা খুবই পুলকিত হয়। সে দেখে তার বেগম কেমন আনমনা হয়ে পড়ে। সে জানে না তার বেগমের চোখের সামনে একটি তরুণের মুখ ভেসে উঠেছে। ভাবছে, হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে ওই তরুণের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে না? হয়ত হারেম রক্ষায় ভার তার ওপরই পড়েছে। মুখতার তাকে দেখতে পাবে না। কিন্তু সে তো তাকে দেখবে। কত আর বদলাবে সে? তেমন যদি হয় ঠিক চিনে নিতে পারবে। ওই গভীর দৃষ্টি কি ভুলবার?

— কি ভাবছ?

— কিছু না। সব তো ঠিক হয়ে গেল।

— তুমি অমন কর কেন? আমি তো তোমার সঙ্গে কোনরকম দুর্ব্যবহার করি না !

শাহজাদা অবশ্যই সত্য কথা বলছে। দুর্ব্যবহার করার মত মনের শক্তিও বোধহয় তার নেই। কষ্ট দিয়েও সত্যি যদি ভালবাসত তাহলে মুখতারকে অত ঘন ঘন মনে পড়ত না। শাহাজাদার স্পর্শ তো কতভাবে পেয়েছে সে, মনে দাগ কাটেনি। অথচ মুখতারের সেই চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যার স্পর্শ দেহকে অতিক্রম করে মনের মধ্যে গিয়ে বাসা বেঁধে রয়েছে।

কুলসুম অলিন্দ থেকে দেখতে পায় শাহজাদা বেগমের কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল। সে ভেতরে গিয়ে দেখে উমদেন্নেসা গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছে। দুঃখ হয় তার। তাদের মত সাধারণ মানুষের জীবন তো অন্যরকম। তবে অনেক দিন থেকে এসব দেখে দেখে সে অভ্যস্ত।

— শরবত আনি বেগম সাহেবা?

— আন।

একটি সুন্দর স্থান নির্বাচন করে শিবির স্থাপন করা হল কারনালে। মোটামুটি বেশ সুরক্ষিত প্রাকৃতিক দিক থেকে। উত্তর দিকে ঘন অরণ্য আর পূর্ব দিকে আলি মর্দান খাল। খালটি বেশ প্রশস্ত এবং জলপূর্ণ। জলের অভাব বোধ করবে না কেউ, এটা মস্ত লাভ। উত্তরের বনাঞ্চল ভেদ করে সসৈন্যে আসার চেষ্টা করবেন না অন্তত নাদির শাহ। তবু মাটির প্রাচীর গড়ে তোলা হল শিবির শ্রেণীকে ঘিরে। আর সেই প্রাচীরের স্থানে স্থানে প্রায় সম দূরত্বে কামান স্থাপন করা হল।

শাহানশাহ প্রাচীরবেষ্টিত শিবিরে এসে উপস্থিত হলেন মধ্যাহ্নের পূর্বে। আমির ওমরাহেরা তাঁর শিবিরের সামনে প্রস্তুত তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য। সবাই আশা করেছিল তিনি স্থানটি পরিদর্শন করবেন এবং কোনরকম পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে সেকথা বলবেন। সময় আর বেশি নেই। কারণ নাদির শাহ কুঞ্জপুরা এবং খিরাজপুর থেকে কিছুটা উত্তরে তাঁর সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। তিনি যে কতটা সতর্ক তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল একদল অগ্রগামী সৈন্যকে কুঞ্জপুরার দিকে পাঠানোর পর থেকে তাদের কোন খবর না পাওয়া দেখে। তাদের নিশ্চয় খতম করা হয়েছে কিংবা বন্দী করে তাদের কাছ থেকে শত্রু শিবিরের গোপন সংবাদ বেব করা হচ্ছে। তাই ওমরাহেরা প্রত্যাশা করেছিল শাহানশাহ কারনালে পৌছেই সক্রিয় হয়ে উঠবেন। তিনি নিজস্ব শিবিরে প্রবেশ করে খবর পাঠালেন, পথশ্রমে তিনি ক্লান্ত। মধ্যাহ্নের আহারের পর একটু বিশ্রাম করে অপরাহ্নে শিবির শ্রেণী এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পরিদর্শনে বের হবেন। ওমরাহেরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করে।

শাহজাদা সুলতান আহমেদ ভাবে হারেম বিষয়ে পিতা কোন উচ্চবাচ্য করলেন না কেন? বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে খবর পেয়েছে নাদির শাহ তাঁর হারেম রেখেছেন অম্বালায়। অনেকটা দূর। অত দূরে রাখার অর্থ খুঁজে পায় না শাহজাদা। হারেম থাকবে এমন স্থানে যেখানে দিনান্তে যাওয়া যায়। অবশ্য নাদির শাহের হারেম নাকি একটি বাহিনীর মত প্রকাণ্ড।

বাহাদুর বটে।

হারেমের চিন্তা মাথায় ওঠে একটি সংবাদে। শাহানশাহ্ তখনো বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছেন, খবর এল একদল মোগল সৈন্যের সঙ্গে নাদিব শাহের কুর্দিশ বাহিনীর সংঘর্ষ হয়েছে এবং বহু মোগল নিহত এবং আহত হয়েছে। সেই সঙ্গে কুর্দিশ অশ্বারোহীরা অনেক মোগল সেনাকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছে।

কে এই দুঃসংবাদ পৌঁছে দেবে শাহানশাহের কানে? তিনি এখনো ছাউনি পরিদর্শন করলেন না, তার আগেই এই দুর্ঘটনা? আজিম আল্লা খাঁ বলে— আমি যাচ্ছি। শাহানশাহ এখন একা আর এটা যুদ্ধক্ষেত্র। এখানে প্রতি পদে ইতস্তত করলে আমাদের ডুবতে হবে। কারনাল আর দিল্লীর মধ্যে আশমান জমিন ফারাক। সেখানকাব আদব-কায়দা এখানে চলে না।

উজির আজিম আল্লা খাঁ প্রহরীর পাশ দিয়ে সোজা গিয়ে প্রবেশ করে। প্রহরী উজিরকে চেনে। তাই হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সে ভালভাবে জানে যত উঁচুদরের ব্যক্তি হোক না কেন এভাবে শাহানশাহের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না কেউ। তবু উজিরকে দেখে সে বাধা দিতে পারল না। এক নিমেষে সব কিছু হয়ে গেল। সে কাঁপতে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ যাওয়া গৌববের। কিন্তু নির্বুদ্ধিতার জন্য মৃতুদণ্ড সম্পূর্ণ অগৌরবের। তাতে পরিবারেরও বদনাম হয়।

আজিম আল্লা দেখে শাহনশাহের চক্ষু মুদ্রিত। মাথার নীচে তাঁর বাহুদ্বয়। পদদ্বয় তালে তালে নড়ছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না তিনি আদৌ নিদ্রিত নন। আয়েশ করছেন। অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হয় উজির। যুদ্ধ আসন্ন। নাদির শাহ ইতিমধ্যেই সক্রিয়। উচ্চস্থানে উঠলে তাঁর সৈন্যসমাবেশ খালি চোখে দেখা যাওয়ার কথা। অথচ বাদশাহ নিশ্চিন্ত। এতটুকুও চাঞ্চল্য নেই। একি তাঁর বংশের মহিমা? অনেক যুদ্ধ জয়ের, অনেক উত্তেজনার অভিজ্ঞতা তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত বলেই কি এমন নিস্পৃহ তিনি। একটি পায়ের বিচলন দেখে মনে হচ্ছে দরবারী কানাড়ার তাল ঠুকছেন। নাকি দূরদৃষ্টিহীন অনুভূতিহীন মনুষ্যরূপী মানবেতর কোন প্রাণী? কিংবা হতাশাগ্রস্ত হয়ে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া মোগল বংশের এক কুলাঙ্গার?

— মেহেরবান?

শাহানশাহের দিবাস্বপ্ন টুটে যায়। তিনি চমকে উঠে সামনে উজিরকে দণ্ডায়মান দেখে বলে ওঠেন— এ কি আপনি!

— আসতে বাধ্য হয়েছি!

উজির আজিম আল্লা খাঁ লক্ষ্য করে শাহানশাহের মুখমণ্ডল আরক্তিম। তাঁর জীবনে এমন বোধহয় প্রথম ঘটনা। সেটাই স্বাভাবিক। এই ধরনের কাজের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু।

— বাধা দেয়নি কেউ?

— বলতে গেলে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছি। তবে তার কিছুমাত্র দোষ নেই। সে আমাকে

চেনে। আমিও তাকে চিনি। আপনার মহলেরই প্রহরী। দিল্লী থেকে নিয়ে আসা হয়েছে।

— খুব জরুরী?

— অবশ্যই খোদাবন্দ।

— বলুন।

উজির তখন কুর্দিশ অশ্বারোহীদের সঙ্গে মোগল বাহিনীর সংঘর্ষের উল্লেখ করে। বেশ কিছু সিপাহী হতাহত এবং বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার কথাও বলে।

শাহানশাহের চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। আয়েশকে গায়ের চাদরের মত ছুড়ে ফেলে দিয়ে তিনি আসন ছেড়ে সোজা হয় দাঁড়ান।

— চলুন। এখনি দেখে নিতে হবে সব।

উজির হৃষ্টচিত্তে শাহানশাহের সঙ্গে সেই প্রহরীব পাশ দিয়ে বাইরে আগে। অন্যান্য ওমরাহেরা দূর থেকে দেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে।

শিবিরের সামনে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে বাদশাহ প্রথমেই খান দউরানের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন— কি করে এমন হল?

— একদল অশ্বারোহীকে পাঠিয়েছিলাম শত্রু সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ কবতে।

—নাদির শাহের সিপাহীদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধল কেন?

— আমাদের মত তিনিও একদল কুর্দিশ অশ্বারোহীকে পাঠিয়েছিলেন।

— সেটা কি অপ্রত্যাশিত?

খান দউরান একটু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলে— না।

— তবে? আমরা কি ওদের ছাউনির কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম?

নিজামুল মুল্‌ক বলে ওঠে — না হুজুর। ওরাই বরং আমাদের ছাউনির কাছে চলে এসেছিল।

— অর্থাৎ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি এবং অনেক আগাম চিন্তা করে তারা।

অযোধ্যার অধিপতি সাদাত খাঁ খান দউরানকে আরও বেশি অপদস্থ করতে নিজামকে মদত দিয়ে বলে— অবশ্যই। নইলে এত কাছে এসে আমাদের লোকদের ধরে নিয়ে গেল পেটের কথা বের করে নিতে?

সাদাত খাঁ এবং নিজামুল মুলক পরস্পরের দোস্ত কখনই নয়। তাদের উভয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতার কথা সবার জানা। তবু তারা কিছু অশুভ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝে বেশ ভাবসাব কবে নেয়।

উজির কামরুদ্দিন বলে— এখনো রেষারেষি আর তর্কাতর্কি থামল না আপনাদের? আমরা যদি কোন দুরবস্থার মধ্যে পড়ি তাহলে তার কারণ একটাই। একতার নামগন্ধ নেই আমাদের মধ্যে।

দরবার কক্ষে বসে তক্তৃতাউসের ওপর শাহানশাহকে দেখতে অন্যরকম লাগে। একটা দূরত্ব, একটা উচ্চতা থেকে যায়। সেখানে কথা বলতে কামরুদ্দিনের বাধো বাধো ঠেকে। কিন্তু

শাহানশাহকে তাদের মত ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিজেকে অনেক সহজ বলে মনে হয় তার। উচ্চতাও এমন কিছু বেশি নয়। খান দউরানের চেয়ে সামান্য কমই।

শাহানশাহ কামরুদ্দিনের দিকে অন্য দৃষ্টিতে তাকান। এত ঝাঁঝালো কথা বলা তার স্বভাবের মধ্যে নেই। তিনি বলেন— উজির ঠিক বলেছেন। আমাদের লক্ষ্য এখন একটাই, নাদির শাহকে বিতাড়িত করা। উনি খুব সুন্দর পত্র লিখেছেন বরাবর। আমি অবিশ্বাস করিনি। কিন্তু এখানে আসার পরে আমি জানতে পেরেছি কাবুল থেকে আসার পথে তিনি নগর গ্রাম ধ্বংস করেছেন, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে নির্বিচারে হত্যা করেছেন। ওঁর বাহিনী অবাধে লুঠতরাজ চালিয়েছে। আপনারাও শুনেছেন নিশ্চয়।

সবাই ঘাড় হেলিয়ে সায় দেয়।

— আপনারা কি মনে করেন? সত্যিই এমন হয়েছে?

উজির আজিম আল্লা বলে— আমি একজন ভুক্তভোগীর দেখা পেয়েছিলাম। তার স্ত্রী আর তরুণ পুত্র নাদির শাহের সৈন্যদ্বারা নিহত হয়েছে।

— কি করে?

— ওরা রাতের অন্ধকারে মশাল হাতে ধ্বংসলীলা চালাচ্ছিল। চালাতে চালাতে এদের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ল। চিৎকার শুনে পুত্র এবং তার মা সামনে এসে দাঁড়াতেই ওরা তাদের দুজনাকে হত্যা করে। দুটি ঘরের ক্ষুদ্র কুটির। দ্বিতীয় পুত্রটি শিশু। সে চিৎকার চেঁচামেচি শুনে কেঁদে ওঠে। তার কান্না যাতে কেউ শুনতে না পায় সেজন্য তাকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে চলে আসে তার পিতা। একটি পুত্র অন্তত বাঁচুক। কারণ সে বুঝতে পেরেছিল তার স্ত্রী এবং জ্যেষ্ঠপুত্র নিহত হয়েছে। পরদিন সিপাহীরা চলে যায়। তখন সারা শহরে হাহাকার ওঠে। তারা বুক চাপড়াতে চাপড়াতে তাদের প্রিয়জনের মৃতদেহ সংগ্রহ করে কবর দেয়।

শাহানশাহের মুখ গম্ভীর হয়। তিনি সবাইকে নিয়ে ছাউনির বিভিন্ন দিক পরিদর্শন করেন। আলি মর্দন খাল দেখেন। জঙ্গলের অবস্থিতি জেনে নেন।

সবাই সাধারণ ভাবে কথা বলছিল, শুধু সাদাত খাঁকে একটু চিন্তান্বিত মনে হল। শাহানশাহ চিন্তার কারণ জানতে চান।

সাদাত খাঁ বলে— আমি এখানে এসে পৌঁছলেও আমার বাহিনী এখনো এসে পৌঁছায়নি। আপনি চলে এসেছেন শুনে আমি একাই চলে এলাম আগে। ওরা না আসা অবধি স্থির থাকতে পারছি না। নাদির শাহের সৈন্যদল এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে। সামনা সামনি এলে কেউ কাউকে ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না। আমার মালপত্রও ওদের সঙ্গে রয়েছে।

পরদিন সকালে আবার আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত নিয়ে সেদিন সবাই নিজের নিজের শিবিরে চলে গেল। সাদাত খাঁয়ের নিজস্ব শিবির ছিল না বলে নিজামুল মুলক তাকে আমন্ত্রণ জানায়। একটু দ্বিধার পরে সাদাত আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। সেখানে নৈশভোজের সময় সে খাদ্য সামগ্রীর দিকে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে বারবার চেয়ে দেখেছে, দু একবার নিজামের মুখের দিকেও

চেয়েছে। কিন্তু সেই মুখে আসন্ন কোন শত্রু নিধনের ঔৎসুক্য দেখতে পায় নি। এই ছাউনিতেও সুন্দব রুচিকর খাদ্য প্রস্তুত করা হয়েছে। খাদ্যের সুঘ্রাণে দ্বিগুণ ক্ষুধার উদ্রেক হল। নিজামুলকে প্রশ্ন না করে পারে না সাদাত— এত সুন্দর খাদ্যের ব্যবস্থা কি করে করলেন?

-- আমার বাবুর্চি তুরস্ক থেকে এনেছি। বহুদিন ধরে রয়েছে। আমার কর্মচারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেতন পায়।

-- আপনি রীতিমত খাদ্যরসিক দেখছি। আপনার এই পরিচয় আমার জানা ছিল না।

-- কি করে জানবেন? নিজের গণ্ডি ছাড়িয়ে এক পা-ও এদিক-ওদিক না গেলে অনেক কিছু অজানা থেকে যায়। এই যে দরবারে আমি অনেককে অপদস্থ করি বলে বদনাম আছে। অমন রসিয়ে রসিয়ে অপদস্থ করতে হলেও উদরে উচ্চমানের খাদ্যের অস্তিত্ব থাকা জরুরী।

আপনাকে যে দক্ষিণ ভারতের বাঁদর বলে পরিহাস করা হয়েছিল তাতে কিন্তু আমার তেমন দোষ ছিল না।

নিজামুল মুলক-এর মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। কিন্তু মুহূর্তে সেই গাম্ভীর্য কাটিয়ে উঠে সে সশব্দে হেসে উঠে বলে— ওসব আমার গা সওয়া। ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়ার পাত্র আমি নই। এই যুদ্ধের পরে যদি আপনি আর আমি টিকে থাকি তাহলেই টের পাবেন।

এই খানা যদি দিল্লীতে পেত তাহলেও আকণ্ঠ খেয়ে নিত সাদাত খাঁ। বিশেষ এক ধরনের মশলা ব্যবহৃত হয়েছে এই খাদ্য প্রণালীতে। ফলে সম্পূর্ণ অন্যধরনের স্বাদ হয়েছে। দিল্লী গিয়ে লোকটাকে বড় টোপ ফেলে গেঁথে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। কিছুটা কম খেতে হল আজ কারণ ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। শাহানশাহের ছাউনিতে সক্রিয়তা লক্ষ্য করা না গেলেও নাদির শাহ কি মতলব আঁটছে বোঝা যাচ্ছে না। খান দউরান নাদির শাহকে অপ্রস্তুত করে দিয়ে আগে থেকে আক্রমণ করার পক্ষপাতী নয়। শাহানশাহ তাকে আবার সম্পূর্ণ সমর্থন করেন এই বিষয়ে। শত্রুর আক্রমণের জন্য প্রতীক্ষা করা সাদাত খাঁয়ের মতে মূর্খতা। তাতে শত্রু সুবিধা পায় বেশি। শত্রু সংখ্যা যতই হোক না কেন দিল্লীর বাদশাহের বাহিনীর চেয়ে কখনই বেশি হবে না। তাছাড়া দিল্লীর বাহিনীতে অসংখ্য হস্তী রয়েছে। রাতের অন্ধকারে সমস্ত হস্তীকে একত্রিত করে নাদির শাহের ছাউনির দিকে চালনা করলে তিনি পালিয়ে যাওয়ার পথ পাবেন না। কিন্তু এসব কথা সে বলতে যাবে কেন? সে তো চেয়েছিল নাদির শাহ আসুক। যুদ্ধক্ষেত্রে এলে যুদ্ধ করতেই হয়, তাই তাকেও যুদ্ধ করতে হবে। আর যুদ্ধের মধ্যে ফাঁকি থাকার অর্থ আত্মহনন। সুতরাং নাদির শাহকে মনে মনে সমর্থন করেও রীতিমত যুদ্ধ তাকে করতে হবে। তবে নাদির শাহ নিশ্চয় তার নাম শুনেছেন। যদি তার পরিচয় পেয়ে যান কোনরকমে তাহলে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। নিজামুল মুলক্ ও এ বিষয়ে একই পথের যাত্রী। তবু আজ এত সময় পাওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে মুখ খুলছে না। সে-ও নিশ্চয় বুঝতে পারছে হিন্দুস্থানী সৈন্য দিয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকা চলে না। সেন্যদের মধ্যে প্রশ্ন উঠবে। সেই প্রশ্ন বিরাট আকার ধারণ করে বিদ্রোহের রূপ নিতে পারে। তাতে সে নিজেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

-- আপনাকে আমি কিন্তু অযোধ্যার হনুমান বলব না কখনই। আমি নিজে যেমন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, অন্যের মর্যাদাকেও সম্মান দিতে জানি।

সাদাত খাঁ এত অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল যে নিজামের কথায় প্রথমে চমকে উঠেছিল। পরে একটু হেসে বলে-- বেঁচে থাকলে দিল্লীতে আপনার গৃহে একবার খানা খাওয়ার ইচ্ছা রইল।

-- অবশ্যই। কিন্তু কার বেঁচে থাকার সম্বন্ধে সংশয় আপনার?

-- দুজনার একজন চলে গেলেই খানা খাওয়ার প্রশ্ন আর থাকছে না।

-- তা বটে।

নিজামের সঙ্গে আলাপ করতে ভালই লাগে সাদাত খাঁয়ের। এত ঘনিষ্ঠভাবে তো কখনো কথা হয়নি। দরবার কক্ষ হল মল্লভূমি-- কে কোন প্যাঁচে কাকে কাৎ করবে। সবার উদ্দেশ্য শাহানশাহের সামনে বাহাদুরী দেখানো আর নিজেকে আরও পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। সেখানে খোলা মনে কেউ কথা বলে না। সেখানকার মুখের কথা মনের কথা নয়। কিন্তু শিবিরের পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিজেকে গোপন রাখতে চাইলেও অনেক অসতর্ক মুহূর্তে অনেক কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ে। নিজাম মানুষটা বেশ বুদ্ধিমান। পড়াশোনাও রয়েছে বলে মনে হল। কথায় কথায় ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ আওড়ায়। সুরসিক।

অনেক রাতে শুতে গেলেও নিদ্রা গাঢ় হয়েছিল। কিন্তু অতি প্রত্যুষে সাদাত খাঁয়ের ঘুম ভাঙিয়ে দেয় নিজাম নিজে এসে।

-- আপনি। এত ভোরে?

-- আপনি তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিন। শাহানশাহ তলব পাঠিয়েছেন।

-- আমাকে?

-- হ্যাঁ।

সাদাত খাঁ প্রস্তুত হয়ে বাইরে এসে প্রশ্ন করে-- কি হয়েছে?

-- চলুন যেতে যেতে বলছি।

আসলে কুর্দিশ অশ্বারোহীরা আগেই হামলা শুরু করেছিল। কিন্তু গত রাত্রে নাদির শাহের তরফ থেকে প্রথম প্রকৃত আক্রমণ শুরু হয়েছে। সাদাত খাঁয়ের বাহিনী অযোধ্যা থেকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে গত রাতে যমুনা অতিক্রম করে একটি স্থানে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। যতসব রসদ, দ্রব্য সামগ্রী সবই সঙ্গে ছিল। নাদির শাহের বাহিনী আগে থেকে খবর রেখেছিল। বিশ্রামরত সেনাদলকে তারা তীব্র আক্রমণ করে; অযোধ্যা বাহিনীর মধ্যে অকস্মাৎ এই আক্রমণে ত্রাসের সঞ্চার হয়। তারা এদিকে-ওদিকে ছোটাছুটি করে যতক্ষণে একত্রিত হয় ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। নাদির শাহের সিপাহীরা বেশ কিছু সিপাহীকে খুন জখম করে। তারা সমস্ত মালপত্র লুঠ করে কিছু সিপাহীকে বন্দী করে নাদির শাহের ছাউনির দিকে নিয়ে যায়।

শাহানশাহের নিকট যখন গিয়ে হাজির হয় সাদাত খাঁ তার আগেই সব শু‹ ফেলেছে।

রাগে ফুঁসছিল সে। শাহানশাহ তাকে প্রশ্ন করেন-- এমন হল কেন?

— বলতে পারছি না। তবে আমাদের নজরদারী বাহিনীর কোন অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না। খান দউরান এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি। নজরদারীর অভাবে এমন অনেক ক্ষয়-ক্ষতির জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এমন কি পরাজয়ের সম্ভাবনার কথাও মনে রাখতে হবে।

শাহানশাহের সামনে ক্রোধে কাঁপছিল সাদাত খাঁ। যে নাদির শাহের পথ নিষ্কণ্টক করার জন্য সে একদিন সক্রিয়তা দেখিয়েছিল, সেই ব্যক্তিই আক্রমণ করল তারই বাহিনীকে? ছাড়বে না সে। অপমানের জ্বালা তার সর্বাঙ্গে।

— আপনি এখন কি করতে চান?

— আমি প্রতিশোধ নেব। এখনি যাচ্ছি। ওদের পিছু ধাওয়া করব। মালপত্র নিয়ে দ্রুত তারা যেতে পারবে না।

-- কিন্তু সৈন্য পাবেন কোথায়?

— পাঁচ হাজার সৈন্যের একটি দল আমি আলাদা করে আগেই সরিয়ে রেখেছিলাম। তাই নিয়ে এখন যাচ্ছি।

— সাহায্যের দরকার আছে?

সাদাত খাঁ শাহানশাহকে কুর্নিশ করে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে-- বলতে পারছি না।

দরবার কক্ষ আর যুদ্ধক্ষেত্র এক নয়। এখানে আদব-কায়দার স্থান গৌণ। মুখ্য হল সক্রিয়তা। মুখ্য হল সাহস, শক্তি আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। তাই শাহানশাহকে কোনরকমে কুর্নিশ করে সাদাত খাঁ যখন ছুটে চলল তখন শাহানশাহ বা নিজামুল মুলক কেউই অবাক হয়নি।

কিন্তু সাদাত খাঁ তার পাঁচ হাজারী সৈন্যদলের কাছে এসে যখন বলল, এখনি শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে, তখন তারা রাজি হল না। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসে আক্রান্ত সৈন্যদলের মত তারাও ক্লান্ত। তাদের অনেকের পায়ে বড় বড় ফোস্কা পড়েছে। অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সাদাত খাঁ বুঝল কারনাল আর অযোধ্যার মধ্যে অনেক প্রভেদ। সেখানে দাপট দেখানো যেত, এখানে সেটা সম্ভব না। তাই সে কোমল স্বরে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করে। তাতেও খুব বেশি ফল পাওয়া গেল না। তখন তাদের আত্মমর্যাদায় যাতে ঘা পড়ে সেইভাবে বলে-- ওরা যেভাবে অপদস্থ হয়েছে, সবাই গোপনে হাসছে! যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে পথেঘাটে তোমাদের বিদ্রূপ করবে সবাই। কেউ বুঝবে না যে তোমরা অন্যত্র ছিলে। অযোধ্যায় বাহিনী একটাই। বাইরের কেউ নানা বিভাগের কথা জানে না। জানতেও চায় না। যুদ্ধের পরেও ব্যঙ্গের হাসি হেসে আঙুল তুলে দেখাবে তোমাদের।

সৈন্যরা উত্তেজিত হয়, অনুপ্রেরিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত সম্মত হয়। এই রকম একটা কিছু ঘটবে নাদির শাহ অনুভব করতে পেরেছিলেন। এতবড় একটা দলকে পর্যুদস্ত করে মালপত্র নিয়ে আসা হয়েছে অথচ বাদশাহী সেনা চুপ করে বসে থাকবে— এমন কখনো হতে পারে না।

তাই নাদির শাহ একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি ফাঁকা জায়গায় অল্পসংখ্যক সৈন্য রেখে তাদের সঙ্গে কিছু মালপত্র রেখে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল সাদাত খাঁকে ওদের দিকে ধাবিত হতে প্রলোভিত করা। ওরা তাড়া খেয়ে আরও ছুটতে ছুটতে দূরে চলে যাবে। সেই সময় গোপন স্থান থেকে বহুসংখ্যক সৈন্য এসে ঘিরে ফেলবে। তখন যুদ্ধ হবে। তবে চারদিক থেকে পরিবেষ্টিত হয়ে খুব একটা কিছু করতে পারবে না বলে মনে হয়।

ক্রুদ্ধ সাদাত খাঁ শত্রু সৈন্যদের দেখতে পায়। আর দেখতে পায় লুণ্ঠিত দ্রব্যের কিছু অংশ। সে তলোয়ার উঁচিয়ে সৈন্যদের আদেশ করে ধাওয়া করতে। তারাও বীভৎস চিৎকার করে ছোটে। সাদাত খাঁ বুঝতে পারে নাদির শাহ্ তাকে ফাঁদে ফেলতে পারে। তবু নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না সে। তাই একজন অশ্বারোহীকে পাঠায় শাহানশাহের শিবিরে, যাতে আরও অনেক সৈন্য এসে তাকে পেছন দিক থেকে সাহায্য করে।

সংবাদ পেয়ে বাদশাহ অস্থির হয়ে ওঠেন। তিনি বুঝতে পারেন সাদাত খাঁয়ের পক্ষে জয়ী হয়ে ফিরে আসা খুব মুশকিল। নিজেই যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে চান। খান দউরান আর নিজামুল মুলক তাঁকে নিবৃত্ত করে। বলে, আজকের দিনে এইভাবে যুদ্ধ শুরু করা তাঁর পক্ষে উচিত হবে না।

বাদশাহ ওদের দুজনার দিকে চেয়ে একটু উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন-- তবে কি করতে চান আপনারা? সাদাত খাঁয়ের মৃত্যু? প্রথম দিনেই পরাজয়?

নিজাম একটু দ্বিধাভরে বলে-- না, তা কেন? খান দউরানের সৈন্যদল আপনার ডান দিকে রয়েছে। ওঁর পক্ষে যাওয়া সুবিধে হবে।

বাদশাহ বলেন-- তবে তাই হোক। যা করবেন তাড়াতাড়ি করুন। বিপদে না পড়লে সাদাত খাঁ সাহায্যের জন্য বলতেন না।

খান দউরান বাদশাহের আদেশ মত নয় হাজার অশ্বারোহী এবং বহু সংখ্যক হস্তী নিয়ে রওনা হলেন। এই বাহিনী জীবনে কখনো বড় যুদ্ধ করেনি। বড় যুদ্ধ কয়জন আর করে? কিন্তু সেই সম্বন্ধে একটা ধারণার সৃষ্টি করা হয় শিক্ষাদানের সময়ে। তাতে প্রকৃত যুদ্ধের সময় নিজেদের দ্রুত ধাতস্থ করে নেওয়া যায়। এদের সেইভাবে শিক্ষিত করে তোলা হয়নি কখনো। তাই এরা নাদির শাহের মত জবরদস্ত সেনানায়কের বিরুদ্ধে যখন যাত্রা করল তখন ভেবেছিল, এই যুদ্ধ অনেকটা দিল্লীর রাজপথে কিংবা বাজারের মধ্যে যে ধরনের গণ্ডগোল হয় সেই রকমের হবে। কিন্তু তাদের ভুল ভাঙতে খুব বেশি বিলম্ব হয়নি।

ফাঁদে পড়েও সাদাত খাঁ অসীম সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। অযোধ্যা থেকে রওনা হওয়ার আগেই সে এক দুর্ঘটনায় আহত ছিল। তাই কারনালে সে এসেছে হস্তীপৃষ্ঠে চেপে। অশ্বচালনা করা তার পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য। তবু উত্তেজনার বশে শাহানশাহের নিকট থেকে বিদায় নেওয়ার সময় আঘাতের কথা বিস্মৃত হয়েছিল। তাই একটি সুন্দর অশ্বের ওপর বসতেই পুরোনো ক্ষতের ব্যথা অনুভব করে। কিন্তু তখন দণ্ডমাত্র অপেক্ষা করার উপায় ছিল না। অশ্বারোহণ করে চলে এসেছে। কিন্তু এখানে নাদির শাহের সৈন্যদের ধাওয়া করতে গিয়ে সে অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায়। সে বুঝতে পারে খুব বেশিক্ষণ এভাবে চলতে পারবে না। তৎক্ষণে

নাদির শাহের কৌশল তার কাছে দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শাহানশাহের নিকট বার্তাবাহক পাঠিয়ে আরও কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে সে জানে না। তবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করার সামর্থ্য তার নেই।

ঠিক সেই সময় পেছনে ফিরে দেখে পর্বতের সারি যেন এগিয়ে আসছে। এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও তার মুখে হাসি ফোটে। হস্তীযূথ আসছে তার সাহায্যে। শাহানশাহের অসীম কৃপা। যুদ্ধে পরাজয়ের দুশ্চিন্তাকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল তার দৈহিক যন্ত্রণা। এবারে একটি হস্তীর হাওদায় বসে নিষ্কৃতি পাবে। সেখান থেকে যুদ্ধ করা অনেক সহজ হবে। নাদির শাহও বুঝতে পারবেন, হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া সহজ নয়। নিজে নাদির শাহের দেশের মানুষ বলে, কতকগুলো কারণে শাহানশাহের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সে নাদির শাহকে আহ্বান করেছিল। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে হস্তীযূথ দেখে তার চিত্তের আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে। শাহানশাহের প্রতি অদ্ভুত অনুকম্পায় তার মন ভরে ওঠে, হিন্দুস্থানের প্রতি প্রবল মমত্ববোধ তাকে বিচলিত করে। হয়ত বড় বেশি দেরি হয়ে গিয়েছে। সে দেখতে পায় অনেক অশ্বারোহী এবং হস্তী নিয়ে স্বয়ং খান দউরান এসেছেন তাকে উদ্ধার করতে। একটা আলাদা শক্তি ও অনুপ্রেরণা পায় সে।

কোনরকমে একটি হস্তীর ওপর উঠে বসে সে সাধারণ সিপাহীদের সাহায্যে। খান দউরান মুক্তকোষ তলোয়ার নিয়ে একবার তার কাছাকাছি আসে যুদ্ধ করতে করতে। হাত উঁচিয়ে প্রশ্ন করে সব ঠিক আছে কি না। সাদাত খাঁ-য়ের মনে হয় এবারে বোধহয় জয় সুনিশ্চিত। ঠিক সেই সময়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। এ যে বারুদে আগুন দিয়েছে ওরা! এতটা মাথায় আসেনি সাদাত খাঁয়ের। সে দেখতে পায় প্রচণ্ড আওয়াজে তার হস্তী রীতিমত ভীত। মাহুতের নির্দেশ সে মানতে চাইছে না। যদিও বা প্রথমবার সংযত করা গেল তার হস্তীকে অন্যান্য কয়েকটিকে দেখা গেল মানুষজনকে দলে পিষে চলে যাচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে। এরপর শুরু হল জামবুরাক আর জাজাইরচিস্ থেকে গুলি বর্ষণ। স্বপ্নেও ভাবেনি সাদাত খাঁ। সে দেখতে পায় চোখের সামনে অনেক অশ্ব আর অশ্বারোহী গুলিব আঘাতে ধরাশায়ী হচ্ছে। এ যে অসম লড়াই। হিন্দুস্থানের গর্ব হল তার অসিযুদ্ধ, বড়জোর ধনুক। জাজাইর-এর বিরুদ্ধে তীরবর্ষণ কোন কাজে লাগবে? দেখতে পায় কিছুটা দূরে খান দউবান আহত হয়েছে। দেখা গেল সে হাওদার ওপব শুয়ে পড়ল। মনে হল গুলির আঘাত লেগেছে দেহের অনেক স্থানে। অথচ তার দিকে হস্তী নিয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। যেভাবে নিখুঁত লক্ষ্যে মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণ হচ্ছে। তাতে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

আবার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। এবারে একসঙ্গে অনেক হস্তী সিপাহীদের পদদলিত করে বণক্ষেত্র ত্যাগ করে ছুটতে থাকে। হিন্দুস্থানী সৈন্যদল যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করেও ছত্রভঙ্গ হতে থাকে।

সাদাত খাঁয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শের জং তার পাশেই অপর একটি হস্তীপৃষ্ঠে চেপে যুদ্ধ করছিল। হস্তীটি আঘাতে আঘাতে জর্জরিত। সাদাত খাঁ বহুবার শের জংকে বলেছে হস্তীটি পালটাতে। কিন্তু পালটাবেই বা কি করে? একসময় হস্তীটি যন্ত্রণায় পাগল হয়ে যায়। আব পাগল হয়েই

সাদাত খাঁয়ের হস্তীটিকে আক্রমণ করে। সাদাত খাঁয়ের মাহুত আপ্রাণ চেষ্টা করে ক্ষিপ্ত হস্তীটি থেকে দূরে সরে যায়। হস্তীটি সাদাত খাঁকে নিয়ে ছুটতে থাকে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সাদাত খাঁ দেখতে পায় তার বাহন তাকে নিয়ে চলেছে কুঞ্জপুরাব দিকে, যেখানে নাদির শাহ্ ব্যূহ সাজিয়ে বসে রয়েছেন।

নাদির শাহ্ এমন একটি দিনের জন্য কত স্বপ্নই দেখেছেন। সেই দিন অবশেষে সমাগত। তাঁর কৌশল সম্পূর্ণ সার্থক। মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ এবং বর্ম দিয়ে দেহ আবৃত করে হাজার অশ্বারোহী নিয়ে তিনি সমস্ত রণক্ষেত্রে ছোটাছুটি করে তদারক করছিলেন। সেই সময় দেখতে পেলেন সাদাত খাঁয়ের হস্তীকে। সাদাত খাঁও দেখতে পেল এই দিবসের প্রকৃত নায়ককে। একটু পরেই সে বন্দী হল।

খান দউরান সাংঘাতিকভাবে আহত। তবু তাঁকে নাদির শাহের বন্দিত্ব স্বীকার করতে হল না, একদল অসমসাহসী সিপাহী এবং তার ব্যক্তিগত ভৃত্যের জন্য। তার প্রায় মুমূর্ষু দেহখানা তারা শত্রুদের মধ্য দিয়ে অনেক কৌশলে বের করে এনে তার নিজের শিবিরে উপস্থিত করে। সেখানে হাকিম ছুটে এল ছুটে এল হারেমের বেগম এবং খোজারা। বেগমেরা কাঁদতে শুরু করলে হাকিম শব্দ করে কাঁদতে নিষেধ করে। সে দেখে খান দউরানের হাতের দুই স্থানে এবং বুকের কাছাকাছি পাঁজরে গুলি বিঁধেছে। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। সে তার জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয়। খান দউরান খুব স্থির কণ্ঠে বলে-- শাহানশাহকে যেন কোন অবস্থাতেই নাদির শাহের শিবিরে নিয়ে না যাওয়া হয়। তাহলে হিন্দুস্থানের সর্বনাশ হয়ে যাবে। যুদ্ধে পরাস্ত হলে যেন নাদির শাহকে দিল্লীতে না নিয়ে যাওয়া হয়। যেভাবেই হোক সব কিছু চুকিয়ে দিয়ে এখান থেকে ওই লোকটাকে বিদায় করা হয় যেন।

একজন ঝুঁকে পড়ে বলে-- আপনার কষ্ট হচ্ছে?

-- কষ্টের অনুভূতি কমে আসছে। বুঝতে পারছি একটু পরে মৃত্যু হবে আমার। নিজামুল মুলক যুদ্ধক্ষেত্রেও আমার শত্রুতা করল। অতবড় বাহিনী নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। সে দেশকে ভালবাসে না। ভালবাসে শুধু নিজেকে। তবু আমার কথা নিজাম আজিম আর কামরুদ্দিনকে বলবে।

খান দউরানের মৃত্যু হল। নিজের মৃত্যুর চেয়েও যার মৃত্যু তাকে মর্মান্তিকভাবে আঘাত করত তারও মৃত্যু হল। অথচ তার সৌভাগ্য বলতে হবে যে সে জেনে যেতে পারল না। মৃত্যু হল তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের। পিতাকে সাংঘাতিক ভাবে আহত দেখে সে ছুটে আসছিল তার দিকে। সেইসময় নাদির শাহের এর বন্দুকধারী লক্ষ্যভেদ করল। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। হস্তী থেকে পতনের জন্য শেহদাদ খাঁয়ের মৃত্যু হল। আর মারা গেল একলাশ খাঁ, এদগার খাঁ এবং আরও অনেকে। বন্দির সংখ্যাও খুব বেশি।

এই চার-পাঁচ ঘণ্টার যুদ্ধে হিন্দুস্থানী বাহিনীর দুই-তৃতীয়াংশ অব্যবহৃতই রয়ে গেল, অথচ নাদির শাহ জয় ছিনিয়ে নিলেন। সবাই বুঝল একথা। শাহাজাদা সুলতান আহমেদ বিমর্ষ চিত্তে

দাঁড়িয়ে ছিল একটি নিমগাছের নীচে। শীতের সন্ধ্যা অনেক আগে নেমে এসেছে মহান মোগল বংশের লজ্জাকে ঢেকে দিতে। সুলতান আহমেদ ভাবে, সব কিছু হঠাৎ হয়ে গেল। যুদ্ধ শুরু করার কথা ছিল আগামী কাল, অথচ নাদির শাহ সেটাকে একদিন আগে এগিয়ে এনে অপ্রস্তুত মোগল বাহিনীকে পরাজিত করল। মৃত্যু হয়েছে অনেকের। কিন্তু বিশাল বাহিনীর তুলনায় কিছুই নয়। তবু পরাজয় ঘটেছে। সাদাত খাঁ শত্রু শিবিরে বন্দী, আরও অনেকে বন্দিত্ব স্বীকার করেছে। শোনা যাচ্ছে, নিজামুল মুলক নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খান দউরানের যুদ্ধ দেখছিল। কী যে হয়ে গেল। এরপর কি হবে কে জানে। নাদির শাহ নিশ্চয় বেশ কিছু চাইবে। তারপর বিদায় নেবে। যত তাড়াতাড়ি বিদায়ের পর্বটা মিটে যায় ততই মঙ্গল। আবার দিল্লীতে ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্তের জীবন শুরু করা যাবে।

কিছুটা দূরে মোগল হারেম। এখন আর অন্ধকারে চোখে পড়ছে না। আজকের দিনে কোন হারেমে কোন পুরুষ প্রবেশ করবে না। আজ দুঃখের দিন, অনুতাপের দিন। ক্ষুব্ধ উজির আজিম আল্লা বলছিল, অগৌরবের দিন। দূর দেশের এক শাহ কতখানি পথ অতিক্রম করে এসে হিন্দুস্থানের প্রতাপান্বিত বাদশাহকে পরাজিত করল। কথাটা ঠিকই বলেছে উজির। এর ফলে খেসারত কিছু দিতেই হবে। তবে তার জন্য বেশি ভেবে লাভ কি ? এত আছে, কিছুটা না হয় গেল। শান্তি তো ফিরবে।

-- শাহজাদা।

চমকে ওঠে সুলতান আহমেদ। অন্ধকার অনেকটা ঘনীভূত হয়েছে বলে প্রথমে লক্ষ্যই করেনি। ভালভাবে চেয়ে দেখতে পায় শ্মশ্রু-গুম্ফাবৃত ছোটখাটো একটি সিপাই তাকে ডাকছে।

— কে তুমি? এখানে কোথায় এসেছ?

— আপনার কাছে।

-- কে পাঠাল?

-- আমি নিজেই এসেছি।

শাহাজাদা ভাবে, স্পর্ধা তো কম নয়। একে শাস্তি দেওয়া উচিত। কার মনে কি আছে কে জানে। তার ডান হাত বাঁদিকের কোমরে তলোয়ারের হাতল স্পর্শ করে।

সিপাহী তাড়াতাড়ি দু'হাত তার নিজের দুই কানের কাছে নিয়ে গিয়ে একসঙ্গে দাড়ি আর গোঁফ আলগোছে খুলে ফেলে।

— এ কি! কে তুমি?

-- আমি ফুলজান শাহাজাদা।

-- ফুলজান?

নাদির শাহ আর হিন্দুস্থান এক নিমেষে রসাতলে চলে গেল। এ যেন না চাইতেই সরাব। অবিশ্বাস্য।

— আপনার আনন্দ হয়েছে?

তাকে কাছে টেনে নিয়ে শাহাজাদা বলে— খুব।

— আমি আগেই জানতাম।

— কেমন করে জানলে।

— মোজাহারেরও আনন্দ হত।

শাহাজাদার বন্ধন আলগা হয়ে যায়। বলে—মোজাহার কে?

— অনেক আগে একজন ছিল। তার কাছে কোন দিনও ধরা দিইনি। গায়ে গন্ধ। তবে গায়ে খুব শক্তি ছিল। আপনি চেপে ধরলেও ঢিলে ঢিলে লাগে। ও চেপে ধরলে নিশ্চয় তেমন লাগত না।

— দেখবে তবে?

— উঃ লাগছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। মোজাহারের চেয়ে আপনার জোর বেশি।

ফুলজানের কথাবার্তা অদ্ভুত অন্যরকম লাগে। তাই তার প্রতি এত আকর্ষণ শাহাজাদার। তাছাড়া তার দেহ? তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী যেন। গ্রীবা বাঁকিয়ে বলতে চায়— হারাও দেখি?

— কি করে আমার হদিস পেলে?

— ওসব আমার ব্যাপার। তবে এই দুটো দিল্লী থেকে খরিদ করে এনেছি। জানতাম কাজে লাগবে।

— আর সিপাহীর পোশাক?

— সহজেই পাওয়া যায়। আমাকে একটু শূন্যে তুলে ধরুন না।

— শূন্যে তুলে ধরা মানে?

— কিছুই যেন জানেন না। খুরশিদাকে শূন্যে তুলে পাক দেন না?

হতভম্ব হয়ে যায় শাহাজাদা। বলে— খুরশিদা? ওর কথা কোথায় শুনলে?

— আমার সব জানা। হারেমে কত বাঁদীর সঙ্গে কত বাঁদীর ভাব আছে। একজনকে না বললে অন্যজনকে বলবে। কিছুই গোপন থাকে না।

— খুরশিদা তো হারেমের নয়।

— তাতে কি? আপনি কি ভাবছেন পুরুষদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নেই?

— তা আর থাকবে না?

— নিন, দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমাকে তুলে একটু ঘোরান। আমার বড্ড সখ।

শাহাজাদা তাকে তুলে বুকের কাছে নিয়ে এসে ঘোরাতে শুরু করে।

— থাক থাক হয়েছে।

— কি হল?

— এতে আবার আনন্দ পায় নাকি কেউ? খুরশিদা মেয়ে তো? নিন, এই যে শুয়ে পড়ছি। আসুন। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

শাহাজাদা ঘাসের ওপর ফুলজানের পাশে শুয়ে পড়ে। শীতের শিশিরে ঘাস ভিজে। তবু ফুলজান তার হাত ধরে টেনে নিয়ে নিজের ওপর নিয়ে এসে ফিস্‌ফিস্ করে বলে— আমি

আপনার আম্মাকে বলিনি কিছু। কেউ জানে না। শুধু দু'তিনজন ছাড়া। জানুক তারা। তবে তারা হিংসা করে না। তাদেরও রয়েছে। আপনারই মত।

শাহাজাদা যখন ফুলজানের পাশে সিক্ত তৃণশয্যায় শুয়ে পার্থিব আনন্দে মত্ত ঠিক তখন অযোধ্যার শাসনকর্তা সাদাত খাঁ নাদির শাহের নিজস্ব শিবিরে তাঁর সম্মুখে উপবিষ্ট। সে নাদির শাহকে কয়েক ঝলক যুদ্ধক্ষেত্রে দেখেছিল লৌহনির্মিত শিরস্ত্রাণ আর বর্ম পরিহিত অবস্থায়। কিন্তু এত কাছে থেকে এভাবে দেখার সুযোগ এই প্রথম। এক কথায় তিনি সুপুরুষ। তবে মোগল পরিবারের লোকজনকে বরাবর দেখে অভ্যস্থ বলে তার মনে হয় অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও একটা কিছুর অভাব রয়েছে তাঁর চেহারায়। সেটি যে কি তার মাথায় আসে না। তবে দিল্লী শহরে প্রবেশ করলে মোগলের আভিজাত্য অনুভব করা যায়। সেটা আরও বেশি অনুভব করা যায় তাদের আচার-আচরণে, কথাবার্তায় আর চলাফেরায়। নাদির শাহের এসবের বালাই নেই। কথাবার্তাও যথেষ্ট জোরালো। যুদ্ধক্ষেত্রের পক্ষে খুবই উপযুক্ত সন্দেহ নেই। তবে সাধারণভাবে শ্রুতিনন্দন আদৌ নয়। কিন্তু আভিজাত্যের মূল্য কতটুকু ? আজ সাদাত খাঁয়ের মনে হয় আভিজাত্য মানুষের সাহস সক্রিয়তা বীর্য সব কিছুকেই খর্ব করে দেয়। তাই আজ মোগলরা পরাজিত। আর হিন্দুস্থানের মত বিশাল দেশের বুকের ওপর চেপে বসে একজন বিদেশী দাপট দেখিয়ে চলেছে।

নাদির শাহের প্রথম প্রশ্ন— শুনলাম আপনি আমাদের দেশের লোক।

-- হ্যাঁ খোদাবন্দ।

— বাঃ বাঃ, বেশ। আপনি তো নিজের লোক। আপনি আমাকে আসতেও বলেছিলেন এদেশে। চলে এলাম। আগে জানতে পারলে আপনার সঙ্গে যুদ্ধই হত না।

-- আপনার লোক আমার সব কিছু লুঠপাট করে ছিল বলে—

-- হ্যাঁ হ্যাঁ, সব জানি। যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। ওসব নিয়ে ভেবে আর লাভ নেই। এখন কি করা যায় তাই বলুন।

বিস্মিত সাদাত খাঁ বলে-- আমি কি বলব? আমি একজন সাধারণ বন্দী মাত্র।

— আপনি সাধারণ? আপনাকে ডেকে আনার একমাত্র উদ্দেশ্য আপনার সঙ্গে পরামর্শ করা।

সাদাত খাঁ কথাটা শুনেই সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে যায়। বেফাঁশ কিছু বলা চলবে না। সে অন্তত কিছু বলবে না। প্রথম দিকে নাদির শাহকে আমন্ত্রণ জানালেও, যুদ্ধক্ষেত্রে তার রূপ দেখে এবং অনেক কিছু শুনে বুঝতে পারে ভুল করে ফেলেছে। আর কোন ভুল সে করতে চায় না।

-- আমি জানি সেই যোগ্যতা আমার নেই। তবে আপনি যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।

-- একই কথা। তাতেই হবে।

-- প্রশ্ন করুন।

-- আচ্ছা বলুন তো আপনাদের এই বিপুল সৈন্যবাহিনী থাকতেও এভাবে আপনারা পরাজিত হলেন কেন?

-- আপনাদের আগ্নেয়াস্ত্র প্রচুর। আমরা অসি আর তীর ধনুকের ওপর নির্ভরশীল বেশি।

-- শুধু কি তাই?

-- না, আরও অনেক কিছু বলা যায়।

-- জানি, যদি আপনাদের শাহানশাহের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়, তাহলে তাঁকেই বলব তাঁর পরাজয়ের কারণগুলো। এবারে আসল কথায় আসা যাক। যুদ্ধ যত অল্পই হোক শাহানশাহ পরাজিত, আমি বিজয়ী। বিজয়ীদের অনেক কিছু দাবি থাকতে পারে, একথা আপনি মানেন তো? এই যে এত লোকক্ষয় হল আমাদের, তার একটা ক্ষতিপূরণ আমার প্রাপ্য।

মনে মনে বলে সাদাত খাঁ-- অত দূর থেকে যেচে এসে নিজের ক্ষতি করলে, তার দায় কার? তাছাড়া হিন্দুস্থানের কম ক্ষতি হয়নি। তার বেলায়? মুখে সে বলে-- অবশ্যই।

-- এই বিষয়ে আপনার পরামর্শ আমার প্রয়োজন।

সাদাত খাঁ মনে মনে ভাবে আর আমি এসবের মধ্যে নেই। সুযোগ যখন এসেছে নিজামুল মূলককে ফাঁসিয়ে দেওয়া যাক।

মুখে সে বলে-- পরামর্শ করার সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন নিজামুল মুলক। শাহানশাহ অবধি তাঁর পরামর্শেই চলেন। যোগ্য পরামর্শ পেতে হলে তাঁকে আহ্বান করতে হবে। শাহানশাহের শিবিরের পাশে তাঁর শিবির।

-- সেকথা আমি জানি। আপনাদের সব কিছু আমার নখদর্পণে। নইলে এমন নিশ্চিত হয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলছি। আপনাদের তরফ থেকে হঠাৎ একটা আক্রমণও তো হতে পারে। আমি জানি সেটা অসম্ভব। যুদ্ধ এত তাড়াতাড়ি মিটে গিয়েছে শুনে আপনাদের সিপাহীদের খুব আনন্দ হয়েছে। তারা ঘরে ফেরার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

সাদাত খাঁ স্তম্ভিত হয়ে যায়। সে বলে-- কতজন গুপ্তচর রেখেছেন হিন্দুস্থানী সিপাহীদের মধ্যে।

-- খুব বেশি নয়। এক হাজার। সবাই আমার লোক। আপনাদের কাউকে প্রলোভন দেখিয়ে এই কাজ করতে দিইনি। তাদের আমি বিশ্বাস করি না। আপনি এখন যেতে পারেন। আপনি আমার বন্দী নন। আপনি আহত না হলে হেঁটে চলে যেতে পারতেন শাহানশাহের কাছে। একটা অশ্ব নিতে পারেন। আপনার পরামর্শ মনের মতো হয়েছে। নিজামুল মুলককে ডেকে পাঠাচ্ছি আগামীকাল।

সাদাত খাঁ বলে-- অশ্বারোহণ আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। শুনলাম আমার সৈন্যদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তারা অবশ্য নিরস্ত্র।

-- সশস্ত্র রাখা তো নিরাপদ নয়। তাই অস্ত্রগুলো আমার হেফাজতে রয়েছে। চলে যাওয়ার

সময় সেগুলো কাজে লাগবে। নিয়ে যাব সঙ্গে করে। বাকিগুলো ফেলে রেখে যাব।

সাদাত খাঁ চলে গেলে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসে আরও। সারাদিনের এত পরিশ্রম গেল। অথচ অনুভব করেন না নাদির শাহ। যখন থেকে তাঁর মনে জীবনে প্রথম উচ্চাশার উদয় হয়েছে তখন থেকেই তিনি কল্পনা করেছেন যদি তেমন দিন আসে, ময়ূর সিংহাসনে উপবেশন করবেন তিনি। এতখানি উচ্চাশা খুবই বাড়াবাড়ি হলেও তিনি জানতেন হিন্দুস্থান খুব সম্পদশালী। সেখানে পথেঘাটে হীরামণি-মাণিক্যের ছড়াছড়ি। তিনি পরে শুনেছিলেন সেখানেও দুর্ভিক্ষ হয়। তবে চেষ্টা করলে সেই দুর্ভিক্ষকে ঠেকানো যেতে পারে। পারস্যের মত কপর্দকশূন্য অসহায় অবস্থা ওই দেশের কখনো হয় না। আজ তিনি সেই হিন্দুস্থানকে জয় করেছেন। ময়ূর সিংহাসন বলতে গেলে হাতের মুঠোর মধ্যে। কাল নিজামুল মুলক এলে আলোচনা করে ঠিক করতে হবে। সহজে রাজি না হলে গরম নরম পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। সব সাহসীকে দেখা হয়ে গিয়েছে। শারীরিক নির্যাতনের কাছে পৃথিবীর সবাই কাবু। তেমন হলে তাই করতে হবে। কার্যোদ্ধারের জন্য কোন পদ্ধতিকেই অব্যবহার্য রাখতে নেই। তবে তার আগে পর্যন্ত ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে হয়। তাতেই কাজ হয়ে যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। আগামীকাল নিজামুল মুলক এলে পুত্র মুর্তজা কুলি মির্জাকে উপস্থিত থাকতে বলতে হবে। আজকের যুদ্ধে তার অবদান কম নয়। হস্তীগুলোকে ক্ষেপিয়ে তোলার ভার ছিল তার ওপর। শুধু তাই নয়, সেগুলো যাতে জঙ্গলের দিকে চলে যায় সেই ব্যবস্থাও করেছে সে। এখন বোধহয় শাহানশাহের শিবিরে তাঁর ব্যক্তিগত কয়েকটি হস্তী ছাড়া আর কিছু নেই।

নাঃ, এমন একটি রাতকে ঠিকভাবে উপভোগ না করলে চলে না।

তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন— হাজী খাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে হাজী খাঁ সরাবের পাত্র নিয়ে অন্ধকারের ভেতর থেকে উদ্ভূত হল। সে একটি পাত্রে সরাব ঢালতে থাকে। মিষ্টি আওয়াজ ওঠে, যেন কুলকুল করে ক্ষুদ্র একটি ঝরনা বয়ে চলেছে পাথরের খাঁজের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে। সরাবেব সুঘ্রাণের চেয়েও ওই আওয়াজ আরও সুমধুর বলে মনে হতে থাকে নাদির শাহের কাছে।

— আজ তারিখ কত হাজী খাঁ?

— পনেরোই ধুল-কুয়াদা মেহেরবান।

-- ঠিক আছে, একটা মেয়ের নাম বলতো?

— কোন মেয়ে খোদাবন্দ?

— যে কোন একটা নাম। মেয়ের নাম জান না?

— জানি হুজুর। আমাদের গাঁয়ে নাজমা নামে একটা মেয়ে ছিল।

-- ঠিক আছে, হারেমের খোজাকে গিয়ে বল, নাজমা নামে মেয়েটিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে।

— মেহেরবান সেই মেয়েটি আমার গাঁয়ের। এখানে নেই।

-- নিশ্চয় আছে কেউ না কেউ। সাত হাজারের মধ্যে নাজমা নেই হতে পারে না। যাও।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল নাজমা নামে তিনজন বোরখা পরিহিতা শাহের শিবিরে প্রবেশ করছে। শাহ্ নিজেই নির্বাচন করে নেবেন তাদের মধ্যে থেকে একজন নাজমাকে।

নিজামুল মুলক-এর ডাক আসে নাদির শাহের শিবির থেকে। সঙ্গে সঙ্গে দরবার বসে শাহানশাহের তাঁবুতে। নিজাম বুঝতে পারে সাদাত খাঁয়েব কারসাজি। এত লোক থাকতে তার নাম নাদির শাহের কানে গেল কি করে? প্রতিশোধ নিতে চাইছে। সবই তো দেখেছে স্বচক্ষে; সাদাত খাঁ ভেবেছে তাকে খুব অসুবিধায় ফেলে দিয়েছে।

শাহানশাহ্ জিজ্ঞাসা করেন— কেন ডেকেছেন শাহ্?

কামরুদ্দিন বলে— এখন একটি বিষয়েই আলোচনা হতে পারে। বিজয়ীরা যেভাবে ক্ষতিপূরণ চায়, শাহ্ তাই চাইবেন।

— কত?

— মনে হয় সেটা ঠিক করতে নিজামের ডাক পড়েছে।

— সাদাত খাঁ মূর্খ নন। তিনি ঠিক করে দিতে পারতেন।

আজিম আল্লা খাঁ বলে— হয়ত পারতেন। কিন্তু সাহস পাননি। আপনার সঙ্গে একবার পরামর্শ করা প্রয়োজন ভেবেছেন। তাই নিজামুল মুলকের নাম বলে দিয়েছেন হয়ত। নিজাম এখান থেকে আলোচনা করে যেতে পারবেনা।

— হ্যাঁ, সাদাত খাঁ বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন বলে মনে হচ্ছে।

দীর্ঘ আলোচনার পর ঠিক হয়, ক্ষতিপূরণের কোন পরিমাণ সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হবে না। পরিমাণ নির্ধারণ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিজামকে দেওয়া হল। নাদির শাহের মেজাজ বুঝে কৌশলে সেটি করতে হবে। নিজামুল মুলকের ওপর সেই আস্থা সবাই রাখতে পারে। যুদ্ধক্ষেত্রে নাদির শাহ্ যত পরাক্রমশালী হোন না কেন, মস্তিষ্ক সক্রান্ত কোন বিষয়ে নিজামের সমতুল্য ব্যক্তি দুনিয়ায় মেলা ভার। নিজামের মনে নাদির শাহকে গোপনে আহ্বানের জন্য কোন অনুতাপ না থাকলেও, সে ঠিক করে শাহানশাহের ক্ষতি যাতে না হয় সেটুকু দেখবে। শত হলেও তিনি মালিক। ইচ্ছা করলে তিনি তাকে পথের ভিখারী করে ছেড়ে দিতে পারেন। সে মনে মনে কৌতুক বোধ করে শাহানশাহের সসীম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার দশা দেখে। এত আমির আর উজির থাকতে তিনি এমন দু'জন ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন যারা তাঁর ক্ষতি চাইত।

খান দউরান জীবিত নেই। নিজামের পক্ষে মঙ্গল হয়েছে তাতে। অনেক অপমান করেছে তাকে। এমন কি তারই প্রচ্ছন্ন মদতে দরবার কক্ষে সবার সামনে তাকে দাক্ষিণাত্যের বাঁদর বলে অপমানিত করতে ছাড়েনি। এইভাবে যদি সাদাত খাঁও চলে যেত তাহলে নিষ্কণ্টক হওয়া যেত। এক ঢিলে প্রায় দুই পাখি মরতে বসেছিল। একজন সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গেল আহত হয়েও। তবে সুযোগ আরও আসবে। মনে হয় একই দেশের মানুষ বলে ইতিমধ্যে নাদির শাহের

ওপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে সাদাত। কিন্তু চিন কিলিক খাঁকে সে এখনো ভালভাবে চিনতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত চিন কিলিকই টিকে থাকবে নিজমুল মুলক হয়ে।

সন্ধ্যার অনেক পরে রওনা হয় নিজাম নাদির শাহের শিবিরের দিকে। পৌছোতে অন্ধকার হয়ে যায়। বিস্তীর্ণ প্রান্তর। গাছপালা নেই বেশি। তাই অন্ধকার জমাট বাঁধতে পারেনি। নাদির শাহের লোকেরা তাকে যে-শিবিরে নিয়ে গেল সেটি খুব বড়। তবে মোগলদের শিবিরের মত দৃষ্টিনন্দন আদৌ নয়। বোঝাই যায় নিছক ব্যবহারের জন্য সেটি তৈরি হয়েছে। মনোরঞ্জনের জন্য নয়। তবে ঝড় ঝাপটার দাপট সামলাতে যথেষ্ট মজবুত। দেখলেই বোঝা যায়।

নিজাম আশা করেনি তাকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা জানানো হবে। কারণ প্রথমত সে শাহানশাদের কর্মচারী মাত্র এবং দ্বিতীয়ত সে পরাজিত পক্ষেব প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছে। তাই কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীও রয়েছে বলে মনে হয় না। তবে সে যার সঙ্গেই আলোচনা করুক না কেন, তার আগে নাদির শাহের সঙ্গে দেখা করবে বলে চাপ সৃষ্টি করবে। নইলে আলোচনায় বসবে না। কারণ আলোচনায় যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তার নড়চড় হবে না। তখন যদি নাদির শাহ বলে বসেন, তিনি কিছু জানতেন না, তাহলে খুব মুশকিল হবে। আলোচনার ফলে যে সিদ্ধান্তে পৌছানো হবে তাতে নাদির শাহের সম্মতি থাকবে এটুকু জেনে নেওয়া দরকার।

সেই সময়ে একজন শিবিরে প্রবেশ কবে। অন্যান্যরা তাকে সম্মান জানায়। নিজাম বুঝতে পারে কোন আমির হবে বোধহয়।

লোকটি নিজামের সামনে এসে আবছা একটু হেসে বলে-- আমার নাম আবদুল বাকি খাঁ। আপনি নিশ্চয় নিজামুল মুলক।

— হ্যাঁ।

-- আমার সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে।

-- শাহ নিশ্চয় আপনাকে নির্বাচিত করেছেন?

বাকি খাঁয়ের মুখ সামান্য একটু কঠোর হয়। সে বলে-- অবশ্যই।

-- আলোচনার আগে আমি শাহকে আমাদের বাদশাহের শুভ বার্তা পৌছে দিতে চাই।

— এখন?

— হ্যাঁ। আমার প্রতি সেইরকম নির্দেশ রয়েছে।

বাকি খাঁকে সামান্য একটু বিচলিত বলে মনে হল এই কথায়। সে জানে একটু পরেই শাহ হয়ত সরাব নিয়ে বসবেন।

— যতদূর জানি তিনি এখন ব্যস্ত রয়েছেন।

— বেশ তো আলোচনা কাল শুরু হবে। আমি আপনাদের এখানে রাত্রি যাপন করব। কোন অসুবিধা নেই। আসল হল কাজ।

বাকি খাঁ এতক্ষণে শিবিরের আলোয় নিজামের মুখের দিকে ভালভাবে দৃষ্টি ফেলে। সেই মুখে এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে রীতিমত ওয়াকিবহাল বলে মনে হচ্ছে। আর চোখ দুটো চিকচিক করছে। এক কথায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ধূর্ততার সংমিশ্রণ ওই দৃষ্টিতে।

— আপনি অপেক্ষা করুন, আমি নিজে গিয়ে দেখছি শাহ্ আপনার সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হন কি না।

কিছুক্ষণ পরে বাকি খাঁ নয়, অন্য একজন হাতে আলো নিয়ে তার কাছে এসে বলে – আসুন।

নিজাম তাকে অনুসরণ করে। কয়েকটি শিবির অতিক্রম করার পর তাকে অপেক্ষাকৃত একটি ক্ষুদ্র শিবিরের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়।

— ভেতরে যান। শাহ্ অপেক্ষা করছেন।

নিজাম প্রবেশ করেই দেখে নাদির শাহ তার দিকে চেয়ে বসে রয়েছেন। অদূরে বাকি খাঁ দণ্ডায়মান। জীবনে প্রথম দেখলেও চিনতে ভুল হয় না। কারণ নাদির শাহ সম্বন্ধে অনেক কিছু সে শুনেছে।

যথাযোগ্য অভিবাদন জানিয়ে সে বলে— আপনার দর্শন লাভ করে আমি কৃতার্থ। আমাদের বাদশাহ আপনাকে তাঁর শুভকামনা জানাতে বলেছেন।

— আমি বরাবরই তাঁর মঙ্গল চেয়েছি। পত্রের পর পত্র লিখেছি। দূত পাঠিয়েছি। তিনি গ্রাহ্য করেননি। তাই আজ আমরা এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছি। অথচ এসব এড়ানো যেত।

নিজাম মনে মনে স্বীকার করে অবশ্যই এড়ানো যেত। অন্তত কাবুলের পরে আর নাদির শাহকে আসতে হত না। যদি শাহানশাহের দূরদৃষ্টি থাকত। যদি তিনি এতবড় দেশের যোগ্য শাসনকর্তা হতেন। কিন্তু এসব কথা তো মুখে বলা যায় না। তাই সে বলে – যা ঘটে গিয়েছে, তাকে নতুন করে পরিবর্তন করা যাবে না। সব কিছু মেনে নিয়ে আমাদের এখন থেকে ভবিষ্যতের কথা ভেবে চলতে হবে। আমরা যেন আর কোন সংঘর্ষের মধ্যে না যাই। আর যেন কোন ক্ষয় ক্ষতি না হয়। আপনি অনেক দূর চলে এসেছেন। আপনিও পরিশ্রান্ত। কতদিন হয়ে গেল নিজের সাম্রাজ্যের বাইরে রয়েছেন।

— তাতে কিছু এসে যায় না। পুত্র রেজা কুলি মির্জা রয়েছে ওখানে।

— শাহের অভাব অন্য কেউ পূরণ করতে পারে না। দেশের লোকের মনের মধ্যে একটা অভাব-বোধ থেকে যায়। সেই অভাব বোধ ধীরে ধীরে অসন্তুষ্টির সৃষ্টি করতে পারে।

নাদির শাহকে একটু চিন্তিত বলে মনে হল। নিজামের বক্তব্যকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেন। তিনি বলেন— আলোচনার বিষয় সম্বন্ধে আবদুল বাকি খাঁকে যথাযথ নির্দেশ দিয়েছি। আপনাদের খুব একটা অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না।

সহসা তিনি বাকি খাঁ কে বাইরে যেতে বলেন। বিস্মিত বাকি খাঁ চলে গেলে তিনি বলেন— সাদাত খাঁয়ের মত আপনিও চেয়েছিলেন আমি এদেশে আসি।

নিজামের বুক না কাঁপলেও একটু অস্বস্তি অনুভব করে।

— হ্যাঁ খোদাবন্দ।

— শুধু আমার মা জানত একটা কথা। আজ দ্বিতীয় ব্যক্তি আপনাকে বলছি আমার গোপন বাসনার কথা।

— বলুন শাহ।

— আমি স্বপ্ন দেখতাম দিল্লীর তক্ত তাউসে বসব। তা কি সম্ভব নয়?

— সম্ভব। কিন্তু স্থায়ী হতে পারবেন না। এটা বিশাল দেশ। অনেক জাতি আছে যারা অত্যন্ত শক্তিশালী। তারা আপনার বিরুদ্ধে গেলে আপনার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। আপনি হীনবল হয়ে পড়বেন। ফলে হিন্দুস্থান আর পারস্য দুটো দেশই আপনার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

একটু ভেবে নিয়ে নাদির শাহ্ বলেন— আপনি যথার্থ বলেছেন। এভাবে কেউ বলতে পারবে না। আমার তাহলে এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু ক্ষতিপূরণ?

— সেই বিষয়ে আলোচনা হবে।

নাদির শাহের শিবির থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে নিজামুল মুলুক পূর্বের শিবিরে প্রবেশ করে দেখে সেখানে আবদুল বাকি খাঁ অপেক্ষারত। তার মুখে একটা সমীহের ভাব। প্রথম দর্শনে নিজেকে যে উচ্চাসন থেকে কিছুটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখছিল নিজামকে এখন সেই দৃষ্টি সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। তার মুখে বিনয়ের হাসি।

সে বলে— শাহ কি আলোচনার বিষয়ে কিছু বলেছেন?

— তিনি এ বিষয়ে কোন কথা বলেননি। আমাদের মধ্যে অন্য কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, আপনাকে ইতিমধ্যে নির্দেশ দিয়েছেন।

— হ্যাঁ।

আলোচনার শেষে ঠিক হয়, অশ্ব, হস্তী ও উট ছাড়াও নাদির শাহ্ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পাবেন। এর জন্য নিজামুল মুলক্‌কে যথেষ্ট দর কষাকষি করতে হল।

আলোচনা শেষ হল মাঝরাত্রির পরে। ফিরে আসার আগে নিজাম বাকি খাঁকে প্রশ্ন করে— সাদাত খাঁয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?

— হয়েছে।

— তিনি কি বন্দী রয়েছেন?

— না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তবে তিনি বেশ আহত। কোন শকট ছাড়া যাতায়াত করতে পারবেন না। শুনছিলাম আগামী কাল আপনাদের শাহানশাহের সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

— কেমন মনে হল তাঁকে?

— বেশ ভাল। কেন বলুন তো?

— আলোচনা উনি চালাতে পারতেন।

— হয়ত পারতেন। আমার মনে হয় শাহানশাহের কাছ থেকে কোন রকম নির্দেশ পেতে অসুবিধা ছিল বলে উনি অগ্রসর হননি।

— হয়ত তাই।

নিজাম তার অশ্বে উঠে ধীরে ধীরে চলতে থাকে। সে জানে তাকে চোখে চোখে রাখছে নাদির শাহের অনেক সিপাহী। তিনি শাহানশাহের ছাউনির চারদিকেও লোক মোতায়েন করেছেন। প্রত্যেককে ভালভাবে দেখেশুনে ঢুকতে বের হতে দেওয়া হচ্ছে। যুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকেই এই নিয়ম চালু হয়েছে। নাদির শাহ্ যে কতখানি শৃঙ্খলাপরায়ণ, যুদ্ধবিষয়ে তিনি

যে কতটা পারদর্শী এতেই প্রমাণিত হয়।

পরদিন সাদাত খাঁকে মধ্যাহ্নের মধ্যে আশা করেছিল নিজামুল মুলক। কারণ নাদির শাহের সঙ্গে আলোচনায় কি ঠিক হল সে বিষয়ে জানার কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক তার পক্ষে। কিন্তু সে এল না। তার পরিবর্তে আবার নিজামুল মুলকের ডাক এল নাদির শাহের কাছ থেকে।

শাহানশাহ্ প্রশ্ন করেন— আবার কেন?

নিজাম বলে— তাই ভাবছি। আবার নতুন করে কোন শর্ত আরোপ করবে কি না কে জানে। তিনি বিজয়ী। যা খুশি করার অধিকার তাঁর রয়েছে।

— মুশকিল।

— আপনি ভাববেন না খোদাবন্দ। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

নাদির শাহের ছাউনিতে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে তাকে শাহের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে যথারীতি সম্মান প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে শাহ বলে ওঠেন— আমি গতরাতে একটু বেশি প্রগলভ্ হয়ে পড়েছিলাম। নিজের কথা বেশি বলে ফেলেছি।

— আপনি খোদাবন্দ খুব মিতভাষী। বেশি কথা তো বলেননি।

— না, আসল কথা আপনাকে বলা হয়নি।

— আপনি বলুন।

— আপনার মাধ্যমে শাহানশাহকে একটি প্রস্তাব পাঠাতে চাই। তাঁকে জানাবেন, তিনি যদি এই গরিবের ছাউনিতে আগামীকাল আতিথ্য গ্রহণ করেন আমি খুবই আনন্দিত হব। মধ্যাহ্নের খানা এখানেই গ্রহণ করবেন।

নিজামুল মুলকের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুপথযাত্রী খান দউরানের সাবধানবাণীর কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। খান দউরান এই পরিস্থিতিতে পড়লে নিজেই হয়ত মত পালটাতেন। তাছাড়া শাহানশাহকে উপদেশ দেওয়ার আরও অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি রয়েছেন। তাঁরাই সিদ্ধান্ত নেবেন। দূত হিসাবে সে শাহের বার্তা বহন করে নিয়ে যাবে মাত্র।

নাদির শাহকে সে বলে— আমি অবশ্যই শাহানশাহকে আপনার আমন্ত্রণের কথা জানাব। এতো খুব আনন্দ সংবাদ। অন্যান্য ওমরাহ আর উজির তাঁকে কোন্ পরামর্শ দেবেন আমি জানি না, তবে আমি ওঁকে আমন্ত্রণ গ্রহণের পরামর্শ দেব।

শাহানশাহের কাছে ফিরে এসে নিজামুল মুলক নাদির শাহের আমন্ত্রণের কথা জানাতেই চারদিকে থেকে ওমরাহরা হাঁ হাঁ করে ওঠে।

নিজামুল মুলক একাই রুখে উঠে বলে— খান দউরানের সাবধানবাণী তো?

খান জুমান খাঁ বলে— একশোবার।

— যে ব্যক্তি মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে, তার মস্তিষ্ক কি সুস্থ বলা যায়? তার কোন মত গ্রাহ্য হওয়া উচিত নয়।

আজিম আল্লা খাঁ বলে ওঠে— এ আপনি কি বলছেন চিন কিলিক খাঁ?

রুষ্ট নিজাম বলে— আমার পদবীর কথা মনে রাখলে খুশি হব।

আলি হামিদ খাঁ বলে— মনে রাখতে দিচ্ছেন কোথায়? খান দউরান হিন্দুস্থানকে ভালবাসতেন। তাঁর এই সাবধানবাণী মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। হৃদয়ের। হৃদয় চিরকাল সুস্থ থাকে মানুষের।

নিজামুল মূলক একটু থতমত খেয়ে যায়। এই ধরনের আক্রমণের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। সেই সময় শাহানশাহ তার রক্ষাকর্তা হয়ে বলে ওঠেন— আমি যাব। খান দউরানকে আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু তিনি হয়ত নাদির শাহকে ঠিকমত চিনতে পারেননি।

এবার জাঠ নেতা কৃপা রাম আর চুপ করে থাকতে পারে না। সে বলে— আমার মনে হয়, আমরাই তাঁকে চিনতে ভুল করছি। তিনি যে-সব গ্রাম নগরী অতিক্রম করে এসেছেন সেই সব জায়গায় মৃতদেহের পাহাড় জমেছে। ঘর বাড়ি ভস্মীভূত। সবাই কপর্দকশূন্য। আগে তো বুঝতে পারিনি। এখন একে একে খবর আসছে।

নিজামুল মুল্‌ক বলে— অন্যদেশে যুদ্ধ করতে এলে এসব অবশ্যম্ভাবী ফল।

মুজাফ্ফর খাঁ বলে— তাহলে পত্রের মাধ্যমে বন্ধুত্বের ছদ্মবেশ ধরেছিলেন কেন? সোজাসুজি বললেই পারতেন।

শাহানশাহ্ বিরক্ত হয়ে হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠেন— আমি যাব। এটাই আমার সিদ্ধান্ত।

নিজামের মুখে হাসি ফোটে। অন্য সবাই হতাশ। তারা ভাবে ভবিতব্য কেউ খণ্ডাতে পারে না। সে স্বীকার করে নেয় নাদির বন্ধুর ছদ্মবেশ ধরলেও সেটা ছিল রণ-কৌশল। সৈন্যেরা নগর বা গ্রামবাসীদের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে আসবে না কখনো। কথাগুলো আগেও মনে এসেছিল। কিন্তু বলতে সাহস হয়নি তার। এরা সবাই বড় বেশি আবেগপ্রবণ। আবেগের বালাই নেই শুধু তার আর সাদাত খাঁয়ের। তাই চিরকাল সিদ্ধান্ত নিতে শাহানশাহকে তাদের দুজনার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে বেশি। অবশ্য খান দউরান ছিল। সে বেঁচে থাকলে তাকে ডিঙিয়ে যাওয়া মুশকিল হত। মরেছে ভালই হয়েছে। দিল্লীর তক্ত তাউসে কে বসবে সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকা। সাদাত খাঁ মুছে গেলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। তাই বলে তো সাধারণ খুনীর পর্যায়ে নেমে আসা যায় না।

নিজামুল মুল্‌ক কোমল স্বরে বলে— নাদির শাহ মধ্যাহ্নের খানা একসঙ্গে গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

তার কথা শুনে অন্য সবাই মনে মনে জ্বলে ওঠে। কিন্তু কণ্ঠরোধ করে বসে থাকে। নাদির শাহ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলে হিন্দুস্থানের বাদশাহ সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেবেন? বলা উচিত. খানা পিনা কিছু নয়, শুধু কথাবার্তা হতে পারে। কিন্তু তিনি তো নিজামের কাঁধে ভার দিয়ে চলেছেন। খাদে না পড়া অবধি হুঁশ হবে না।

শাহানশাহ্ বলেন— আমি রাজি আছি। ওঁকে তাই জানিয়ে দিন।

আমির ওমরাহ্ উজির সবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য নয়, বাদশাহের এই সম্মতির দরুন আজ প্রথম হিন্দুস্থানের প্রকৃত পতন হল। তারা নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে শাহানশাহের দিকে চেয়ে থাকে।

পরদিন শাহানশাহের শিবিরের সম্মুখে যখন মণিমুক্তখচিত তাঁর শিবিকাকে স্থাপন করা হল, তখন পুরুষ হয়েও অনেকের চোখে অশ্রু চিকচিক করে ওঠে। সবাই ভেবেছিল তিনি যখন রাত্রে হারেমে যাবেন তখন মালিকা-আল-জুমানি নিশ্চয়ই তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন। বোঝা গেল তিনি বললেও বাদশাহের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটাতে পারেননি। তাঁর পুত্র সুলতান আহমেদকে কাজে লাগানো যেত। কিন্তু পরাজয়ের পরে তার পাত্তাই নেই। কানাঘুষা এটা ওটা অনেক কিছু শোনা যাচ্ছে। তবে এখানে তো কেউ কেচ্ছা শুনতে আসেনি, শোনার সময়ও নেই। তাই শাহজাদা সম্বন্ধে তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

শাহানশাহ দেখলেন পারস্যের শাহের শিবির শ্রেণীর সম্মুখে যেখানে তাঁর শিবিকা নামানো হল সেখানে অর্ধবৃত্তাকারে বহু ব্যক্তি সম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ চেহারা আর হাবভাব দেখে প্রতীয়মান হয় যে তারা সবাই গণ্যমান্য ব্যক্তি।

শাহানশাহ শিবিকা থেকে অবতরণ করতেই একজন সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান তরুণ একা এগিয়ে এসে সম্ভ্রমে তাঁকে অভিবাদন জানায়। শাহানশাহ স্মিত হেসে এবং সামান্য মাথা হেলিয়ে সেই অভিবাদনের জবাব দেন। এসব ক্ষেত্রে তিনি সাধারণত মাথাও হেলান না। কিন্তু এখানে তিনি অতিথি। তার ওপর পরাজিত পক্ষ তো বটেই। তাই পর্বতের চূড়ার মত শিরকে সুউচ্চ ও অনড় রাখতে পারলেন না।

তরুণটি শাহানশাহকে অত্যন্ত বিনীত ভাবে বলে— আমি মুর্তাজা কুলি মির্জা। আমি পারস্যের শাহের দ্বিতীয় পুত্র।

-- খুশি হলাম। শাহ কোথায়?

— তাঁর শিবিরের সামনে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

শাহানশাহ একটু থমকে গিয়ে প্রশ্ন করেন— কতদূর?

— ওই যে দেখা যাচ্ছে। সামনেই।

শাহানশাহও লক্ষ্য করেন। দেখলেন শাহ দ্রুত পায়চারী করছেন। তাঁর মাথার তাজ দেখে তাঁকে চিনতে অসুবিধা হয় না। ভাবেন, লোকটা অত্যন্ত ছটফটে। শুধু শুধু পরিশ্রান্ত হচ্ছেন।

নাদির শাহের সম্মুখে উপস্থিত হতেই তিনি শাহানশাহের দুই হাত জড়িয়ে ধরেন। তারপর তাঁকে নিয়ে ভেতরে যেতে যেতে বলেন— আমি স্বপ্নেও যা কল্পনা করতে পারিনি আজ তাই সত্য হল। হিন্দুস্থানের শাহানশাহ আজ আমার অতিথি। এ যে আমার কতখানি সৌভাগ্য, বলে বোঝাতে পারব না।

শাহানশাহ নাদির শাহের কথা শুনে মনে মনে গর্বিত হন। মুখে কিছু বলেন না। তাঁকে নিয়ে গিয়ে নাদির শাহ একটি বৃহৎ আরামদায়ক আসনে বসতে অনুরোধ করেন এবং নিজেও পাশে বসেন। একাসনে এভাবে জীবনে প্রথম বসতে হচ্ছে বলে শাহানশাহ সামান্য একটু অস্বস্তি অনুভব করলেও সম্মানীয় অতিথি বলে মুখ ফুটে কিছু বললেন না। ভাবলেন, পারস্যের আদব-কায়দার সঙ্গে দিল্লীর আদব-কায়দার ফারাক থাকা অস্বাভাবিক নয়। শাহ তো তাঁকে আশাতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করছেন।

হাসিমুখে কুশল বিনিময়ের পরে নাদির শাহ্ সহসা নীরব হয়ে গেলন। তাঁর মুখের হাসি ধীরে ধীরে কমতে কমতে শেষে অন্তর্হিত হল। শাহানশাহ লক্ষ্য করলেন, তাঁকে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে। এর কারণ অনুসরণ করতে পারেন না তিনি। দিল্লীর তক্ত তাউসে বসার পরে এই প্রথম তিনি অস্বস্তি অনুভব করেন।

নাদির শাহ্ চিৎকার করে খানা পরিবেশন করতে বলেন। তাঁর চিৎকার শুনে শাহানশাহ বিস্মিত হন। একটা দেশের অধীশ্বর হয়ে এত উচ্চকণ্ঠে ডাকতে হয়? কেমন যেন বর্বর বলে মনে হয় তাঁর কাছে। বর্বর তো বটেই। নইলে শুধু দেশ জয়ের জন্য এত মেহনত করে নিজের দেশ ছেড়ে আসে কেউ? সামান্য পঞ্চাশ লাখ টাকা তো পেল। দিল্লীতে যে কী অগাধ সম্পত্তি রয়েছে ধারণাও করতে পারবে না এই লোকটি।

খানা এল। দুজনার সামনে খুব সুন্দরভাবে পরিবেশিত হল। পরিবেশনকারীরা বেশ অভ্যস্ত বলে মনে হল। মোগল রুচির সঙ্গে খাপ না খেলেও আদবকায়দা জানে। একটু ইতস্তত করেন তিনি। কারণ তাঁর খানা বরাবর একজন্ আস্বাদক চেখে দেয়। মোগল বাদশাহের চিরকালের প্রথা খাদ্য বিষমুক্ত কি না পরীক্ষা করে নেওয়া।

তাঁকে চুপচাপ দেখে নাদির শাহ্ একজনকে ডেকে নিয়ে পরস্পরের পাত্রগুলি বিনিময় করে নিলেন।

শাহানশাহ নাদির শাহের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে তিনি বলেন— আপনার মধ্যে সন্দেহ জাগতে-ই পারে। ডেকে এনে বিষপ্রয়োগে আপনার মৃত্যু ঘটাতে পারি। এমন অনেক ঘটেছে। তাই আপনাকে সন্দেহমুক্ত করতে খাদ্য পালটে নিলাম। এবারে আপনি নিশ্চয় নিশ্চিন্তে আহার করতে পারবেন।

আহারের সময় বিশেষ কোন কথা হয় না। শুধু আবহাওয়ার কথা হল। কার দেশে কোথায় খরা রয়েছে, দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা রয়েছে কি না ইত্যাদি বিষয়ে খবরাখবর নেওয়া হল। আহারের শেষে নাদির শাহ শাহানশাহকে তাঁর মুসুইদে বসতে অনুরোধ করেন। তাঁর মুখ আবার গম্ভীর হয়ে যায়।

শাহানশাহ বলেন— শুনলাম সাদাত খাঁয়ের লোকজনের জন্য শিবির করে দিয়েছেন।

— হ্যাঁ, আরও অনেকে রয়েছে। কতজন বন্দী রয়েছে এখানে আপনাকে কেউ বলেছে?

— বলেছে, তবে সঠিক খবর এখনো পাইনি।

নাদির শাহ্ তাঁর কামিজের এক দিক থেকে একটা লম্বা ফিরিস্তি বের করে বলেন— এটা নিন, এতে আপনার যারা এখানে রয়েছে তাদের নাম আছে। তবে সাদাত খাঁকে বলেছি তিনি ইচ্ছামত ঘোরাফেরা করতে পারেন।

শাহানশাহের মুখ লাল হয়ে ওঠে। তিনি ফর্দটি গ্রহণ করে সেটা হাতে ধরে রাখেন।

— ওটা আপনার কামিজে ভরে রাখুন। নইলে হারিয়ে যাবে। আপনার হাত থেকে ওটা নেওয়ার কেউ নেই এখানে। একাজ আপনাকে নিজেই করতে হবে।

শাহানশাহ সেটা আস্তিনের ফাঁকে গুঁজে রাখেন। তিনি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন নাদির শাহ একটা কিছু বলার জন্য অনেকক্ষণ থেকে প্রস্তুত হচ্ছেন। মধ্যাহ্নের আহার শেষ হওয়ার

জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু কী বলতে চান তিনি? যা হওয়ার তা তো হয়েই গিয়েছে। টাকাও পেয়ে গিয়েছেন। হস্তী, ঘোটক আর উষ্ট্র দু একদিনের মধ্যে পেয়ে যাবেন। আর কি বলার থাকতে পাবে?

অবশেষে বলার সময় হয় নাদির শাহের। তিনি বলেন— আপনাকে কয়েকটি কথা বলব। স্পষ্ট কথা। আপনি কিছু মনে করতে পারেন। তবে আমি বলার তাগিদ অনুভব করছি।

মনে মনে শাহানশাহ ভাবেন। সবই শুনতে হবে। মুখে তিনি বলেন— বলুন।

— আমি বহুবার ভেবেও কুলকিনারা পাইনি আপনি নিজের স্বার্থ, নিজের ভালমন্দ বিষয়ে এত নিস্পৃহ থাকেন কি করে। আমি আপনাকে একাধিক পত্র দিয়েছি, আমার দূতকে প্রেরণ করেছি আপনার বন্ধুত্ব কামনা করে, অথচ আপনার উজির ওমরাহরা এতটুকু গুরুত্ব পর্যন্ত দিল না। নিজের লোকজনদের ওপর আপনার এতটুকু কর্তৃত্ব নেই, নিয়মানুবর্তিতার বালাই নেই। ফলে আমার একজন দূতকে সমস্ত বিধিনিষেধের অমর্যাদা করে তারা হত্যা পর্যন্ত করেছে। পৃথিবীর কোন দেশে কোন নিয়মে দূতকে বধ করা হয় বলতে পারেন?

এমনকি যখন আমি সীমান্ত অতিক্রম করে আপনার দেশে প্রবেশ করলাম তখনো আপনি নির্বিকার। একবার জানারও চেষ্টা করলেন না আমি কে, এবং আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। আমি অগ্রসর হতে হতে লাহোর অবধি বলতে গেলে নির্বিঘ্নে চলে এলাম, তবু আপনার কোন লোক আমার সঙ্গে এসে দেখা পর্যন্ত করল না। আপনাকে আমি যে সম্মান জানিয়ে পত্র দিয়েছিলাম, সেই সম্বন্ধেও কিছু বলল না। তারপর যখন আপনার সুযোগ্য উজির এবং আমির ওমরাহদেব নিদ্রা ভঙ্গ হল, তখন বহু বিলম্ব হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা আমার সঙ্গে কোনবকম আপস রফায় না এসে আমাকে বাধা দেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং নিজেদের ফাঁদে নিজেরা পড়ল। বংশ পরম্পরায় বিখ্যাত মোগল বাহিনীর অধীনে কাজ করা সত্ত্বেও তাদের এতটুকু দূরদৃষ্টি নেই যে বাহিনীর একটা বিরাট অংশকে সাহায্যকারী হিসাবে দূরে সরিয়ে রেখে শত্রুপক্ষের সুবিধা করে দিতে নেই। এরপর আর এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম, জানি না সেটা অন্যের পরামর্শে কিংবা আপনার মস্তিষ্কপ্রসূত কি না। চারদিকে শক্ত প্রাচীর আর বেড়া তৈরি করে আপনি নিজেকে তার মধ্যে অবরুদ্ধ করে রাখলেন। এটুকু বুদ্ধি হল না যে যদি আপনার শত্রু যথেষ্ট শক্তিশালী হয় তাহলে ওই প্রাচীরের মধ্যে আপনি পানীয় জল আর খাদ্যের অভাবে জীবিত থাকতে পারবেন না। শত্রু সব বন্ধ করে দেবে। আর শত্রু যদি দুর্বল হয় তাহলে ওইভাবে অসম্মানজনক অবস্থায় থাকা খুব লজ্জাকর। শত্রুকে ধর্তব্যের মধ্যে যদি গণ্য করাব ইচ্ছা থাকত এবং যদি নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চাইতেন তাহলে একজন যোগ্য এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে তার বিরুদ্ধে পাঠিয়ে তাকে খতম করে দিতে পারতেন। আমি কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনার কাছে নানা প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম। আপনি গ্রাহ্য করেননি। আপনার ক্রমাগত অবহেলা আমার মর্যাদাবোধকে আঘাত করেছে।

নাদির শাহ একটু থামলেন। শাহানশাহ তাঁর দীর্ঘ হাত দুটি কোলের ওপর রেখে মুসুইদের ওপর চিত্রার্পিতের মত বসে রইলেন। মুখ দিয়ে বাক্যস্ফূর্ত হল না। তিনি জানেন, তাঁর বেগম, তাঁর উজিরেরা ভাবছে খানা খেতে খেতে সমানে সমানে আলোচনা হচ্ছে। নাদির শাহের

বিদায় পাকা করে তিনি নিজের শিবিরে ফিরে আসবেন। বেগম হয়ত পুত্রের সঙ্গে এই নিয়ে খুব আনন্দ করছেন। তাঁরা জানেন না, যে ভাবে একতরফা তিনি অপমানিত হয়ে চলেছেন, জীবনে তা কল্পনার অতীত ছিল।

নাদির শাহ শুরু করেন— হ্যাঁ, আপনি কর্ণপাতও করেননি। অবশেষে পরম করুণাময় আল্লার কৃপায় আপনি বুঝতে পারলেন আমার সৈন্যরা কতখানি শক্তিশালী, আমার অস্ত্রবল কতটা উচ্চমানের। তাছাড়া আপনার পূর্বপুরুষেরা কাফেরদের কাছ থেকে জিজিয়া কর নিতে অভ্যস্ত ছিলেন। আপনি গত বিশ বছর তাদের কাছ থেকে সেই কর আদায় করেননি। তাদের রেহাই দিয়ে আপনি রাজস্বের অনেক ক্ষতি করেছেন। তবে তৈমুরের এই বংশ পারস্যের অধিবাসীদের কোন ক্ষতি করেনি। তাই আমি স্থির করেছি আপনার হিন্দুস্থান আমি আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেব না। আজ এইটুকুই থাক। আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। হয়ত ভোজনের পরে এইভাবে একটানা বসে থাকতে আপনি অভ্যস্ত নন। বাকিটা দু একদিনের মধ্যে হবে।

শাহানশাহ যখন ফিরে এলেন তখন আমির ওমরাহেরা আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর বিধ্বস্ত চেহারা দেখে চমকে ওঠে। একবেলার মধ্যে তাঁর বয়স অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হল। সবাই বুঝল, নাদির শাহের শিবিরে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। খান দউরানের মৃত্যুকালীন শেষ সাবধানবাণীর কথা তাদের মনে পড়ল। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও একটা অনিশ্চয়তার ছায়াপাত ঘটল সবার মনে। তারা শিবিরের বাইরে উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করতে থাকে। হয়ত একটু স্থির হয়ে নিয়ে বাদশাহ তাদের ডেকে পাঠাবেন। ডেকে পাঠানোর আদৌ ইচ্ছা ছিল না বাদশাহের। তাঁর ধারণা, যে-অপমান তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে তার সবটাই তাঁর মুখে আঁকা হয়ে গিয়েছে। যে কেউ সেটা ধরতে পারবেন। পড়তে পারবেন। তাঁর এতদিনের সুউচ্চ স্থান থেকে নাদির শাহ তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে আমির ওমরাহদের সমপর্যায়ে এনে নামিয়ে দিয়েছেন। তবু তিনি বাদশাহ। এই চরম মুহূর্তে তাদের ডেকে আনা কর্তব্য। তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা লোভনীয়। তাই ডাকলেন তাদের।

শিবিরে একে একে এসে প্রবেশ করে উজির কামরুদ্দিন খাঁ, সিরবুলিন্দ খাঁ, মহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশ, আজিম আল্লা খাঁ প্রভৃতি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ।

বাদশাহ বলেন— নিজামুল মূলক এর চুক্তিটি ভালই হয়েছে। তবে নাদির শাহের মতিগতি খুব স্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে না। মুখে বলছেন বটে, এখান থেকে ফিরে যাবেন। কিন্তু সত্যিই কি যাবেন? আমি বুঝতে পারলাম না। আচ্ছা, আমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছেন, যিনি হিন্দুস্থানের ক্ষতি করতে চাইছেন?

সবাই একসঙ্গে 'না না' করে ওঠে। তারপর উজির কামরুদ্দিন ধীরে ধীরে বলে— 'হ্যাঁ' কিংবা 'না', দুটোর কোনটাই এত তাড়াতাড়ি বলা ঠিক হবে না। সব কিছু হতে পারে। তবে আপনার মনে যে সংশয়ের উদয় হয়েছে তার সঙ্গত কারণ রয়েছে। যদিও খুবই বিলম্ব হয়ে গিয়েছে, আমাদের আরও সাবধানী হতে হবে।

সবাই উজিরকে সমর্থন করে।

বাদশাহ প্রশ্ন তোলেন— কিন্তু কে?

উপস্থিত ওমরাহ কয়জন প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে নেয়। তারপর মহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশ বলে— আমাদের মধ্যে যে কেউ একজন হতে পারে। তবে আমার মনে হয়, এই যুদ্ধে কে কে নাদির শাহের খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন সেই দিকে একটু নজর রাখলে বোধহয় আমাদের বোঝার সুবিধা হবে।

সবাই ঘাড় দোলায়।

বাদশাহ বলেন— যা হোক, আপনারা সবাই কাছাকাছি থাকবেন। যখন তখন আপনাদের পরামর্শের প্রয়োজন হতে পারে। আর নিজাম এবং সাদাত খাঁকে আমাদের শিবিরে দেখলে এখানে পাঠিয়ে দেবেন। সাদাত খাঁ-এর একটু অসুবিধা আছে। যুদ্ধের সময় তাঁর সৈন্যদলকে ঘিরে ওরা নিজেদের দিকে নিয়ে গিয়েছে। সেখানেই তাঁর শিবির।

সিরবুলিন্দ খাঁ বিরক্তি প্রকাশ করে বলে— ভাল কাজ হয়নি।

বাদশাহ বলেন— উপায় ছিল না।

উজির কামরুদ্দিন একবার চিন্তান্বিত স্বরে বলে নাদির শাহ একটা কাজ ভাল করছেন না।

— কোন্ কাজ?

— তিনি আমাদের দিকে খাদ্যশস্য, এমনকি গোস্ত অবধি আসতে দিচ্ছেন না। ফলে তাঁর শিবিরে খাদ্যের প্রাচুর্য। আমাদের দিকে হাহাকার। এমন কি গোস্ত পর্যন্ত দেড় টাকায় একসের। ভাবা যায় না।

বাদশাহ সবার দিকে চেয়ে বলেন—খুব আক্রা বুঝি?

তাঁর উক্তিতে সবাই মনে মনে হতাশ হয়।

কামরুদ্দিন বলে— এক সিকি সের হলেও ক্রেতার মাথা গরম হয়ে যায়। সাধারণত দু'আনি, গাঁয়ে আরও কম।

—তাই নাকি?

— গম টাকায় দেড়সের। নিজাম বললেন, নাদির শাহের ওখানে গম পাওয়া যাচ্ছে এক টাকায় বারোসের।

— এ অসহ্য। আমাদের লোকেরা কি না খেয়ে মরবে? এতসব তো জানতাম না? আমাকে বলেননি কেন?

— আজই জানতে পারলাম। আপনি তখন নাদির শাহের শিবিরে।

— আপনারা ভাবুন, এর কি বিহিত করা যায়। সব কিছুর একটা সীমা আছে।

সিরবুলিন্দ খাঁ বলে— অবশ্যই।

ওমরাহরা চলে গেলে বাদশাহ তাঁর বেগম মালিকা-আল-জুমানির কাছে যান। বেগম তাঁর মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারেন, জীবনে একটা নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে বাদশাহের। যে ললাটে কখনো কুঞ্চন রেখা দেখা যেত না, সেখানে পরপর দুটো ভাঁজ পড়েছে এক বেলাতে। বেগম নিজের স্বামীর সবরকমের দুর্বলতার কথা জানেন। স্বামী খোসামোদপ্রিয়,

বংশ বিষয়ে গর্ববোধ, নিজের চেহারা যে শাজাহানের পুত্র সুজার মত সুন্দর সেই বিষয়ে যৌবন থেকে সচেতন। আর দৃঢ় বিশ্বাস মোগল সাম্রাজ্যের ওপর মারাঠারা কঠিন আঘাত হানলেও, তক্তভাউস চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে। বাইরের কোন শক্তির হিম্মত হবে না এদিকে হাত বাড়াতে। যা কিছু বিপদ আসতে পারে, মোগল বংশেরই কোন কুলাঙ্গারের তরফ থেকে। তাই প্রথম থেকে নাদির শাহকে তিনি ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করেননি। বেগম এই প্রসঙ্গ দু'একবার উত্থাপন করার চেষ্টা করলে তিনি ঠোঁট উলটে হাত নাড়িয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন। আজ সেই অতি তুচ্ছ নাদির শাহ তাঁর সাম্রাজ্যের ভেতরে নিশ্চিন্তে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বাদশাহকে ভ্রুক্ষেপ না করে। তাতেই তিনি বিচলিত। তারপর তাঁর হাতে অসম্মানজনক ভাবে পরাজয় এবং সর্বশেষে বলতে গেল তাঁরই ইচ্ছায় আজ পরাজিতের মত তাঁর শিবিরে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। এ যে কতবড় আঘাত, বেগম ছাড়া হৃদয় দিয়ে আর কেউ বুঝবে না। মানুষটা মোটের ওপর তো ভালই। তাঁর প্রতি কোনোদিনই তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেননি বটে, কিন্তু একসঙ্গে থাকতে অসুবিধা হয়নি কখনো। যার দিকে নজর ছিল তাকে তো পিতা হত্যা করে ফেলেন আমিরের সন্তান ছিল না বলে। তখন মনে হয়েছিল দুনিয়া বুঝি শূন্য হয়ে গেল। তারপর সব ঠিক হয়ে গেল। এই বয়সে ওসব ঘটনা গল্প কাহিনী বলে মনে হয়। কালে ভদ্রে কখনো সখনো মনে পড়ে। পিতা কন্যার মঙ্গলের জন্য গুপ্তহত্যা করেছিলেন। ঠিকই করেছিলেন। নইলে দিল্লীর বাদশাহের বেগম হওয়ার সৌভাগ্য হত না। খুব ভাল থেকেছেন বরাবর। এই প্রাচুর্য, এই সম্মানের কথা বড় বড় আমির ওমরাহদের বেগমরাও কল্পনা করতে পারে না। তবে বাদশাহ মানুষটা অতি সাধারণ মাপের। বিদ্যার কথা সঠিক না জানলেও, তাঁর বুদ্ধির বহর তো দেখে আসছেন বরাবর। বুদ্ধি অবশ্য না থাকলেও চলে যায়। কতসব বুদ্ধিমান উজির রয়েছে, ঠিক চালিয়ে নিয়ে যাবে। মহম্মদ শাহ তো আর আকবর বাদশাহ নন। ভুলেও একথা কেউ ভাববে না। তাই নিজের বুদ্ধি, নিজের সীমাহীন ব্যক্তিত্ব আর দাপট দিয়ে তিনি শাসন করতে পারেন না। বরং সেটা পারে ঘোরতম শত্রু নাদির শাহ। দেখে শুনে তাই মনে হয়। তাই বাদশাহের ললাটের ওই কুঞ্চন দেখেও বেগমের মনে হল না অযোগ্যের কাছ থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছেন তিনি।

বেগমের সামনে হতাশ হয়ে বসে পড়েই তিনি তাঁর হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার অর্গলমুক্ত করেন। বলেন— তুমি তখন থাকলে অচেতন হয়ে পড়ে যেতে। কিছুতেই সহ্য করতে পারতে না। আমি পুরুষ বলে অবিচল পদে ওই বর্বরটার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলাম।

— কথা শুনিয়েছেন?

— শুনিয়েছেন মানে? রীতিমত গালাগালির পর্যায়ে পড়ে। এক কথায় ওটা বর্বর। কথা শিখবেই বা কোথা থেকে? ঐতিহ্য বলে তো কিছুই নেই। সারাজীবন শুধু রক্তপাত ঘটিয়ে চলেছে। যে দেশ শাসন করে সেই দেশে ফিরদৌসী নামে যে একজন ব্যক্তি ছিলেন, জানে সেই কথা? ওসবের মর্মই বোঝে না।

বেগম ধীরে ধীরে বলেন — তবে একটা জিনিস খুব ভাল বোঝেন।

— কি?

— কিভাবে যুদ্ধ করতে হয়।

— আমরা কি যুদ্ধ জানি না বলতে চাও?

— কতটা জান সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। একটা লোক দূর দেশ থেকে এসে হিন্দুস্থানের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপর বাদশাহের সৈন্যদলের সম্মুখীন হয়ে কয়েক ঘন্টার লড়াই-এ ফয়সালা করে ফেলল। এটা কম বাহাদুরীর কথা নয়। ইতিহাসে বিশেষভাবে লেখা থাকবে। তোমার নামও থাকবে।

— আমার নাম?

— হ্যাঁ, কারণ একজনের কৃতিত্বের সঙ্গে অন্যজনের ব্যর্থতা পাশাপাশি লেখা থাকে।

— তুমি আমাকে বিদ্রূপ করছ?

— না। বিদ্রূপ করার মত মানসিক অবস্থা আমারও নেই। কারণ আমি হিন্দুস্থানের সম্রাজ্ঞী। বাদশাহের অপমান আমার অপমান। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, স্পষ্ট জবাব দাও।

— কি কথা?

— বাদশাহের হারেম কি নাদির শাহের অধীনে?

— কী বলছ তুমি?

— আমি জবাব চাইছি। আমি কি এখন নিজের খুশিমত যে কোন সময়ে দিল্লীতে ফিরে যেতে পারি?

— তা কি করে সম্ভব? ওরা চারদিকে বলতে গেলে অবরুদ্ধ করে রেখেছে।

— অর্থাৎ আমিও বন্দিনী। শাহজাদাও বন্দী।

বাদশাহ সহসা কোন উত্তর দিতে পারেন না।

বেগমসাহেবা চূড়ান্ত ভাবে প্রশ্ন ছুড়ে দেন— তোমার তো অসংখ্য সৈন্য আছে, অশ্বারোহী আছে, হস্তি আছে, কামান আছে। তুমি আমাদের দিল্লীতে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পার না?

— সে যে খুব ঝুঁকির কাজ হবে। রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী।

— হোক। সেই ঝুঁকি তুমি নাও। তাতে যদি আমাদের মৃত্যু হয় ক্ষতি নেই। শাহাজাদারও আফসোস, সে যুদ্ধ করার কোন সুযোগই পেল না।

— তুমি বুঝতে পারছ না, নাদির শাহ সাংঘাতিক লোক।

—এতক্ষণে সবটাই বুঝে ফেললাম। তোমাকে আর কষ্ট করে বোঝাতে হবে না।

— তুমি কখনো আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলনি বেগম। বাইরের অপমান সহ্য করতে না পেরে তোমার কাছে সান্ত্বনা খুঁজতে এসেছিলাম।

— শাহানশাহ, এই সান্ত্বনা অন্যের কথার মধ্যে খুঁজে পাবে না। খুঁজে পাবে তোমার কাজের মধ্যে। তোমার সব সৈন্যই অব্যবহৃত রয়ে গেল অথচ যুদ্ধের ফয়সালা হয়ে গেল, এই কথাটা একবার গভীর ভাবে ভেবে দেখো। ভেবে দেখো তোমার হারেম এখন নাদির শাহের আওতায়। এটা তো পুরুষত্বের ওপর প্রচণ্ডতম আঘাত। এই আঘাতে নাকি ক্লীবও

জেগে ওঠে।

বাদশাহ্ হাত উঁচিয়ে বলে ওঠেন— বাস ব্যস। যথেষ্ট হয়েছে। আমি একটু বিশ্রাম করতে চললাম।

বাদশাহ যখন নিজের শয্যার দিকে চলতে থাকেন, তখন রজনীর মধ্যপ্রহর।

পরদিন একটু বেলাতে নিদ্রাভঙ্গ হয় শাহানশাহের। নিদ্রাভঙ্গ ঠিক বলা যায় না, বেগমসাহেবা এসে তাঁকে জাগিয়ে দেন।

— কি হল?

— উজির কামরুদ্দিন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন।

— এখন? নতুন আবার কি হল?

বিরক্ত বেগমসাহেবা বলেন— এখন তো প্রতি মুহূর্তে নতুন কিছুর আশঙ্কায় তোমার সজাগ থাকা উচিত।

— এই বয়সে উচিত-অনুচিত শিখব তোমার কাছে?

বেগম সাহেবার মেজাজও তিরিক্ষি। তিনি বলেন— আসল সময়ে শিখলে তো ভালই হত। এখন দেরি হয়ে গিয়েছে। দেরিতে শিখলেও কিছুটা লাভ হতে পারে বৈকি।

— আমার এই দুঃসময়ে তোমার ব্যবহারও পালটে গেল!

— দুঃসময় যদি ভাবতে , তাহলে এমন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন থাকতে না। নিদ্রাভঙ্গেও বিরক্ত হতে না।

এতক্ষণে বাদশাহের হৃদয়ঙ্গম হয় যে সারা দুনিয়া এখন তাঁর বিপক্ষে। তিনি একা। তাই প্রস্তুত হয়ে কামরুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

উজিরের মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। সে বলে— গমের মূল্য আরও বেড়েছে। ওদিকে নাদির শাহের ওখানে যে যত খুশি গম নিচ্ছে টাকায় বারো সের। সবার মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। একে তো আমরা পরাজিত, এর মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে কী যে হবে, বলা মুশকিল।

সাধারণত শান্ত প্রকৃতির বাদশাহ্ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন— ব্যবসায়ীদের গুদাম লুঠ করতে বলুন।

— লুঠ?

— হ্যাঁ লুঠ। অনেক সহ্য করেছি, আর নয়।

— কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?

— হবে । এতদিন ধরে তো সবার পরামর্শ শুনলাম। শুনে শুনে এই অবস্থায় পৌঁছেছি। এবার একটু নিজের মত চলে দেখি। সিপাহী পাঠান।

কামরুদ্দিন বাইরে বের হয়ে শাহানশাহের হুকুম একজনকে শুনিয়ে দিয়ে ফিরে আসে একটু বিমর্ষ চিত্তে। এই দুঃসময়ে যখন শাহানশাহের অপদার্থতার প্রমাণ পেয়ে গিয়েছে সাধারণ মানুষ, তখন এই ধরনের হঠকারিতার ফলাফল যে কি হবে ভেবে উঠতে পারে না সে।

ফিরে আসতেই বাদশাহ প্রশ্ন করেন— মাঝে মাঝে কি রকম একটা পচা গন্ধ পাচ্ছি।

— আপনি যদি খোদাবন্দ বাইরের আকাশের দিকে তাকান তাহলে দেখবেন শকুনে

আকাশ ছেয়ে ফেলেছে।

— এত শকুন ? কেন ?

— যুদ্ধে যারা মরে গিয়েছে, তাদের লাশ পড়ে রয়েছে সেইভাবে। তার জন্যে শকুন, তার জন্যে দুর্গন্ধ।

— এখনো পড়ে রয়েছে ? ব্যবস্থা করুন। মুর্দাফরাশ পাঠান। ওগুলো মাটি চাপা দিক।

— আজকেই পাঠাব।

— নাদির শাহের সিপাহীরা তো মরেছিল। তাদের লাশও গোর দিয়ে দিক একই সঙ্গে।

— তাদের একটা লাশও পড়ে নেই।

— কেন? কোথায় গেল?

— আমাদের চেয়ে তাদের অনেক কম মরেছিল। যারা মরেছিল তাদের সেই দিনই তুলে নিয়ে গিয়ে কবর দেওয়া হয়েছে। যারা আহত হয়েছিল, তাদের উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

— আমাদেরও তো অনেকে আহত হয়েছিল। তাদের কি হল?

কামরুদ্দিন উত্তরটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু বাদশাহ্ আবার প্রশ্ন করেন। নিরুপায় উজির তখন বলে— আমাদের যারা আহত হয়েছিল, তাদের প্রায় সবারই মৃত্যু হয়েছে। অল্প যে কয়জন হাঁটতে পেরেছে, তারা নিজের চেষ্টায় ফিরে এসেছে শিবিরে। আর যারা হাঁটতে পারেনি, যাদের আঘাত গুরুতর তারা শুনলাম দীর্ঘক্ষণ ধরে ছটফট করতে করতে জল চাইতে চাইতে শেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

— এ আপনি কী শোনাচ্ছেন উজির? আমি বাদশাহ্ মহম্মদ শাহ্ নিজে উপস্থিত যুদ্ধক্ষেত্রে, আর আমার আহত সিপাহীরা মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মরে গেল? এতে কি প্রমাণিত হয় কামরুদ্দিন খাঁ?

— যা প্রমাণিত হয় তার দায় শুধু আপনার নয় মেহেরবান।

— স্তোকবাক্যে আমাকে ভুলিয়ে লাভ নেই উজির। আমি অপদার্থ হতে পারি, কিন্তু অতটা বুদ্ধিহীন নই।

কামরুদ্দিন খাঁ মাথা নীচু করে থাকে।

উমদেন্নেসা প্রথমে কারনালে আসবে বলেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সঙ্গে আসেনি। কেন যেন তার মনে হয়েছিল যুদ্ধে পরাজয় অনিবার্য। তবে সে সঙ্গে আসেনি বলে বিন্দুমাত্র আফসোস নেই শাহজাদা সুলতান আহমেদের। প্রথম সাদির পরে যে এক-আধ বছর মোহ থাকে, সেই মোহ কবে কেটে গিয়েছে। উমদেন্নেসা পরমাসুন্দরী নয়। তবে একেবারে অসুন্দরও নয়। কিন্তু সেজন্য নয়। মোগলদের হারেমে অসুন্দর বলতে তো একজনও নেই। কেউ বেশি সুন্দরী, কেউ একটু কম। তাই সৌন্দর্যের প্রতি শাহাজাদার আকর্ষণ খুব একটা বেশি নেই। খুরশিদাকে রেখে এসেছে দিল্লীতে। সে সুন্দরী সন্দেহ নেই। তবে তার প্রতি আকর্ষণ সৌন্দর্যের জন্য নয়। তার দেহ-সৌষ্ঠব অনন্যসাধারণ। হারেমে অমন একটিও নেই। কারও হারেমেই

নেই। দীর্ঘাঙ্গী, অথচ কটিদেশ জড়িয়ে ধরলেই শূন্যে উঠে আসে। মনে হয় বুঝি ওজন নেই। সব চেয়ে আকর্ষণ তার অতি মিষ্টি কথায়। ওর মা বিখ্যাত গায়িকা বলেই হয়ত কণ্ঠস্বরে একটা সুর একটা ঝংকার রয়েছে বলে মনে হয়। আবিষ্ট করার মত কণ্ঠস্বর। তাছাড়া মায়ের কাছে ওর সঙ্গীতের শিক্ষা। হারেমে খুঁজলে এমনটি একটিও পাওয়া যাবে না। হারেমের ওরা শুধু সৌন্দর্য নিয়ে বসে থাকুক। আবার এদিকে ফুলজান? সে আর এক ধরনের আকর্ষণ। তাকে কি কেউ সুন্দর বলবে? সুন্দর হলে বাঁদী হয় না। বাঁদী হলেও বেশিদিন বাঁদী থাকে না। কিন্তু ফুলজান কুলসুমের মত বাঁদীই থেকে যাবে। অথচ তাকে দেখলেই তীব্র আকর্ষণ অনুভূত হয়। সত্যিই সে বন্য। সে তার বন্য যৌবন নিয়ে উদ্ধত ভাবে যেন যৌন-যুদ্ধে আহ্বান করে। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে একটা নতুনত্ব রয়েছে, যার আস্বাদন হারেমের পরমাসুন্দরী বেগমরাও দিতে পারবে না।

কিন্তু এতসব ভেবে লাভ কি হবে? ওদিকে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা তো শোচনীয়। মোগল বাদশাহ পরাজিত। নেহাত মোগল বাদশাহ বলেই নাদির শাহ বিশেষ কিছু করতে সাহসী হচ্ছে না। কাবুল থেকে লাহোর অবধি তো বলতে গেলে হত্যা ধর্ষণ আর দগ্ধ করে এগিয়ে এসেছে। এখানে এসে থেমেছে। একটা রফাও হয়ে গিয়েছে। কিছু টাকা নিয়ে বিদায় হবে। নাদির শাহ ভেবেছে যথেষ্ট নিয়েছে। তার ধারণা নেই এই যুদ্ধক্ষেত্রেই মোগল পক্ষের আমির ওমরাহদের হারেমে যে হীরা মণি মাণিক্য রয়েছে সারা পারস্যে তা নেই। দিল্লীর কথা তো স্বতন্ত্র। লোকটা কোনরকমে বিদায় নিলে বাঁচা যায়।

মায়ের কাছে গিয়ে সে ফুলজানের সঙ্গে গোপনে কথা বলেছে। ফুলজানকে খুব মরিয়া বলে মনে হল। ঘেমে নেয়ে সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে — আজ আমি যাবই আপনার কাছে। যেতেই হবে।

— কি করে যাবে?

— সিপাহীর পোশাকটা আছে এখনো।

— ঠিক আছে।

শাহজাদা লক্ষ্য করেছে ফুলজান যখন উত্তেজিত হয় তখন তার গা থেকে সোঁদা একটা অদ্ভুত গন্ধ বের হয়। থাকতে না পেরে আতর ছিটিয়ে দিলেও সেই সুঘ্রাণ ভেদ করে আবার উদ্ভট গন্ধটা বেরিয়ে আসে। তারা সাবা দেহ থেকে যেন ভাপ বের হয়। একটা যেন আস্ত শিক্-কাবাব।

রাতে ঠিক এল ফুলজান। এসেই চটপট সিপাহীর পোশাক খুলে ফেলে শয্যার কাছে গিয়ে একটু হেসে বলে— বসব?

— বস।

-- না, বাঁদী তো শত হলেও। শাহাজাদার শয্যায় বসতে ভয় হয়।

— অপ্রাসঙ্গিক কথা বলো না।

— আচ্ছা, বেগম সাহেবাকে আনলেন না কেন?

— ও কথায় তোমার দরকার কি?

— আমি জানি।

— কি জান?

— ওঁকে পছন্দ হয় না। আমার মত গায়ে গতরে হলে খুব পছন্দ, তাই না ?

— আঃ কী বলছ ? ও নিজে থেকেই আসেনি।

ফুলজান সেকথা কানে না নিয়ে বলে— কিংবা খুরশিদার মত, হালকা পরী। ফুঁ দিলে উড়ে যাবে।

— খুরশিদাকে তুমি সত্যিই চেনো?

— চিনব না? সবাই চেনে। লুকিয়ে লুকিয়ে একবার করে দেখে এসেছে হারেমের সব বাঁদী। এমন কি খোজারাও। আজ কিন্তু আমি বেশিক্ষণ থাকব না।

— কেন?

— একজন লোক বেগম সাহেবার শিবির থেকে আমার পেছনে পেছনে আসছিল।

— দেখে ফেলেছে?

— দেখুক না, আমি তো মেয়ে নই। আমি সিপাই।

— কিন্তু আমার এখানে ঢুকতে দেখেছে তো।

— তা দেখেছে। তাতে কি হল?

— সে তোমার পেছনে পেছনে আবার বেগম সাহেবার শিবির অবধি যেতে পারে।

— যাক্। মা কি ছেলের কাছে কাউকে পাঠাতে পারে না?

— পারে। তবে মালিকা-আল-জুমানির শিবিরে একজনও পুরুষ নেই। এমনকি খোজাও নেই।

কথাটা শুনে ফুলজানের দেহের উত্তাপ সহসা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাষ্প বিকিরণও যেন হ্রাস পায়। সে কিছু বুঝতে না পেরে শাহজাদার কণ্ঠলগ্না হয়। তার দেহের ভারে শাহজাদা হুমড়ি খেয়ে তারই দেহের ওপর পড়ে।

সে একবার বলে ওঠে— কি হবে? পরক্ষণেই আবার বলে— যা হয় হোক গে।

অন্ধকার থাকতেই সে তাড়াতাড়ি সিপাহীর পোশাক পরে নিয়ে শাহাজাদাকে করুণ কণ্ঠে বলে— আবার আসব।

— এসো।

দুপা এগিয়ে ফুলজান ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে— আমাকে দুপা দিয়ে দলে পিষে মেরে ফেলতে পারেন?

বিস্মিত শাহজাদা বলে— এই সখ কেন?

দ্রুত বেরিয়ে যেতে যেতে সে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলে যায়— বুঝবেন না। শাহজাদা হলেও আপনি পুরুষ মানুষ।

বাইরে অন্ধকার। সেই সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকা লাশের দুর্গন্ধ আরও বিকট। শাহানশাহের নির্দেশে একটা বড় মুর্দাফরাশের দল গিয়েছিল কোদাল নিয়ে। দায়সারা কাজ করে চলে এসেছে। কোন রকমে বিক্ষিপ্তভাবে গর্ত খুঁড়ে লাশগুলো ফেলে মাটি ছড়িয়ে দিয়ে

চলে এসেছে। রাতের বেলায় শেয়াল কুকুর সেগুলোকে আবার বাইরে টেনে টেনে বের করছে। ভোর হতে না হতে আবার শকুন উড়বে। তত্ত্বাবধানের কেউ নেই। মুর্দাফরাশরা ফাঁকি দিল কি না কেউ দেখল না। কিংবা পরে ফাঁকি ধরা পড়লে চরমতম শাস্তি পাবে, সেই ভয়ও নেই।

ফুলজান শাহাজাদার ওখান থেকে বেরিয়ে কিছুদূর যেতেই একজন অন্ধকারের মধ্যে সজোরে তার হাত চেপে ধরে।

— কে?

লোকটা চাপা হাসি হেসে বলে— মেয়েলী কণ্ঠে আমি অবাক হইনি কিন্তু। গোড়া থেকেই জানতাম।

লোকটার লম্বা চওড়া চেহারা দেখে যতটা না ভয় পেল তার চেয়েও বিস্মিত হল তার কণ্ঠস্বরে। এই কণ্ঠস্বর সে কোথায় যেন শুনেছে।

— ছেড়ে দাও।

— না। আমার সঙ্গে চল।

— আমি বেগমসাহেবার লোক। চিৎকার করব। গর্দান যাবে তোমার।

— তোকে আজ ছাড়ছি না। আজ পুরোপুরি উসুল করব। আগে ফাঁকি দিয়েছিলি। চল।

তাকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে যায় লোকটি।

—ছাড়ো। ছাড়ো বলছি।

— চিৎকার কর। সিপাহীব বেশ ধরে নাদির শাহের গুপ্তচরগিরি করছিস।

— কে তুমি?

— এখনো চিনলি না? তুই নালিশ করেছিলি বলে গ্রামের সব কটা লোক মিলে আমাকে পিটিয়েছিল। ভুলে গেলি? আমি মোজাহার।

— মোজাহার! কিন্তু আমি নালিশ করিনি। সত্যি বলছি।

— এমনিতে মারল বলতে চাস।

— হ্যাঁ।

— বিশ্বাস করি না, চল।

পরদিন সকালে ধর্ষিতা এবং মৃতা এক ছদ্মবেশী নারীর ক্ষতবিক্ষত দেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল। মালিকা-আল-জুমানি দেখলেন তাঁর বাঁদীদের একজনকে পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর প্রকৃত খবর তাঁব কানে পৌঁছোতে দেরি হল না। তিন ভ্রূ কুঁচকে ভাবলেন. অন্যগুলোর দিকে একটু নজর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। উমদেন্নেসা এতটুকুও জোর করতে পারে না। সে যদি বুদ্ধি করে চলে আসত তাহলে এই সব ঝুট-ঝামেলা এড়ানো যেত। কী যে তার আত্মসম্ভ্রম। তাও তো সুলতান আহমেদ তার হারেমে নতুন কাউকে আনেনি। যা কিছু বাইরে বাইরে। একদিক দিয়ে তা তো ভালই বলতে হবে।

বেগম সাহেবা হাতের তালি বাজান। একজন বয়স্ক বাঁদী এসে দাঁড়ায়।

— অঙ্গুরিকে ডেকে দাও।

বাঁদীদের মধ্যে অঙ্গুরিকে দেখতে সবচেয়ে ভাল। তবে শাহাজাদার দৃষ্টি এড়িয়ে চলেছে। কারনালে রওনা হওয়ার আগে তাকে নিয়োগ করা হয়েছে। নতুন বাঁদী।

অঙ্গুরি এসে অভিবাদন জানায়।

বেগম সাহেবা তার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বলে— ফুলজান কোথায় জান?

মেয়েটি কেঁপে ওঠে। বলে— আমি কিছু জানি না।

— সেকথা বলছি না। ফুলজানের কি হয়েছে খবর রাখো?

— শুনলাম বেগম সাহেবা।

— তোমারও সেই দশা হবে।

আঁৎকে ওঠে অঙ্গুরি — না।

— তাহলে সাবধানে থাকতে হবে।

—থাকব।

— কেউ মিশতে চাইলেও মিশবে না।

— মিশব না।

— বুঝতে পেরেছ? আসল কথাটা বুঝেছ?

— বুঝেছি বেগম সাহেবা। সেই সময় আমি পালিয়ে যাব আপনার কাছ থেকে।

— ঠিক আছে। যাও।

মোগল দরবার বসে ছাউনিতে। সবাই রয়েছে। নিজামুল মুলকও রয়েছে। খান দউরানের অভাব অনুভূত হচ্ছে। তার মৃত্যুর পরে দুটি পদ শূন্য পড়ে রয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ পদ দুটি ফেলে রাখা যায় না। তাই নির্বাচিত ব্যক্তিকে পদ দুটিতে নিযুক্ত করতে হবে। তারই জন্য দরবার। এই সব বিষয়ে সাদাত খাযের আগ্রহ খুব বেশি। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে অনুপস্থিত। তার জন্যে অপেক্ষা করার পর বাদশাহ্ বলেন— এবারে শুরু করা যাক।

সবাই আলোচনা শুরু করে। এক এক করে অনেকের নাম ওঠে। কেউ নিজে থেকে নিতে অস্বীকার করে। কারও নিযুক্তিতে বাদশাহের সায় থাকে না। অবশেষে নিজামুল মুল্‌কের নাম ওঠে। প্রথমেই তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় সে রাজি কি না। নিজামের আপত্তি নেই। অনেক আলোচনার পরে দেখা যায় নিজামই আপাতত যোগ্যতম ব্যক্তি যাকে দুটো পদই দেওয়া যেতে পারে। সাদাত খাঁযের অনুপস্থিতির জন্য তার কথা কারও মনেও পড়ল না। তাছাড়া তার ওপর অনেকে রীতিমত বিরূপ। প্রথমত, সে নাদির শাহের দেশের লোক। তাঁর সঙ্গে সম্প্রতি মেলামেশাও বেশি। তাছাড়া প্রথম দিনে সর্বপ্রথম সে-ই তাড়াহুড়ো করে নাদির শাহের বাহিনীকে আক্রমণ করল এবং সমস্ত সেনা এবং মালপত্র সমেত অবরুদ্ধ হল ওদের হাতে। অদ্ভুত অবিশ্বাস্য শোনায়। তারপর নাকি নাদির শাহের নির্দেশে সেখানেই সে তার লোকলস্কর সমেত তাঁবু খাটিয়েছে। অনেকে তার ওপর ভরসা করতে পারে না। এমনকি তাদের অহরহ গুঞ্জনে বাদশাহের বিশ্বাসের ভিতেও ফাটল ধরেছে।

নিজামুল মুল্‌ককে করা হল খান দউরানের মতই একাধারে মীর বক্‌সী এবং আমির উল-

উমর। আর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সাদাত খাঁ হন্তদন্ত হয়ে ছাউনিতে প্রবেশ করে শাহানশাহকে মোগলী কেতায় অভিবাদন জানায়।

বাদশাহ অস্বস্তি বোধ করেন। বলেন— আপনার এত দেরি হল? আপনার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছিলাম।

— একটু দেরি হয়ে গেল। নাদির শাহ হঠাৎ ডেকে পাঠিয়েছিলেন। যা হোক, শেষ পর্যন্ত এসে পড়েছি।

কামরুদ্দিন বলে— কিন্তু দরবার তো এখন শেষ হয়ে যাবে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে।

— নেওয়া হয়ে গিয়েছে? আমার অনুপস্থিতিতে?

— হ্যাঁ।

— কি সিদ্ধান্ত হল?

— অনেক আলোচনার পর খান দউরানের পদ দুটি আপাতত কিছুদিন নিজামুল মুলকের ওপর ন্যস্ত হল।

সাদাত খাঁ ক্রোধে কাঁপতে থাকে। সেই কম্পন দৃশ্যমান। সবাই জানে মীর বক্‌শীর পদের ওপর তার চিরকালের দৃষ্টি। বাদশাহও সেকথা জানতেন। তবু আজ তিনিও যেন তার প্রসঙ্গ ইচ্ছা করে এড়িয়ে গেলেন।

সাদাত খাঁ বিদ্রূপের স্বরে বলে ওঠে— ও, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে। তবে আর এখানে থেকে কি হবে।

বাদশাহকে অভিবাদন না জানিয়ে, তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত না করেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে যাওয়াব জন্য প্রস্তুত হতেই সিরবুলিন্দ খাঁ বলে ওঠে— বাদশাহ রয়েছেন।

— ও।

সাদাত খাঁ একটু ঘুবে দাঁড়িয়ে দায়সারা কুর্নিশ করে নিষ্ক্রান্ত হন।

দরবারে সবার ভ্রু-কুঁচকে ওঠে। ঔদ্ধত্যের একটা সীমা রয়েছে। ভেবেছে কি সাদাত খাঁ? হিন্দুস্থান নাদির শাহের অধীনে চলে গিয়েছে?

সাদাত খাঁয়ের কিন্তু তাই ধারণা। সে ছুটতে ছুটতে গিয়ে সোজা নাদির শাহের শিবিরে প্রবেশ করে। পথটুকু অশ্বে এলেও শীতের মধ্যাহ্নে সে ঘর্ম-সিক্ত, ক্রোধে ও উত্তেজনায়।

নাদির শাহ তাকে এইভাবে প্রবেশ করতে দেখে, ইশারায় তাঁর দেহরক্ষীদের বলেন, সাদাতের গতি রুদ্ধ করতে। মুহূর্তে তারা অস্ত্র নিয়ে সাদাত খাঁকে ঘিবে ফেলে।

— এ কি! আমি শাহের কাছে গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে যাচ্ছি।

— এভাবে দেখা করার হুকুম নেই। আপনি আগে অনুমতি নিয়েছেন?

সেই সময় নাদির শাহ উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন— ছেড়ে দাও। মোগল দরবারের ঢিলেঢালা ব্যবস্থা দেখে উনি ভেবেছিলেন এখানেও বোধহয় ওসব চলবে। ছেড়ে দাও। ভবিষ্যতে এভাবে এলে কোতল করবে। চিনে রাখো।

এই অপমান সাদাত খাঁ গায়েও মাখল না। সে নাদির শাহের সম্মুখে এসে অভিবাদন

করে বলে— আপনাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। এই মুহূর্তে বললে আপনারই সুবিধা। তবে আপনার অসুবিধা হলে আমি পরে আসতে পারি।

— না, না অসুবিধা হবে কেন? তাছাড়া আপনি বলতে গেলে আমার অতিথি। একই দেশের মানুষ। এটুকু অগ্রাধিকার আপনার প্রাপ্য।

— নিজামুল মুল্‌ক আপনাকে ঠকিয়েছে। দিল্লীর ঐশ্বর্য সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা নেই বলেই ঠকাতে পেরেছেন। সামান্য কিছু অর্থ দিয়ে আপনাকে এখান থেকে বিদায় করার ব্যবস্থা করেছে।

নাদির শাহ একটু ঝুঁকে পড়ে বলেন— তাই নাকি! বেশ মজার ব্যাপার তো। একটু খুলে বলুন।

— আপনি বাদশাহকে হুকুম করুন যুদ্ধক্ষেত্রে আমির ওমরাহ্ আর তার বেগমদের যাবতীয় হীরে জহরত যা রয়েছে সব এনে আপনার কাছে জমা দিক— দেখবেন কী বিপুল তার পরিমাণ। আপনি জীবনে দেখেননি। এতো সামান্য অংশ। দিল্লীর কথা ছেড়েই দিলাম।

— হুঁ। আপনি সৎপরামর্শ দিয়েছেন। আপনার কথা মনে রাখার চেষ্টা করব। আজই শাহানশাহের কাছে ফরমান পাঠাচ্ছি। সন্ধ্যার আগে সমস্ত দামী মণি মাণিক্য জমা দেওয়ার জন্য।

সেইদিন মধ্যাহ্নের পর থেকে সায়াহ্ন পর্যন্ত ওমরাহদের হারেমে শুধু কান্নাকাটি আর হাহাকার। তাদের কত সাধের অলঙ্কার, কয়েক পুরুষের হীরা, সব কিছু খুলে খুলে দিতে হল। ওমরাহেরাই বেগমদের কাছ থেকে সেগুলো হাত পেতে নিল। নেওয়ার সময় তাদের মুখের দিকে চাইতে পর্যন্ত পারল না। তাদের মানসিক অবস্থা তারা বুঝতে পারে। নিজেরাও মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত। অপমানের তীব্র জ্বালার সঙ্গে আভিজাত্য খোয়ানোর শোক তাদের অন্তর ভারী করে তুলেছে। তারই চূড়ান্ত পরিণতি রইস খাঁয়ের তরুণী বেগমের আত্মহত্যা। হীরক-চূর্ণ গলাধঃকরণ করে সে দুঃসহ অন্তর্জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পেল।

সারা ছাউনিতে বিষাদের ছায়া। কেউ কারও মুখের দিকে চাইতে পারে না। সাদাত খাঁ ঠিকই অনুমান করেছে। হিন্দুস্থানের প্রকৃত মালিক নাদির শাহ। বাদশাহ্ তাঁর হাতের পুতুল মাত্র। সেটা আরও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হল সন্ধ্যার পরে নাদির শাহের শেষ নির্দেশে। বাদশাহকে তিনি পরদিন পূর্বাহ্নে ওমরাহ-সহ তাঁর শিবিরে ডেকে পাঠিয়েছেন। এই হুকুম অমান্য করার সাধ্য হিন্দুস্থানের শাহানশাহের নেই। কারণ এই শেষ নির্দেশের সঙ্গে বাদশাহের ছাউনির চতুর্দিকে নাদির শাহের সিপাহীদের দেখা গেল। তারা সমগ্র এলাকাটি কার্যত ঘিরে ফেলেছে। অর্থাৎ বাদশাহ্ তাঁর হারেম সমেত কার্যত নাদির শাহের বন্দী।

ওমরাহদের কয়েকজনের প্রাণের মায়া বড় বেশি। তারা মরতে ভয় পায়। কিন্তু কিছু সাধারণ সিপাহী এবং কিছু নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী আত্মহত্যা করল। তারা সইতে পারল না। তারা নিজেরা তেমন সম্মানীয় ব্যক্তি নয় বলে, বাদশাহের সম্মানকে নিজেদের সম্মান বলে মনে করত। এর জন্য কত গর্ববোধ ছিল তাদের। সেখানে প্রচণ্ডতম আঘাত পেল তারা।

সন্ধ্যায় দরবার খালি। বাদশাহ সবাইকে ডেকে বললেন— আমার সামনে এখন তিনটি

পথ খোলা রয়েছে। প্রথমটি হল, একবার শেষ চেষ্টা করা। সমস্ত শক্তি একত্রিত করে নাদির শাহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া।

একজন বলে— কিন্তু সেই চেষ্টা করার উপায় নেই। ওরা কার্যত আমাদের ঘিরে রেখেছে। সিপাহীরা নিজেরাও যদি চেষ্টা করে তাহলেও পারবে না। ওদের নিয়ন্ত্রিত করার মত কেউ নেই।

— দ্বিতীয় পথ হল এই চূড়ান্ত অপমান থেকে নিষ্কৃতি পেতে বিষপান করা।

কামরুদ্দিন বলে— তাতে আপনি ব্যক্তিগত ভাবে বেঁচে যেতে পারেন, কিন্তু হিন্দুস্থান তাতে বাঁচবে না। যারা বেঁচে থাকবে তাদের সব সইতে হবে।

হতাশ বাদশাহ বলেন— তাহলে নিঃসর্ত আত্মসমর্পণ!

সবাই নীরব থাকে। এই কথার উত্তর তাদের জানা নেই। কিংবা খুব ভাল ভাবে জানা আছে।

বাদশাহ বলেন— আমরা তাহলে আগামী কাল পূর্বাহ্নে নাদির শাহের শিবিরে যাচ্ছি।

এবারও কেউ কোন উত্তর দেয় না। এই নীরবতার মধ্যেই দরবার শেষ হয়। এবং নীরবতার মধ্যেই সবাই বুঝে ফেলে কোন্ সিদ্ধান্তে তারা এল শেষ পর্যন্ত।

পরদিন নাদির শাহের শিবিরে রাজকীয় শকটে উপস্থিত হলে নাদির শাহ নিজে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর আবদুল বাকি খাঁকে বাদশাহের সামনেই তাঁর তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন।

মৃদু হেসে বাদশাহ বলেন— আলোচনার পরেই তো চলে যাব। আমার সঙ্গে যারা রয়েছে তারাই সব দেখাশোনা করতে পারবে।

— না না, আপনার জন্যে ওই যে সুন্দর শিবির স্থাপন করেছি। আমারটির চেয়েও ওটা দেখতে সুন্দর। আপনি হিন্দুস্থানের বাদশাহ, আপনার থাকার জায়গা সব চেয়ে যাতে ভাল হয় তার ত্রুটি রাখিনি। আপনিই দেখুন।

বাদশাহের মাথাটা একটু ঘুরে ওঠে মুহূর্তের জন্য। তিনি সামলে নিয়ে বলেন— আপনার আতিথ্য না হয় গ্রহণ করলাম দু' একদিনের জন্য। কিন্তু বেগমরা রয়েছেন শাহাজাদা রয়েছে— তারা ব্যস্ত হয়ে উঠবে।

— একটুও ভাববেন না। সবাইকে এখানে আনতে পাঠাচ্ছি। থাকুন না দুচারদিন। খুব খারাপ লাগবে না। এখানে যে যত খুশি গম নিতে পারে। গোস্তও সস্তা। নিজের চোখে দেখবেন সব। আপনার ওখানে শুনলাম সব কিছু আক্রা।

বাদশাহ দেখেন তাঁর ওমরাহদের মুখ কালো হয়ে গিয়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি নাদির শাহকে বলেন— আপনি তো অনেক সম্পদ পেয়েছেন আমির ওমরাহদের কাছ থেকে। এবারে আপনি দেশে ফিরে যেতে পারেন।

— দেশে ? এখনি ? দিল্লী যাব তো।

আঁৎকে ওঠে আমির ওমরাহেরা। খান দউরানের দুটি সাবধানবাণীর একটি অবহেলা করে

চূড়ান্ত দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়েছে। এবারে দ্বিতীয়টি পালন না করতে পারলে নির্ঘাত ভরাডুবি হবে। তিনি বলেছিলেন, নাদিরশাহকে কখনো যেন দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া না হয়। কোন অবস্থাতেই নয়।

উজির কামরুদ্দিন বলে— নিজামুল মুলক্ -এর সঙ্গে আপনার যে চুক্তি হয়েছিল তাতে তো দিল্লীতে যাওয়ার কথাই ছিল না।

নাদির শাহ একটু রূঢ়স্বরে বলেন— ছিল না। তবে এখন থাকবে। আমি বাদশাহের সঙ্গে দিল্লী যাচ্ছি। এখান থেকে আপনারা সবাই রওনা হবেন। একসঙ্গে যান।

সিরবুলিন্দ খাঁ বলে ওঠে— আমাদের লোকজন?

— সব ব্যবস্থা হবে। আপনারা একটু বসুন, আমি আসছি।

নাদির শাহ বাইরে এসে তাঁর তোপচি বকশী এবং নিসিখচি বকশীকে ডাকলেন। তাদের হুকুম দেন— তোমরা কিজিলবাশ বাহিনী নিয়ে এই মুহূর্তে বাদশাহের শিবিরে যাও। সেখানে প্রথমেই বেগম মালিকা-আল-জুমানি এবং শাহাজাদাকে বাঁদী আর খোজা সমেত এখানে পাঠিয়ে দেবে। অন্যান্য বেগমদেরও নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবে। যখন দেখবে কোন আমির ওমরাহের বেগমও বাকি নেই, সবাই চলে এসেছে, তখন ওখানকার কামান বারুদ সব দখল করবে। হাতি ঘোড়া সব কিছু নিয়ে নেবে। বাকি যে সব জিনিসপত্র পড়ে থাকবে লুঠ করে নেবে। বাদশাহের-সৈন্যরা বাধা দিতে পারে। তাই সব চেয়ে আগে তাদের কাবু করবে। তাদের বলে দেবে তারা যেন নিজের নিজের গ্রামে ফিরে যায়। এখানে তাদের কাজ ফুরিয়েছে।

নাদির শাহ কিছুক্ষণ পরে এসে বাদশাহের পাশে বসেন।

বাদশাহ বলেন— আমার ছাউনির জন্য একটু চিন্তিত আছি।

—সব চিন্তা দূর হয়ে যাবে। আপনার বেগম শাহজাদা সবাই অপরাহ্নের মধ্যেই এখানে পৌঁছে যাবেন।

এবারে বাদশাহ উঠে দাঁড়ান। — তার অর্থ? ওরা সবাই আপনার বন্দী? আমি আপনার বন্দী?

গম্ভীর হয়ে নাদির শাহ বলেন— আমি তো একবারও বলিনি যে আপনি বন্দী। আপনি আমার অতিথি। আপনার পরিবারও আমার অতিথি।

সিরবুলিন্দ খাঁ উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে ওঠে— আর আমাদের পরিবার?

— আপনারা সবাই দিল্লীতে গিয়ে পুনর্মিলিত হবেন। মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র সংশয় রাখবেন না। সেখানে গিয়ে আনন্দ করবেন।

বাদশাহ বলেন — কিন্তু আমার বাহিনী? কামান?

— আপনার কামান বারুদ আমি আমার কাছে রেখেছি। আপনার বাহিনীর লোকেরা এতক্ষণে বোধহয় তাদের প্রিয়জনের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য রওনা হয়ে গিয়েছে।

বাদশাহ এবং আমির ওমরাহেরা সবাই স্তব্ধ হয়ে যান।

ইতিহাসে বিধৃত রয়েছে যে এরপর নাদির শাহ দিল্লী অভিমুখে রওনা হওয়ার আগে

সাদাত খাঁকে তাঁর ওয়াকিলুল-মতুলাক নিযুক্ত করে তার সঙ্গে তমাস খাঁ জালাইয়ারকে চারহাজার অশ্বারোহী সহ অগ্রগামী দল রূপে দিল্লীতে প্রেরণ করেন। ওদিকে দিল্লীতে কারনাল যুদ্ধক্ষেত্রের সর্বনাশা পরাজয়ের খবর পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার শাসনকর্তা লুৎফুল্লা খাঁ স্থির করল প্রবল প্রতিরোধের সৃষ্টি করবে। কারনালে যে ঘটনাই ঘটুক না কেন, দিল্লীর ইজ্জত শেষ পর্যন্ত সে রক্ষা করে যাবে। তাই দিল্লী প্রবেশের প্রধান ফটক তার হুকুমে বন্ধ হয়ে গেল এবং কড়া প্রহারার ব্যবস্থা হল। ওদিকে দিল্লীর পারদর্শী এবং অভিজ্ঞ কোতোয়াল হাজি ফুলাদ খাঁ এমন সব ব্যবস্থা নিল যাতে নগরবাসী আতঙ্কগ্রস্ত না হয়ে পড়ে এবং কোনরকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয়।

কিন্তু এত প্রচেষ্টা, এত আয়োজন সব কিছু বিফলে গেল। কারণ বিশ্বাসঘাতক সাদাত খাঁ দিল্লী বিষয়ে খুঁটিনাটি সব কিছু নাদির শাহের কানে তুলে দিয়েছিল। সে বলেছিল, দিল্লীতে গিয়েই আসফ জাহ্‌কে কব্জা করতে হবে। কারণ তার কাছেই তোষাখানা এবং কোষাগারের চাবি রয়েছে। সে একাধারে যাদুকর এবং দার্শনিক। তাছাড়া প্রশাসক লুৎফুল্লা খাঁ অত্যন্ত সৎ এবং বিশ্বাসী। স্বয়ং শাহানশাহের সিক্কা ব্যতীত সে কখনই দিল্লীতে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। সে অনুমতি না দিলে দিল্লী অবরোধ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। ফলে রক্তপাত এবং সময়ের অপব্যয়।

নাদির খাঁ বাদশাহকে সিক্কার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন এবং নিজেও হুকুম দিলেন তোষাখানা এবং কোষাগারের চাবি দিয়ে দেওয়ার জন্য।

সাদাত খাঁ দিল্লী এসে দেখল প্রধান ফটক যথারীতি বন্ধ। সে তখন লুৎফুল্লা খাঁকে শাহানশাহের সিক্কা দেখাল। লুৎফুল্লা সব বুঝতে পেরেও সাদাত খাঁকে চাবি সমর্পণ করে। সে একবার আড়চোখে সাদাত খাঁয়ের উৎফুল্ল মুখের দিকে চেয়ে তার আনন্দের মর্মার্থ বুঝতে পারে। ক্রোধে ঘৃণায় তার বাকরুদ্ধ হয়। সেই সময় তমাস খাঁ নাদিরের লিখিত নির্দেশ লুৎফুল্লা খাঁয়ের হাতে দেয়। তাতে উল্লিখিত ছিল যে লুৎফুল্লা খাঁ দিল্লীর প্রশাসক হিসাবে বহাল রইল এবং হাজি ফুলাদ খাঁ কোতোয়াল রূপে তার কাজ চালিয়ে যাবে। লুৎফুল্লার মনে হল সে বোধহয় কোন দুঃস্বপ্ন দেখছে। হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র অধিপতিকে ছাপিয়ে একজন বিদেশী এইদেশের রাজধানীর প্রশাসনের নোকরি বহাল রাখার নির্দেশ দিচ্ছে! মৃত্যুর চেয়েও এ যন্ত্রণাদায়ক। তবু সহ্য করতে হচ্ছে। কারণ ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। বাদশাহ কোথায় কি অবস্থায় রয়েছেন সেই খবর জানারও কোন উপায় নেই।

কারনাল থেকে নাদির শাহ রওনা হলেন ভোরবেলা। বাদশাহকে খবর দিলেন তিনি যেন নাদির শাহের এক ক্রোশ পেছনে পেছনে আসেন।

পাঁচদিনে সোনপথে পৌঁছোন শাহ। আসার পথে যথারীতি লুণ্ঠন ও হত্যা। যাত্রাপথে কিছু প্রাপ্তি না হলে এবং রক্ত না দেখলে কেমন নিষ্ফলা মনে হয় তাঁর কাছে। সোনপথের পর তিনি এলেন নিরেলায় এবং সেখান থেকে অবশেষে শালিমার উদ্যান। সিরবুলিন্দ খাঁ শাহানশাহের সহযাত্রী হয়ে নাদিরের অত্যাচারের বীভৎসতা দেখে আর থাকতে পারে না। অসুস্থতার অছিলা করে দ্রুত রাজধানীতে গিয়ে নিজের গৃহে প্রবেশ করে শয্যায় শুয়ে পড়ে।

নাদির শাহ্ শালিমারে অতিবাহিত করেন পাঁচদিন। কারণ তাঁর কাছে খবর এসেছিল দিল্লীর অধিবাসীরা তাঁর ওপর আদৌ সন্তুষ্ট নয় এবং একটা কিছু বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পাবে। নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তিনি ঠিক করলেন বাদশাহকে আগে নগরীতে প্রবেশ করতে বলবেন। তাহলে তাঁকে স্বচক্ষে দেখে শহরবাসীরা আশ্বস্ত হবে। তারপরে তিনি নিজে প্রবেশ করলে, ওরা অতটা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করবে না। তিনি বাদশাহকে নির্দেশ দিলেন রাজকীয় শকটে ছত্রধারীকে নিয়ে তিনি যেন আনুষ্ঠানিক ভাবে দিল্লীর কেল্লায় প্রবেশ করেন। তবে তাঁর বসবাসের জন্য সাদাত খাঁয়ের পরামর্শে নির্দিষ্ট করা হল আয়েশ মহল। বাদশাহকে বলে দেওয়া হল রাজধানীতে গিয়ে তিনি যেন যথাযথভাবে নাদির শাহের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেন। তাতে যেন বেশ আড়ম্বর হয়। বাদশাহ্ সেই অনুযায়ী প্রবেশ করলেন।

পরদিন প্রভাতে নাদির শাহ্ তাঁর বাহিনীর অধিকাংশ শহরের বাইরে রেখে বিশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে নগরে প্রবেশ করেন। এত অশ্বারোহী থাকা সত্ত্বেও তিনি অতিমাত্রায় সতর্ক হয়ে প্রবেশ করেন। তিনি অশ্ব থেকে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য কামান গর্জন করে উঠল। বাদশাহ্ স্বয়ং এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নাস্তা খেতে আমন্ত্রণ জানালেন। নাদির শাহ হিন্দুস্থানের বাদশাহের আগে আগে চললেন মহলের দিকে।

ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতক সাদাত খাঁয়ের দিল্লী প্রবেশের অপর একটি কাহিনীও উল্লিখিত রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে সাদাত খাঁ চব্বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে দিল্লীর দরওয়াজায় এসে দেখে সেটি বন্ধ এবং তুমুল যুদ্ধ ব্যতীত সেখানে প্রবেশের কোন সম্ভাবনা নেই। তখন সে মিথ্যা খবর পাঠায় মোগলদের কাছে যে নাদির শাহ্ পরাজিত। তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছে বাদশাহী ফৌজ। বাদশাহ্ জয়ী হয়ে ফিরে আসছেন।

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর দরওয়াজা খুলে যায় এবং সাদাত খাঁ সসৈন্যে প্রবেশ করে।

নাদির শাহ্ বাদশাহের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন আয়েশ মহল। কেল্লার ভেতরের সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁর নখদর্পণে। প্রথমে শুধুর বাদশাহ্ নন, সবাই এতে বিস্মিত হয়েছিল। এখন সেই বিস্ময় আর নেই। এখন সব স্পষ্ট। লুৎফুল্লা খাঁ আর হাজি ফুলাদ খাঁয়ের কাছে সব জলের মত স্পষ্ট হয় প্রথমে। তারপর সবার কাছে। সাদাত খাঁ বিশ্বাসঘাতক রূপে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে। এখন শোনা যাচ্ছে বহুদিন থেকে নাকি নাদির শাহের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। তার উৎসাহে প্রধানত নাদিরের এদেশে পদার্পণ। নইলে দেশের প্রশাসনিক অবস্থা যত জঘন্যই হোক না কেন, দূর থেকে সেটা ঠাহর করা সম্ভব ছিল না নাদিরের পক্ষে। অনেকে নিজামুল মূলকের দিকেও সন্দেহের দৃষ্টি ফেলত বটে। কিন্তু অকাট্য প্রমাণ এখনো পর্যন্ত মেলেনি। বরং সে যেভাবে কারনালে নাদির শাহের সঙ্গে চুক্তির ব্যবস্থা করেছিল তাতে দেশের সম্পদের হানি হত না। বাদশাহের লাঞ্ছনাও হত না। এত হত্যাও হত না। অদৃষ্টে আরও কি রয়েছে কে জানে। ব্যাঘ্র রক্তের স্বাদ পেয়েছে কোথায় তার শেষ কেউ বলতে পারে না।

কেল্লা অঞ্চলে বাদশাহের সিপাহী রয়েছে বটে, তবে তারা এখন একচ্ছত্র নয়, নাদিরের

লোকও অনেক বয়েছে। তারা এখনো কোন মহল অধিকাব করতে হাত বাড়ায়নি। নাদির শাহের নির্দেশ নেই নিশ্চয়। থাকলে, এতক্ষণ পড়ে থাকত না। লুঠপাটের জন্য ওদের হাত সবসময় নির্শপিশ করে। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখন সবাই পেয়ে গিয়েছে। যেখান দিয়ে ওদের বাহিনী গিয়েছে সেখানে রক্তপাত লুণ্ঠন আর ধর্ষণ। মানবিকতার বালাই নেই ওদের। মানবিকতা কাকে বলে সেই ধারণাও সম্ভবত ওদের নেই।

বাদশাহের পিতামহী মেহের পরভীর অতি বৃদ্ধা হলেও, মস্তিষ্ক তাঁর খুবই সজাগ। এই বয়সে সাধাবণত বাইরের অনেক বিষয়ে মানুষের হুঁশ থাকে না। কিন্তু তিনি সব খবর রাখেন। এমন কি নাদির শাহ তাঁর পৌত্রের মাথাব ওপর চেপে বসে রয়েছে সেই খবরও অজানা নয়। নাদির শাহেব কেল্লায় প্রবেশের কথা শুনে তিনি কিছুক্ষণ বন্ধ ঘরে বসেছিলেন। তারপর মস্তিষ্ককে আবার সক্রিয় করে তোলেন। মোগল বংশেব পরিণতি বিষয়ে তাঁর যে ধারণা ছিল নাদির শাহ তাকে ওলোটপালট করে দিয়েছে। তিনি জানতেন মোগলদের গৌরবোজ্বল দিন আর কখনো ফিবে আসবে না। কারণ তেমন বাদশাহের জন্মগ্রহণের দিন গত হয়েছে। এই পরিবেশের মধ্যে একজন আকবর কিংবা শাজাহানের জন্মগ্রহণ সম্ভব নয়। তবু তিনি কখনো কল্পনা করতে পারেননি য়ে সুদূর পারস্য থেকে একজন এসে হিন্দুস্থানের বাদশাহকে এমন নাস্তানাবুদ করবে, এভাবে মহম্মদ শাহ নাদির শাহের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। মেহের পরভীরের ধারণা ছিল, মোগল বংশ ধীরে ধীরে মুছে যাবে দেশেব অভ্যন্তরের শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে ক্ষয়ে ক্ষয়ে। অভ্যন্তরের শক্তি বলতে মারাঠা আর বাজপুত। তাদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়ে গ্লানি থাকলেও, এই অপমান থাকত না। কারণ তারা বহিরাগত নয়। তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ বংশপরম্পবায়। সুদিনে মোগলরা জিতেছে, এখন তার জিতছে। এটা অনেকটা নিজেদের ব্যাপাব। কিন্তু নাদির শাহের বিজয় এবং বাদশাহের শোচনীয় ব্যর্থতার কথা সারা দুনিযা জেনে যাবে। তাই পিতামহী মেহের পরভীব নিজেকেই নিজে ধিক্কার দেন এতদিন জীবিত বয়েছেন বলে।

তিনি সেইদিনই মলিকা-আল-জুমানি থেকে শুরু করে হারেমে যত নারী রয়েছেন সবাইকে ডেকে পাঠান। হারেমে শুধু বাদশাহের বেগম নন, অন্যান্যদের হারেমে আবও বেগম রয়েছে। মালিকা আল-জুমানির শরীর ও মন ভাল ছিল না। এই সময়ে বৃদ্ধার ওই উদ্ভট আদেশে প্রথমে ক্ষেপে ওঠেন। তারপব ভাবেন, বংশের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠারূপে তাঁর হুকুম করাব অধিকার বয়েছে বৈকি। বাদশাহের বেগমের ওপরও রয়েছে। নব্বই বছরের ওপর যার বয়স তিনি কি সখ করে ডেকে পাঠিয়েছেন? তাঁর ডাকে সাড়া দেওযাকে কর্তব্য বলে মেনে নেওয়া উচিত।

সবাই জড়ো হয়। সংখ্যায় অনেক হল। তবে নাদিরের আকাশের নিচের হাবেমের মত সংখ্যা সাতহাজারে পৌছানো সম্ভব নয়। এককালে ছিল।

পিতামহী পবভীর বলেন— তোমবা সবাই এসেছ কি?

মালেকা আল-জুমানি বলেন— মনে হয়, সবাই এসেছে।

— আসলে ভাল। চোখে তো তেমন দেখি না। সব ঝাপসা লাগে। তবে অনেকে এসেছে বুঝতে পারছি। মেয়েরা জড়ো হলে তো সব চুপচাপ থাকে না। তাদের না-বলা কত কথা

থাকে। সুযোগ পেলে বলতে ইচ্ছা হয়। তবু অনেক কথাই জীবনে না-বলা থেকে যায়।

একজন ফোড়ন কাটে— আপনারও রয়েছে নাকি?

— কি বললে?

—বলছি, আপনার জীবনে না-বলা কথা অনেক রয়েছে কি?

— রয়েছে বৈকি। কার নেই? বিশেষ করে মোগল হারেমে? ওসব কথা এখন থাক। তোমরা তো শুনেছ, এই হারেম এখন নাদির শাহের দয়ার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু হঠাৎ যদি সেই বর্বরটা আর দয়া না দেখায়?

— তার মানে?

— তাব মানে, খুব সহজ। হয়ত নিজেই এই হারেম ব্যবহার করতে চাইল। কিংবা ধর ভাগযোগ করে নিতে চাইল?

— তেমন হয় নাকি?

— হয না? কত হয়েছে। তোমরা পুরোনো কাহিনী শুনতেও চাও না, পড়তেও চাও না। তাই জান না।

. একজন প্রশ্ন করে— আপনি কেন ডেকেছেন?

— সেই কথা বলতে ডেকেছি। তোমরা বাজপুতদের কথা শুনেছ নিশ্চয়।

— কোন্ কথা?

— সেই দেশের নারীদেব ওপর বাইবের কোন শক্তির হাত বাডানোর সম্ভাবনা থাকলে তারা কি করত? এখনো হয়ত তাই করবে।

-- কি করবে?

— সেই কথাও শোনোনি?

একজন বলে — আমাদের অত শুনে, অত জেনে কি হবে?

হতাশ মেহের পবভীর বলেন — জহরব্রত কথাটা শুনেছ?

— জন্মেও শুনিনি।

— লাঞ্ছনা এড়াতে ওরা দলবেঁধে আগুনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মরত।

— লাভ?

— সম্মান বাঁচাত।

— তাই বলে ওইভাবে মৃত্যু? ওরা সব পাগল নাকি?

— তা বলতে পার। একরকম পাগলই বটে। ধর নাদির শাহ দল বেঁধে এল হারেমে। তোমাদের টেনে নিয়ে যাবে বলে। কি করবে? সুযোগ পেলে আত্মহত্যা করবে?

একজন মিষ্টি কণ্ঠে বলে — আচ্ছা, রাজপুত রাজাদের কয়জন করে বেগম থাকে?

— বেগম নয়, রানী।

— ওই হল। কয়জন করে থাকে? মোগল হারেমের মত এত?

— শুনেছি সাধারণত একজন থাকে। কখনো কখনো দুই তিন জন। তার বেশিও।

— এমন শয়ে শয়ে তো নয়।

— না।

— তাই রাজার প্রতি তাদের একটা কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল, একটা কর্তব্য-বোধ ছিল। আমাদের কৃতজ্ঞতাবোধ থাকা কি উচিত? এই যেমন ধরুন নাদির শাহের সাত হাজার কিংবা সাড়ে সাত হাজার। চেনে সবাইকে? ওরাই বা কতটুকু চেনে শাহকে? ওদের কাছে নাদির শাহও যা, মহম্মদ শাহও তাই। আমাদের তেমন ধরে নিন না।

স্তব্ধ হয়ে যান মেহের পরভীর। তাঁর কিছুই বলার থাকে না। শুধু জিজ্ঞাসা করেন — তোমার নামটি কি?

— খুব সাধারণ নাম। অনেকের আছে। আমার নাম ফরজানা।

— নাম সাধারণ হলেও তুমি মেয়েটি সাধারণ নও। বেশ, তবে তোমরা সব তাতেই প্রস্তুত বোঝা গেল।

— হ্যাঁ আমরা হাটে বেচা গরুর মত। যে কিনে নিয়ে দড়ি ধরে টানে, আমরা তার সঙ্গেই যাই। যতদিন বাদশাহের সম্মান ততদিন আমাদের সম্মান। তাঁর সম্মান গেলে যে কেউ হাত বাড়াতে পারে। তাই বলে আগুনে পুড়ে মরব? বয়ে গিয়েছে।

পরভীর এই মন্তব্যে কেঁপে ওঠেন। তিনি বুঝতে পারেন এদের আত্মমর্যাদা বোধ বলতে কিছুই নেই। মোগল বেগমের আত্মমর্যাদা যে কী এরা তার মর্মার্থ বোঝে না। মোগল বংশ সম্বন্ধেও এদের ধারণা নেই। ঠিকই বলেছে, এরা গরুর মত, যখন যার তখন তার। এর জন্য এরা পুরোপুরি দায়ী নয়। মোগল বংশের পুরুষরাও সমানভাবে দায়ী। তারা তেমন হলে এরা এমন হতে পারত না।

ওই মহলটা এত কাছে অথচ শাহাজাদা সুলতান আহমেদের কাছে মনে হচ্ছে ওটি যেন পারস্যের অন্তর্গত। ওখানে যাতায়াত কত নিশ্চিন্তের ছিল, এখন যেন কাছে থেকেও কত দূর। যেন গর্দানের বিনিময়ে ওখানে যেতে হবে। অবশ্য অতটা ঝুঁকির নয়। কেল্লার প্রাচীরের বাইরে হলেও একেবারে লাগোয়া। ওখানে নাদির শাহের বর্বর বাহিনী যেতে সাহস পাবে না। তাহলে হারেমেও ঢুকতে পারত। তবু ওখানে যেতে হলে বেশি রাত করা উচিত নয়।

কারানাল থেকে ফেরার পর শাহাজাদা লক্ষ্য করেছে বেগম উমদেন্নেসা অসম্ভব রকম গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। রসকষ বরাবর একটু কম, এখন ছিটেফোঁটাও আছে বলে মনে হয় না। তবু এই কদিন ওর কাছেই রয়েছে। কিন্তু তাতে সে কৃতার্থ হয়নি মোটে। অথচ তার দিকে নজর রেখেছে ঠিকই। একটু বাইরে থেকে ঘুরে এলেই প্রশ্ন করে কোথায় সে গিয়েছিল।

শেষে নিজেই সে প্রশ্ন করে উমদেন্নেসাকে — তোমার কি হয়েছে বলত ?

বিস্মিত উমদেন্নেসা পাল্‌টা প্রশ্ন করে — তোমার কিছু হয়নি?

— তেমন তো কিছু বুঝতে পারছি না।

ব্যঙ্গের হাসি হেসে উমদেন্নেসা বলে ওঠে — এখনো পারছ না? আর কবে পারবে? গর্দান যাবার পরে?

— ও তুমি কারনাল যুদ্ধের কথা বলছ?

— ওই লজ্জার কথা ছাড়া এদেশের মানুষের দ্বিতীয় আলোচনার বিষয় আর কি থাকতে পারে?

— তাই বলে তো ভেঙে পড়লে চলবে না।

— তাই নাকি? বলতে চাইছ, এত অটল তুমি? নতুন উদ্যমের জন্য প্রস্তুত হচ্ছ বুঝি? নাদির শাহকে দিল্লী থেকে বিতাড়িত করার জন্য কৌশল অবলম্বনের চেষ্টা করছ? শক্তি সঞ্চয় করছ তলে তলে?

— সে কথা বলিনি। তাই বলে, এটাও ঠিক, যুদ্ধে হার জিৎ দুটোই রয়েছে।

— হ্যাঁ, যুদ্ধে তা রয়েছে বটে। কিন্তু মাসের পর মাস নিষ্ক্রিয় থেকে শত্রুকে আসার সবরকম সুবিধা করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণের বেলায় হারজিৎ এর প্রশ্ন ওঠে না।

— তুমি বড্ড বাড়িয়ে বলছ।

— না একটুও বাড়াইনি। তোমাদের সবচেয়ে কে বেশি চিনেছে জান?

— কে ?

— স্বয়ং নাদির শাহ।

— কি করে বুঝলে?

— নইলে তিনি কেল্লার মধ্যে পদার্পণের আগেই দিল্লীর বাদশাহের জন্য আয়েশ মহল, বাস করার জন্য নির্দিষ্ট করে দিতেন না। তিনি বুঝেছেন — এরা এত বেশি আয়েশি যে এদের আড় কোনোদিই ভাঙবে না।

— শাহানশাহকে উদ্দেশ করে এই মন্তব্য তোমার করা উচিত হয়নি।

— যা পরিস্থিতি হয়েছে, তাতে উচিত অনুচিত কোন কিছুরই প্রশ্ন ওঠে না। দিল্লীর মোগল পরিবার সব কিছুর সীমা ছাড়িয়েছে। তাই আমি কিছু মানিনা। তুমি জান, মেহের পরভীর জানতে চেয়েছিলেন নাদির শাহ যদি এসে হারেমের নারীদের নিজেদের ভোগ্য বস্তু রূপে নিয়ে যেতে চায়, তাহলে তারা রাজপুত রমণীর মত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়বে কি না।

— শুনেছি শুনেছি। সব শোনা হয়ে গিয়েছে।

— ও, একথা তাহলে ঠিক কানে গিয়েছে? তা তোমার মতটা কি শুনি?

— আমার কোন মত নেই।

— আমার স্বামীর বেগম একটা হলেও উপ-বেগমের সংখ্যা অনেক। তবু যদি নাদির শাহ আমার কক্ষে আসে তাহলে যে কোন ভাবে আমি আত্মহত্যা করব।

— কেন?

— শুধু নিজেকে বাঁচাতে নয়। নিজের মধ্যে যেটুকু মোগল-গরিমা রয়েছে তাকে বাঁচাতে। আমি পুরুষ হলে কারনাল থেকে ফিরে আসতাম না।

শাহাজাদা হাসতে হাসতে বলে — তুমি দেখছি মেবারের রানী।

— না সেই যোগ্যতা আমার নেই। থাকলে, আমার স্বামী এমন হত না।

— ওসব বাজে কথা থাক। আমি একটু ঘুরে আসছি।

— এর মধ্যেই যোগাড় করে ফেললে?

— কী যা তা বলছ? আমার বলে মাথার ঠিক নেই।

— তা বটে। আচ্ছা ফুলজানের কি হয়েছিল?

চমকে ওঠে শাহাজাদা। বলে — ফুলজান কে ?

— আমি জানি, তুমি তাকে দেখেছ। ভালই দেখেছ।

— চিনতে পারলাম না।

— মালেকা-আল-জুমানীর বাঁদী। তার ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়া গিয়েছিল বাদশাহের ছাউনিতে।

— হ্যাঁ পাওয়া গিয়েছিল বটে। খুবই দুঃখের। মেয়েটা নিশ্চয় নাদির শাহের গুপ্তচরের দলে নাম লিখিয়েছিল।

— তা হবে। তবে প্রশ্নটা করতেই তোমার মুখের সবটুকু খুন উধাও হয়েছিল। যাও কোথায় যাবে। দেখ যদি কিছু পাওয়া যায়। এতবড় বাগিচা, বাদুড়ের ঠোকরানো ফলও গাছের নিচে পড়ে থাকতে পারে।

অতি আনন্দে উমদেন্নেসার মুখের কাছে মুখ এনে শাহজাদা বলে — ওভাবে বলে না। প্রথম আর শেষে আমি তো তোমারই।

বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে উমদেন্নেসার কক্ষ থেকে সে উধাও হয়।

বাইরে এসে শাহাজাদা এগিয়ে যায় সেই মহলের দিকে। নিজের ঘরেই যেন চুরি করতে যাচ্ছে। কারনালের আগে সবার সামনে বীরদর্পে যেত ওখানে। এখন একটা সঙ্কোচ পেয়ে বসেছে। উমদেন্নেসা যেভাবে বলল, সেভাবে না বললেও যারা দেখবে তারা একটা কিছু ভাবতে পারে। ভাবতে পারে নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষের সম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে আবার অভিসার শুরু করেছে। উমদেন্নেসার মত একই মনোভাব হলে, ওরা তাকে নির্লজ্জ, বেহায়া এবং আত্মমর্যাদাহীন ব্যক্তি বলে ভাবতে পারে। কিন্তু তাই বলে, যাকে দূর গ্রাম থেকে নিয়ে আসা হয়েছে, যে তারই ভরসায় এখানে রয়েছে, তার ভালমন্দ দেখাও তো কর্তব্য। ওখানে গিয়ে দেখবে হয়ত খুরশিদা নেই। তাকে কেউ নিয়ে গিয়েছে। কিংবা অর্ধাহারে অনাহারে সে কৃশ হয়ে পড়েছে। তাকে দেখার কেউ নেই। যদি একটা কিছু অঘটন ঘটে যায় তাহলে রইস খাঁয়ের কাছে মুখ দেখাবে কি করে? শাহাজাদা হয়েছে বলে তো অমানুষ হয়ে যেতে পারে না। শত হলেও সে ভবিষ্যতের শাহানশাহ।

মহলের চৌহদ্দির মধ্যে প্রবেশ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শাহাজাদা। আর কোন বাধা বিপত্তি নেই। এবার একটু মজা করা যেতে পারে। সে পা টিপে টিপে খুরশিদার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। উঃ কতদিন পরে তাকে পাওয়া যাবে। সেই মিষ্টি কণ্ঠস্বর শোনা যাবে। একটু কাছে টানলেই দেহের সঙ্গে মিশে যাবে। মনে হবে এতটুকু ওজন নেই। অস্তিত্বও নেই যেন। মিলেমিশে একাকার। সেও নিশ্চয় একই আগ্রহ নিয়ে তার জন্য প্রতীক্ষা করছে। তার তো আর কেউ নেই। এতদিন কত উৎকণ্ঠায় না কাটিয়েছে। এবার নিশ্চিন্ত হবে।

খুরশিদার ঘরের পাশে এসে দেখে দরজা ভেজানো। খোজাটা গেল কোথায়? দেখে মনে

হচ্ছে যেন পরিত্যক্ত কুঠি। খোজাটার নাম যেন কি ? মনে পড়ে না। কিন্তু সে কাছে এসে কুর্নিশ করবে তো।

ভেজানো দরজা আস্তে করে ঠেলে শাহজাদা। সেটি খুলে যায়। ওদিকের খোলা বাতায়ন দিয়ে হু-হু করে হাওয়া আসায় দরজা দড়াম করে বন্ধ হয়ে যায়। শাহাজাদা এবারে দুহাতে দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে। শয্যা পাতা রয়েছে। কিন্তু কেউ নেই। কোথায় গেল? পাশের কোন কক্ষে যেতে পারে বটে। একটু বসে শয্যার ওপর।

অনেকক্ষণ অতিবাহিত হয়। তবু খুরশিদা এলো না। দুশ্চিন্তা হয় শাহজাদার। এতক্ষণে লক্ষ্য করে শয্যা পাতা রয়েছে বটে, কিন্তু সেই শয্যা ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

কোথায় গেল সেই খোজা? নামটা কি যেন? হ্যাঁ হ্যাঁ — আজিজ।

শাহাজাদা অনভ্যস্ত কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে — আজিজ।

কেউ আসে না। শাহাজাদা এঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়ায়। তবে কি বর্বর নাদির শাহ তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছে? তার পক্ষে সবই সম্ভব। না না খুরশিদা নাদির শাহের ভোগের সামগ্রী হবে একথা সে ভাবতে পারে না। সে প্রতিহিংসা নেবে। হ্যাঁ নাদির শাহের বুকে ছুরি চালিয়ে দিতে পারে। খুরশিদার জন্য সব পারে।

খুরশিদা সহসা তার সর্বস্ব হয়ে ওঠে। এতদিন বুঝতে পারেনি। আজ বুঝেছে সে তক্তাউসেঁর বিনিময়েও খুরশিদাকে পেতে চায়। দুনিয়ার সব কিছু একদিকে আর খুরশিদা অন্যদিকে। এতদিন কেন একথা বুঝতে পারেনি সে? জানলে মেহের পারভীরকে মিনতি করে তাঁর কাছে রেখে যেত তাকে। খুরশিদার অস্তিত্বই তার কাছে যথেষ্ট। আর কিছু নয়।

শাহাজাদা পাগলের মত ছুটে বাইরে বের হতে গিয়ে দেখে খোজা আজিজ সম্মুখে দণ্ডায়মান।

— আজিজ, খুরশিদা কোথায়?

কুর্নিশ করে আজিজ বলে — তিনি নেই।

— তুমি তার দায়িত্বে ছিলে। তোমাকে কতল করব। কে তাকে নিয়ে গিয়েছে?

— কেউ না।

— কে তাকে হত্যা করেছে?

— কেউ না।

— তবে? শিগ্‌গির বল।

— যেদিন সাদাত খাঁ দিল্লীতে প্রবেশ করলেন, সেদিন তিনি স্বেচ্ছায় চলে গেলেন। আমি হাতে পায়ে ধরেছি। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করতাম। তিন শিল্পী ছিলেন। কিন্তু কিছুতেই ধরে রাখতে পারলাম না।

— কি হয়েছিল বল।

— তিনি বললেন,— মোগলদের এমন পরাজয় আমার কল্পনার অতীত ছিল আজিজ। আমি কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছি না। দিল্লীর ওপর বিদেশীরা দাপিয়ে বেড়াবে, আমি ভাবতে পারিনি। শাহাজাদা যদি যুদ্ধে নিহত হতেন তাহলে আমি চিরকাল ওঁর সমাধিতে ফুল

দিতাম। কিন্তু তিনি যে কি করছেন কিছুই জানি না। তবে তাঁকে আমি ভালবাসি। যদি কখনো শুনি দিল্লী আবার আগের মত হয়ে গিয়েছে, আমি নিজেই ফিরে আসব। তখন আমাকে কেউ যদি চিনতে না পারে আমি তোমার কুটিরে যাব। তুমি সঙ্গীত রসিক। আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

— এই কথা বলেছে সে? সে কি করে ভাবল আমি তাকে ফিরিয়ে দেব? সে তো জানে না আমার কাছে সে কি। তোমাকে তার দেশের ঠিকানা দিলে তুমি যেতে পারবে?

— পারব শাহাজাদা, নিশ্চয় পারব।

— রইস খাঁয়ের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে আমি তোমাকে দেব। রইসের মন ভাল নেই। তার বেগম আত্মহত্যা করেছে। কদিন যাক।

— কিন্তু তার আগে নাদির শাহকে যে চলে যেতে হবে।

— হ্যাঁ। দেখি।

আজিজ শাহাজাদার চোখেমুখে একটা নতুন কিছু দেখে বিস্মিত হয়। তাকে এতদিন পরে একটা গোটা মানুষ বলে মনে হয় তার কাছে।

দুদিন পরে নাদির শাহ শাহানশাহ্ শাজাহান নির্মিত দেওয়ানি-খাসের পাশে একটি মহলকে বসবাসের জন্য নির্বাচিত করলেন। মহম্মদ শাহ আসাদ বাড়িতে উঠে গেলেন। সেখানে গিয়েই তিনি নাদির শাহের সম্মানে একটি ভোজের আয়োজন করেন। সেখানে খাদ্যতালিকা দেখে এবং তার আস্বাদ গ্রহণ করে নাদির শাহ্ এবং তাঁর পুত্র পরিজন বিমোহিত হলেন। মোগলদের আভিজাত্য যে কী তিনি এই প্রথম উপলব্ধি করলেন। তাঁর মন বিগলিত হল।

তিনি বাদশাহকে পাশে বসিয়ে নম্রকণ্ঠে বলেন — আমি তো বরাবর বলেছি আপনার দেশ আপনারই থাকবে। এই মহান দেশ অধিকার করতে আমি আসিনি। ওই তো নিজামুল-মুল্‌ক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওঁর সঙ্গে আমার যে চুক্তি হয়েছে সেই অনুযায়ী অর্থ নিয়ে আমি আমার দেশে ফিরে যাব।

বাদশাহ থেকে শুরু করে সব ওমরাহ যারা নাদির শাহের ভোজসভায় উপস্থিত ছিল সবার মন আনন্দে নেচে ওঠে। তারা ভাবে, অভাবনীয় যা ক্ষতি এর মধ্যেই হয়ে গিয়েছে। তবু আর যদি কোনরকম ক্ষতি না হয় সেও হবে পরম সৌভাগ্যের। এখন বোঝা যাচ্ছে নাদির শাহ যতই নির্মম হোন না কেন, তাঁরও একটা মন রয়েছে। তিনি সুপুরুষ হলেও চোখে মুখে একটা রূঢ়তা, একটা নির্মমতা ভেসে ওঠে। ওদেশের সবার মধ্যেই অমন একটা ভাব। কথায় বার্তায় চালচলনে ওদের মধ্যে নরম ভাবই নেই। তাই নাদিরের লোকেরা কয়েকজন একসঙ্গে মিলে যখন রাস্তা দিয়ে চলে তাদের দেখে মেয়েরা তো বটেই এমনকি পুরুষেরাও লুকোতে পারলে বাঁচে। অন্তত কাছাকাছি আসতে সাহসী হয় না তারা। হিন্দুস্থানীদের চেহারার মধ্যে একটা পার্থক্য সহজে নজরে পড়ে। তাদের হাত-পা অনেক সাজানো-গোছানো। তাদের গায়ের ত্বক অনেক পেলব। তাদের কথাবার্তা চলাফেরায় একটা ছন্দ রয়েছে। হাঁকডাক তাদের অনেক কম। কথায় কথায় হুংকার দিয়ে ওঠে না। এমনকি পারস্য তুরস্ক সমরকন্দ ইত্যাদি স্থান থেকে

এসে যারা দুএক পুরুষ অতিবাহিত করেছে তারাও এমন হয়ে গিয়েছে। এখানকার জলবায়ুর গুণ, এখানকার সংস্কৃতির গুণ। মানুষ তো আর বন্য পশু নয়।

নাদির শাহ্ না ঘরকা না ঘাটকা। নামে পারস্য, আসলে তুরস্ক। তুর্কী ভাষাই বলতে শুধু অভ্যস্ত। তাঁর সঙ্গে আলোচনা চালাতে তাই বাদশাহের বেশ অসুবিধা হয়েছিল। এখন কিছুটা সড়গড় হয়েছে। নাদির যদি খাঁটি পারসিক হতেন, তাহলে এমন হতেন না। কারণ পারস্যেরও সংস্কৃতি রয়েছে। অনেক শিল্পী কবির জন্মস্থান সেটি। নাদির শাহ্ যেভাবে যেখানে বড় হয়ে উঠেছেন সেখানে সংস্কৃতির ছোঁয়া লাগার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁর বাহিনী প্রধানত উত্তর আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষ দিয়ে তৈরি। তাদের অধিকাংশের স্থায়ী কোন বাসগৃহও নেই। মমতাপূর্ণ পারিবারিক বন্ধনের আস্বাদ তারা অধিকাংশই পায়নি কখনো। যাযাবর না হলেও প্রায় সমগোত্রীয় বলা যেতে পারে। তাই নাদির শাহের সঙ্গে তাদের মিলেছে ভাল। তারা শৃঙ্খলাপরায়ণ, কিন্তু সেটি অর্থের বিনিময়ে। অর্থ ব্যতীত আর কিছু বোঝে না তারা। নাদির শাহ্ তাদের নাড়ি চেনেন। তাই কারনালে আমীর ওমরাহ্দের কাছ থেকে হীরে জহরৎ মোহর ইত্যাদি লুঠ করেই বাহিনীর তিন মাসের বেতন মিটিয়ে দিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। অর্থ পেলে ওরা জান কবুল করবে, না পেলে বিদ্রোহ। কোন মধ্যপন্থা নেই। স্তোকবাক্যে তারা ভোলে না। মিষ্টি কথার তোয়াক্কা করে না।

খানাপিনার পর নাদির শাহ্ নিজামুল মুল্‌ক আর সাদাত খাঁকে দেওয়ানি খাসের পাশে তাঁর মহলের দরবারে যেতে বললেন। তাঁর হাবভাবে অনুভূত হল দুজনার ওপর তিনি তুষ্ট। সম্ভবত দুজনা তাঁকে যেভাবে সাহায্য করেছে তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেন।

সাদাত খাঁকে তিনি প্রশ্ন করেন — আপনি খুঁড়িয়ে হাঁটছেন কেন। আপনার ক্ষত কি খুবই বেশি?

— হ্যাঁ। আপনি আজ এসেছেন বলে কোনমতে হাজির হয়েছি। হাকিম আমাকে শয্যা ছেড়ে উঠতে নিষেধ করেছিলেন। অসহ্য যন্ত্রণা।

— তবে এলেন কেন? আসা উচিত হয়নি। তেমন হলে না হয় আমি যেতাম আপনার কাছে।

— না না, তা কি হয়? আমি সেকথা ভাবতে পারি না।

নিজামুল মুল্‌ক ঢোক গিলে বলে — সাদাত খাঁ ঠিকই বলেছেন। আপনি হলেন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুলতান।

— কি বললেন? শ্রেষ্ঠ সুলতান? ঠিক বলেছেন তো?

নিজামের উক্তিতে নাদির শাহের মাথায় একটি নতুন পরিকল্পনার উদ্ভব হয়। তিনি বাদশাহ্ মহম্মদ শাহের কাছে গিয়ে বলেন — একটা কাজ করতে হবে।

বাদশাহ্ প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকান।

নাদির শাহ্ বলেন — আজই রাতের মধ্যে অন্তত কিছু মুদ্রা বের করতে হবে। তাতে ছাপা থাকবে "সুলতানের সুলতান, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুলতান নাদির শাহ্।" আজকের মধ্যে দেখতে চাই। তারপর কাল থেকে কিছুদিন এইভাবে ছাপা হতে থাকবে।

বাদশাহের মুখ কালো হয়ে যায়।

— শুনেছেন?

— অবশ্যই।

বাদশাহ নিজামুল-মুল্‌ককে সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দেন। কারণ নিজামই হল মীর বক্‌সী। ব্যবস্থা তাকেই নিতে হবে আপাতত। সে-ই হল নষ্টের গোড়া।

খানাপিনার পর যে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন বাদশাহ, তা একটি কথায় চূর্ণ হয়ে গেল। দিল্লীর বুকের ওপর বসে যদি নিজের নামে শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে মুদ্রা বের করেন নাদির শাহ, তার একটি মাত্র অর্থ হল দিল্লী তাঁর পদানত। কিন্তু সেই প্রশ্ন তিনি তুলতে পারেন না। নিজামুল মুল্‌ক বেশি তোয়াজ করতে গিয়ে অমন বেসামাল কথা যদি না বলত তাহলে নাদিরের মাথায় এই মারাত্মক ধারণা স্থান পেত না। সাদাত খাঁ প্রকাশ্যে যা করেছে, নিজাম জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতসারে তাই করে বসল। বাদশাহের সম্মানের ভরা-ডুবি হল।

সাদাত খাঁয়ের পায়ের যন্ত্রণা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতে চায়। তবু সে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে হয় ক্ষতস্থানে পচন ধরেছে। সেই কবেকার ক্ষত। অযোধ্যা থেকে কারনালের পথে যাওয়ার আগে থেকে এই ক্ষত। যার জন্য অশ্বে না উঠে হস্তিপৃষ্ঠে রওনা হয়েছিল। তারপর কতদিন হয়ে গেল। কত পরিশ্রম এবং সেই সঙ্গে ক্ষতের প্রতি অবহেলা। আজ সুদে-আসলে শোধ হতে বসেছে। নাদির শাহকে সে বারবার দিল্লীতে থেকে যেতে বলেছে। কারণ তিনি না থাকলে বাদশাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখবেন না। তবু নাদির রাজি হচ্ছেন না। নিজামুল মুল্‌ক তাঁর কানে যে কী মন্ত্র দিয়েছে কে জানে। এতবড় দেশের ভয় দেখিয়েছে। আর দেখিয়েছে রাজপুত আর মারাঠার ভয়। মারাঠার অধিপতি বাজীরাও নাকি বলেছেন — "এখন তামাম হিন্দুস্থানের একজন মাত্র শত্রু। সে হচ্ছে নাদির শাহ।" কথাটা শাহের কানে পৌঁছে দিয়েছে নিজাম। তাই উস্‌খুস্‌ করছেন তিনি।

নাদির শাহ দরবারে প্রথমে দুজনার প্রভূত প্রশংসা করলেন। তারপর ঘোষণা করলেন— আগামী কাল একটি বিশেষ দিন। আগামী কাল পারসিক্‌দের নওরোজ। আবার একই দিনে এবারে পড়েছে ইদুজ্জোহা। ফলে দিনটির তাৎপর্য ভীষণ ভাবে বেড়ে গিয়েছে। আজ তাই সেই উপলক্ষে আমার লোকদের খিলাত বিতরণ করব। আপনারা দুজনা উপস্থিত থাকার জন্য আমরা সন্তুষ্ট। আপনারা অনেক করেছেন আমাদের জন্য।

এরপর একে একে নাদির বাহিনীর বিশেষ বিশেষ বক্তিবর্গকে শাহ খিলাত দিলেন। তারা অত্যন্ত বিনীত ও উৎফুল্ল চিত্তে সেগুলো গ্রহণ করে।

নাজিম একবার যন্ত্রণাকাতর সাদাত খাঁয়ের মুখের দিকে আড়চোখে চাইল। বলা যায় না হয়ত তাদেরও এই সঙ্গে খিলাত দিয়ে বসবেন। কিন্তু খিলাত বিতরণ শেষ হলে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে আসন গ্রহণ করলেন। সবার মুখে হাসি।

সহসা নাদির শাহের মুখ ভীষণ গম্ভীর হয়। দরবারের সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তারা জানে সাধারণত রক্তপাতের পর তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয়। অনেক সময় দরবারের মধ্যে নিজেই সেই রক্তপাত ঘটান। অবশ্য সেই সমস্ত দরবার যুদ্ধক্ষেত্রের দরবার। নগরীর অট্টালিকায় দরবার

বসিয়ে তেমন রক্তপাত তিনি ঘটাবেন কি না কেউ বুঝতে পারে না।

নাদির শাহ্ চিৎকার করে ওঠেন — সাদাত খাঁ।

যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট সাদাত খাঁ বলে ওঠে — হুজুর।

— আপনার কাজের জন্য যতটুকু কৃতজ্ঞতা জানানোর আমি জানিয়েছি। আর নয়। ভাববেন না আপনার কাছে আমি ক্রীত হয়ে থাকব। আমাকে আপনি মূর্খ ভাবেন নাকি?

দরবারের মধ্যে এভাবে বলায় সদাত খাঁয়ের আত্মসম্মান তীব্র কশাঘাতে যেন কুঁকড়ে যায়। এতক্ষণের সুন্দর ব্যবহারের পরে হঠাৎ এই পরিবর্তনের হেতু কি, কেউ বুঝে উঠতে পারে না। সাদাত খাঁ বোঝার চেষ্টাও করে না। সে উপলব্ধি করে যে সে বিশ্বাসঘাতক এবং সেই পাপের যোগ্য শাস্তিই সে পাচ্ছে।

নাদির শাহ্ কোন জবাব না পেয়ে আবার চিৎকার করে ওঠেন — কি হল? জবাব দিচ্ছেন না কেন?

— কি জবাব দেব আমার জানা নেই। আমার অপরাধ কোথায়?

নাদির শাহ্ আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে তাঁর পার্শ্বস্থিত যুদ্ধকালীন কুঠার তুলে নেন। বলেন — স্পর্ধা আপনার সীমা ছাড়িয়েছে। আমার কথার ওপর কথা বলছেন। ভেবেছেন এটা দিল্লীর দেওয়ানী খাস। আমি জানতে চাই, আপনার সেই দার্শনিক, সেই যার নাম বলেছিলেন আসফ জাহ্। তার কাছে নাকি আছে গুপ্তধনের চাবিকাঠি?

— কোষাগারের চাবি তার কাছে আছে। কিন্তু আপনি তো চাইলেন না। পরে বাদশাহকে বললেন, চুক্তি অনুযায়ী অর্থ নিয়ে দেশে ফিরে যাবেন।

— বললাম, আর তাই সত্য হয়ে গেল? এই যে আপনার শাগরেদ নিজাম। ইনি অত্যন্ত ধুরন্ধর। কারনাল থেকে সামান্য কিছু দিয়ে আমাকে বিদায় করতে চেয়েছিলেন।

সাদাত খাঁ মনে মনে বলে, তখন আমিই আপনাকে প্রকৃত হদিস দিয়েছিলাম। আজ অবশ্য সেজন্য আফসোসের সীমা নেই। কবে কোথায় সে কিংবা তার পূর্বপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিল তার ঠিক নেই। তারই মোহে যে দেশে বড় হয়ে উঠল, যে দেশের মানুষ তাকে নিজের বলে কাছে টেনে নিল, যে দেশ তাকে দিল যশ, অর্থ প্রতিপত্তি, সেই দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল সে। আজ সে যন্ত্রণাকাতর, সে আহত, সে অপমানিত। ঠিক হয়েছে। আগামী কাল এ মুখ আর কেউ দেখতে পাবে না। আজ রাতের মধ্যে শেষ করে দেবে।

দরবারের শেষে উভয়ে নতমস্তকে বের হয়ে আসে।

নিজাম আহত কণ্ঠে বলে — বাদশাহ্ও আমাদের কখনো এভাবে বলেননি। এই জীবন আমার কাছে দুর্বহ হয়ে উঠেছে। এর থেকে পরিত্রাণ পেলে বেঁচে যাব।

সাদাত খাঁ দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে — সত্যিই তাই চান?

— অবশ্যই।

— আমার কাছে আছে।

— কি।

— বিষ। তীব্র বিষ। একটি পানপাত্রের মধ্যে শরবত কিংবা জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেয়ে

নিলে কাল আর ঘুম ভাঙবে না।

— ঠিক আছে আমাকে দিন। আমরা তো দুজনা পাশাপাশি কক্ষে রাত কাটাবো। ভালই হবে। আপনাকে আর অযোধ্যায় যেতে হবে না। আমিও ফিরব না ঔরঙ্গাবাদে।

তারা দুজনা শয়নকক্ষে প্রবেশের আগে শরবত আনিয়ে নেয় দুটি পাত্রে। তারপর সাদাত খাঁ একটি পুরিয়া নিজামুল মুল্‌ক এর হাতে গুঁজে দিয়ে ম্লান হেসে বলে — আমি সঙ্গে করে নিয়ে ঘুরতাম। এমন একটা দিন আসতে পারে, আগে থেকে অনুমান করেছিলাম।

নিজামুল-মুল্‌ক পুরিয়াটি হাতে নিয়ে আহত সাদাত খাঁকে আলগোছে আলিঙ্গন করে বলে — বিদায়।

— বিদায়।

দুজনা পাশাপাশি দুটি কক্ষে প্রবেশ করে।

পরদিন দেখা গেল সাদাত খাঁ মৃত অবস্থায় শয্যায় পড়ে রয়েছে। সেই সংবাদ পার্শ্ববর্তী কক্ষে দিতে গেল একজন বান্দা। সে দেখল নিজামুল মুল্‌ক নিদ্রিত। সে ঘাবড়ে গিয়ে একটু জোরে ডেকে ওঠে। শরবত খেয়ে নিদ্রা গিয়েছিল নিজাম। গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। তাড়াতাড়ি চোখ কচলে বান্দার মুখের দিকে চায়।

সে বলে — সাদাত খাঁ মৃত।

— তাই নাকি। ওঃ বড় দুঃখের। মারাত্মকভাবে জখম হয়েছিলেন। এই মৃত্যু ঘটতই— আজ না হোক কাল। তবে আফসোস এই যে ইদুজ্জোহার দিনে এমন হল। এও এক ধরনের কোরবানি — কি বল?

— হ্যাঁ মেহেরবান। আমি খবর দিয়ে আসি।

— যাও, তাড়াতাড়ি খবর দাও গিয়ে।

নিজাম আড়মোড়া ভেঙে শুয়ে পড়তে গিয়ে আবার উঠে ভাবে, নাঃ এখন শোয়াটা শোভনীয় হবে না। বিশেষ করে আজ ইদুজ্জোহা। এতক্ষণে কোরবানি শুরু হয়ে গিয়েছে। নাদির শাহের লোকেরা দিল্লীতে এই উৎসব জীবনে প্রথম এবং বোধহয় শেষবারের মত দেখবে। এমন অনুষ্ঠান তারা জীবনে দেখেনি। দলে দলে লোকে দরগায় মসজিদে নামাজ পড়তে বসবে। এমন সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়ে ওই সব পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষেরা কখনো নামাজ পড়ে না। কোনদিন পড়ুক আর না পড়ুক একবার দেখে চোখ সার্থক করে নিক। নামাজের স্থানটি দূর থেকে দেখতে লাগে সাদা মেঘের মত। সবাই চেষ্টা করে যতটা সম্ভব শ্বেতবর্ণের পোশাক পরতে। এই রুচির সৃষ্টি কি কুঠার হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ালে হয়? এ হল অনেক দিনের অনুশাসনের ফল। সংস্কৃতি তো সাধনার ফসল। ওরা এর মর্ম বুঝবে কি করে? কিন্তু সাদাত খাঁ বড় কাঁচা কাজ করে ফেলল। মনে হয় সে ভয় পেয়েছিল। নিশ্চয় তাই। কিংবা যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছিল না। যাই হোক. তার অন্তত শেষটুকু দেখে যাওয়া উচিত ছিল। বিশেষ করে নাদির শাহের দরবারে এসে স্পষ্ট যখন বোঝা গেল ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত। সাদাত খাঁ নাদিব শাহের সঙ্গে ওদেশে চলে যেতে পারত। সেটুকু করুণা নাদির শাহ নিশ্চয় দেখাতেন। কারণ যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় সে নাদিরের বন্দী হলেও সে যে

কুশল সেনানায়ক এই খবর নাদির রাখেন। কারনালে অতিরিক্ত ব্যস্ততার জন্য সে ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল। ওখানকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্যক না জেনেই সে ছুটে গিয়েছিল নাদির শাহের সেনার পেছনে। সেটা ঠিক হয়নি। তবে নাদির শাহ্ তাকে ঠিক কাজে লাগাতেন। তিনি মানুষ চেনেন।

মালিকা-আল-জুমানি একাকী নিজের কক্ষে বসে ছিলেন। এখান থেকে বাইরের কোন দৃশ্য চোখে পড়ার ভয় নেই। কেল্লার সামনে এবং দূরে যেখানেই দৃষ্টি ফেলেছেন, দেখতে পেয়েছেন বিজাতীয় সব মানুষজন। তারা বুক ফুলিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। অথচ যারা চিরকাল এই সব এলাকায় ঘুরেছে ফিরেছে, কেল্লা সংলগ্ন দোকানপাটে সওদা করেছে তারা যেন সঙ্কুচিত। অচেনা লোকগুলোর কথায় বিগলিত হয়ে উত্তর দিতে তাদের সম্মানে বাধে। তাই সযত্নে এড়িয়ে যায়। তবু বিদেশীরা গায়ে পড়ে জোর করে কথা বলতে চাইলে একটা কিছু না বলে থাকা যায় না। তাদের যা প্রতাপ, বলা যায় না মুখের ওপব আঘাত করতে পারে। চেহারা ভাবভঙ্গি সবই তো ওইরকম। যেন একপাল পাহাড়ি ভল্লুক আর চিতা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে শহরের পথে ঘাটে।

ওইসব দৃশ্য এক আধটা চোখে পড়ছিল মালিকা-আল-জুমানির। তাই তিনি তাঁর শয়ন ও বিশ্রামের কক্ষ পরিবর্তন করেছেন। এখান থেকে বাইরের দৃশ্য চোখে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। তিনি মূর্খ নন। তাই জানেন, এভাবে পেছনের কক্ষে সবে আসার মধ্যে তাঁর পরাজিতের মানসিকতাই প্রতিফলিত হয়েছে। জেনেশুনেও মেনে নিতে হয়েছে। যারা অক্ষম তাদের আত্মমর্যাদা থাকতে অবশ্যই পারে, কিন্তু তাই বলে অতীত গৌরব নিয়ে উদ্ধত হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। প্রথম যখন মোগল বংশের বেগম হয়ে এলেন, তখনও মোগলদের সেই প্রতাপ ছিল না। কিন্তু তারা স্বাধীন ছিল। এই দেশের মুখে কেউ কলঙ্কের কালিমা মাখিয়ে দেয়নি তখনো। ঝগড়া বিবাদ যড়যন্ত্র হত্যা সবই ছিল বরাবরের মত, তবে সেগুলো ছিল শরিকী বিবাদ। কিংবা বড়জোর রাজপুত বা মারাঠাদের সঙ্গে। তারা তো আর ভিনদেশি নয়। তাদের কাছে পবাজিত হলে এভাবে ইজ্জত নষ্ট হয় না।

তিনি হলেন হিন্দুস্থানের প্রধানা বেগম। সেই সম্মানের তুলনা ছিল না। অথচ তাঁকে এবং শাহাজাদাকে কারনালে নিজেরই শিবিরে নাদির শাহের বন্দিত্ব মাথা পেতে মেনে নিতে হয়েছিল। এই দিল্লীতে কেল্লায় ভেতরেও তার চেয়ে বেশি আর কি ? সম্মানের সব কটি পালক ওরা একে একে টেনে উপড়ে ফেলে দিয়েছে। নিজেকে এখন নিশ্চয় পালক-ছাড়ানো মুরগির মত দেখতে লাগছে, নবজাত শিশুব মত যারা সরু সরু হাত পা ছড়িয়ে পড়ে থাকে অসহায় অবস্থায়।

বাঁদী পরভেজ একপাত্র শরবত নিয়ে এসে দাঁড়ায়। আগে ছিল ফুলজান, এখন হয়েছে পরভেজ। তাকেই বেশি পছন্দ করতেন তিনি। তার মধ্যে একটা অকৃত্রিম ভাব ছিল, যা এই হারেমে দুর্লভ। পরভেজ ফাইফরমাস খাটে যন্ত্রের মত। কিন্তু ফুলজানের মধ্যে হৃদয়ের স্পর্শ ছিল। খুব ভাল লাগত। যদিও কখনো কখনো অতি উৎসাহে সে শোভনীয়তার মাত্রা ছাড়াত।

তবে তার ওপর শাহজাদার যে দৃষ্টি পড়েছিল তা তিনি জানতেন। মৃদু তিরস্কারও করেছিলেন পুত্রকে একদিন। মনে হয় তাতে কাজ হয়নি। তাঁর দৃঢ় ধারণা পুত্রের কাছে অভিসারে যেতে গিয়ে ফুলজান কোন কামোন্মত্ত সিপাহীর খপ্পরে পড়েছিল। লোকটা ধরা পড়ল না।

শরবতের পাত্র বাঁদীর হাত থেকে নিতে গিয়ে সাদাত খাঁয়ের কথা মনে হয়। গতকাল এই রকম শরবতের পাত্রে বিষ মিশিয়ে খেয়ে সে মারা গিয়েছে। অবশ্য সাধারণ সবাই জানে আঘাতজনিত কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। হাকিমকে বলে দেওয়া হয়েছে যেন প্রকৃত কারণ প্রকাশ না পায়। সাদাত খাঁয়ের বেগম আর পুত্রকন্যাদের আনতে অযোধ্যায় লোক পাঠানো হয়েছে। পুত্রকন্যারা এখনো সাবালক হয়নি।

পরভেজের হাতে পাত্রটি ফিরিয়ে দিয়ে মালিকা আল-জুমানি ভাবেন, তিনিও সাদাত খাঁয়ের মত মরতে পারেন। অপমানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া কত সহজ। কিন্তু সত্যই কি তাই? আজ যদি ওইভাবে তিনি মৃত অবস্থায় শয্যায় পড়ে থাকতেন, তাহলে বোধহয় বাদশাহের পরিবারের লজ্জা আরও বৃদ্ধি পেত। মানুষ যেমন অস্ত্রে বলীয়ান হয়, মানসিক দিক দিয়ে তেমনি বলীয়ান হতে পারে। সেটাও কম না। সাদাত খাঁ সেদিক দিয়েও পরাজিত। বেগমের মধ্যে আত্মহত্যার চিন্তা কখনো উদয় হয়নি। এতেই বোঝা যায় তিনি এই বিষয়ে সাদাতের চেয়ে বলীয়সী। তাঁর অনেক বার মনে হয়েছে, নাদির শাহ্ শুধু যুদ্ধবিদ্যায় নয়, মনের দিক দিয়েও মোগলদের পেছনে ফেলে দিয়েছেন। নইলে কারনালের যুদ্ধক্ষেত্রে বাদশাহের ওপর অমন প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারতেন না। এখন সেটা আরও চেপে বসেছে। বাদশাহ্ পায়ের নীচের মাটি যেন একেবারেই হারিয়ে ফেলতে বসেছেন। তাঁর হালফিল আচার-আচরণের মধ্যে সেটা দিনকে দিন প্রকট হয়ে উঠছে। এখন তিনি মালিকা-আল-জুমানির কাছেও আসতে চান না। একটা সঙ্কোচ তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখে। শুধু নাদির শাহ দেখা করতে বললে যেতে হয়। তিনি বাদশাহ বলেই তাঁকে প্রয়োজন হয় নাদির শাহের। তাঁর সইসাবুদ না হলে তো চলে না। নইলে আসল আলোচনা হয় নিজামুল মুলক, কামরুদ্দিন, সিরবুলিন্দ ইত্যাদির আমির উজিরদের সঙ্গে। আলোচনার বিষয়বস্তু যে কী সেই বিষয়েও বোধহয় তেমন ওয়াকিবহাল নন বাদশাহ্। তেমন আগ্রহও নেই। হাল ছেড়ে দিয়ে বসে রয়েছেন। শেষ পর্যন্ত যা হয় হোক, নাদির শাহ্ বিদায় হলেই যেন বাঁচেন তিনি। চেহারাও তাঁর খুব খারাপ হয়েছে। বাদশাহ্ আলমগীরের একেবারে শেষ বয়সের যে তসবির আঁকা রয়েছে, হুবহু তেমন দেখতে লাগে। অথচ কারনালে যাওয়ার আগেও তিনি সুদর্শন দেখতে ছিলেন।

মালিকা-আল-জুমানি পেছনের এই কক্ষের বাতায়নপথে বাইরে চেয়ে থাকেন। এখানে বসে নবাগত বিদেশীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ চলাফেরা চোখে পড়ে না।

কোতোয়াল হাজি ফুলদ খাঁ নাদির শাহের দরবারে তাঁর দর্শনপ্রার্থী হয়। নাদির একটু বিস্মিত হয়ে তাকে ডেকে পাঠান।

— বল।

— খোদাবন্দ, শহরের হালচাল মোটামুটি ভাল হলেও, একটা বিষয়ে আমি একটু অসুবিধায় পড়ছি।

— কোন বিষয়ে।

— আপনার সঙ্গে যারা এসেছে, তারা মাঝে মাঝে না বুঝে একটু আধটু অত্যাচার করে ফেলছে। যদি তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে নরম করা যায়।

নাদির শাহ্ চেঁচিয়ে ওঠেন — এ কথার অর্থ?

কোতোয়াল ভয় পেয়ে যায়। সে বলে — আপনার সিপাহীরা সবাই লম্বা চওড়া। তাদের কথাবার্তার মধ্যে বেশ একটা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আসলে তো তারা সবাই খুব শক্তিশালী। কারও হাত ধরে সামান্য একটু টানলেই, মনে হয় হাত ছিঁড়ে গেল। এই কথাটা ওদের একটু বুঝিয়ে দেওয়ার যদি ব্যবস্থা করা যায়।

নাদির শাহ্ হো হো করে হেসে ওঠেন। তিনি বলেন — ওরা কেউ মারামারি করবে না, বন্দুক ছুঁড়বে না। আমি বলে দিয়েছি।

— হ্যাঁ, ওরা আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে। তবু ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। কাউকে আদর করে হাত ধরে হেঁচকা টান দিলে কাঁধ থেকে হাত ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে।

— ঠিক বলেছ। তোমাদের এখানে সবাই নরম নরম আর দুর্বল দেখতে। আমি বলে দিচ্ছি, কারও গায়ে হাত দিয়ে যেন কথা না বলে। এখন দেখছি আমি না এসে আমার দেশের মেয়েদের শুধু যদি পাঠাতাম, তাহলেও বোধহয় শেষ পর্যন্ত জিততে পারত। তোমার কথায় আমার চোখ খুলে গিয়েছে।

কোতোয়াল কুর্নিশ করে বিদায় নিতে গেলে নাদির শাহ্ গম্ভীর স্বরে বলেন — নিজাম আর সিরবুলিন্দ যেন খুব তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে দেখা করে।

ওরা দুজনা প্রবেশ করতেই নাদির শাহ্ কঠোর স্বরে বলে ওঠেন — আমার টাকা কোথায়?

নিজাম অতি বিনয়ের সঙ্গে বলে — তার যোগাড়ের চেষ্টাই আমরা করছি খোদাবন্দ।

— আর কতদিন? তুমি কারনালে আমাকে নতুন পেয়ে পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় রফা করেছিলে। আমাকে ঠকাতে চেয়েছিলে।

— না হুজুর। ঠকাবার চেষ্টা করিনি। আমি বাদশাহের হয়ে চুক্তি করেছিলাম। তাতে তাঁর মঙ্গল চিন্তা করেছিলাম আবার দেখেছিলাম আপনিও যাতে মোটা অঙ্ক পান।

— মোটা অঙ্ক? ওটা মোটা অঙ্ক হল?

— এখন ওসব প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল। এখন তো বিশকোটি টাকায় রফা হয়েছে। এই পরিমাণ যথেষ্ট। পৃথিবীর যে কোন দেশের পক্ষে সাধ্যাতিরিক্ত।

— আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু কবে পাব?

— অনুগ্রহ করে আর কয়েকদিন সময় দিন। বন্দোবস্ত প্রায় করে ফেলেছি।

— আমি আপনার কথার ওপর নির্ভর করে দেশে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র রেজা কুলির কাছে লোক পাঠিয়েছি। বলে দিয়েছি আগামী তিন বছরের জন্য সমস্ত চাষীদের খাজনা মকুফ। না পেলে আমার মুখ থাকবে?

— নিশ্চিন্তে থাকুন। মুখ আপনার থাকবে। সামান্য সুযোগ পেয়ে যিনি প্রজাদের এতখানি মঙ্গল করেন, তাঁর মুখ উজ্জ্বল হতে বাধ্য। এই সুদূর দেশে পড়ে থেকেও প্রথম সুযোগে যাঁর প্রজাদের কথা সর্বপ্রথম মনে পড়ে যায় তাঁর মাথা কখনো নিচু হয় না।

সিরবুলিন্দ অবাক হয়ে নিজামের দিকে চেয়ে থাকে। দারুণ কথা বলেছে তো নিজাম। লোকটা শুধু বুদ্ধিমান নয়, তার প্রতিভা আছে। সেই প্রতিভাই হয়ত নাদির শাহের আজকের সম্বোধনকে গায়ে মাখতে দিচ্ছে না। নাদির শাহ্ এতদিন যে সমস্ত সম্মানসূচক শব্দ প্রয়োগ করতেন সম্বোধন করার সময় আজ সেগুলি উহ্য থেকে যাচ্ছে। নিজামও গায়ে মাখছে না। পরাক্রান্ত শত্রুর মনকে বশে আনতে হলে অমন অনেক কিছুর বেলায় অন্ধ ও বধির হতে হয়। আত্মসম্মানের চেয়ে দেশের সম্মান সেখানে আগে। রাজপুতরা এই ব্যাপারে বরাবর গুলিয়ে ফেলে। মারাঠীরা অনেক বেশি বাস্তববাদী।

নিজামের কথায় নাদির শাহ আর কিছু বলেন না। তাঁকে কিছুটা শান্ত দেখাচ্ছিল। কিন্তু সেই সময় তমাস খাঁ জালাইর উত্তেজিত হয়ে প্রবেশ করে।

নাদিরের ভ্রূকুঞ্চিত হয়। প্রশ্ন করেন— কি হয়েছে উকিল?

তমাস খাঁ জালাইর বলে — খাদ্যের ঘাটতি পড়েছে। অশ্বারোহীরা অসন্তুষ্ট। তাদের দিকে তাকানো যায় না হুজুর। দিন রাত এত পরিশ্রমের পরে তারা একটু খেতে পাবে, তাও জুটছে না।

নিজাম বুঝতে পারে তমাস খাঁ মারাত্মক খেলা খেলছে। সে নাদির শাহকে উস্কাতে চেষ্টা করছে। সে সফলও হয়।

নাদির হুংকার দিয়ে ওঠেন — এতবড় শহরে খাদ্য নেই। একথা বিশ্বাস করতে বল?

— তা বলছি না। তবে আপনার অনুমতি ব্যতীত তো হাত দেওয়া যায় না।

— কোথায় আছে খাদ্য?

— শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে পাহাড়গঞ্জে। সেখানে খাদ্যভাণ্ডার রয়েছে।

— কিছু সশস্ত্র অশ্বারোহী নিয়ে যাও। যারা গম কিনতে চায়, তাদেরও যেতে বল।

সিরবুলিন্দ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে — ওভাবে হবে না মেহেরবান। একটা মূল্য ধার্য করে দিতে হবে। নইলে অশান্তির সৃষ্টি হবে।

তমাস খাঁ কড়া ভাবে বলে — ওসব আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি দেখে নেব।

সে ছুটে চলে যায়।

নিজাম এবারে বলে — এখনি আপনার উকিলকে নিবৃত্ত করতে হবে শাহ্। দিল্লীবাসী ওই ভাণ্ডারের ওপর নির্ভর করে থাকে।

— তাই বলে আমার লোক না খেতে পেয়ে মরবে?

— কেউ মরবে না। তবে একটু সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মূল্য ধার্য করতে হবে।

— উকিল তো বলল, সে'দর ঠিক করে দেবে।

— তিনি শহরের হালচাল কিছু জানেন না। বাদশাহের তরফ থেকে একজন কেউ গেলে

সব কিছু বজায় থাকত। কারণ শুধু তমাস খাঁ অশ্বারোহীর দল নিয়ে গেলে স্থানীয় লোকদের মনে সন্দেহ দানা বাঁধবে। তাতে ঝঞ্ঝাট হতে পারে।

— কিছু হবে না। ওসব ঝঞ্ঝাট ঝামেলা কিভাবে মোকাবিলা করতে হয় তমাস খাঁ উকিল ভালরকম জানে।

— আড়তে যারা দানাশস্য রাখে, দরে না পোষালে তারাও বিক্ষুব্ধ হতে পারে।

— আঃ বড্ড বেশি বিরক্ত করছেন আপনি। যান টাকার যোগাড় করুন গে। আসল কাজ ফেলে রেখে এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

নিজামুল মুল্‌ক-এর আর কিছু বলার থাকে না। তবে তার এবং সিরবুলিন্দের আশঙ্কা বেড়ে যায়।

কুলসুম হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উমদেন্নেসার কক্ষে প্রবেশ করে। উত্তেজনায় তার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ। দিল্লীতে এখনো বেজায় ঠাণ্ডা, তবু কুলসুম ঘর্মাক্ত। সে তার ওড়না দিয়ে ঘাম মুছতে ভুলে যায়। তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে।

— কি হয়েছে রে কুলসুম।

— শাহাজাদা কোথায়?

— আমি কি করে জানব? তবে খুরশিদা বিদায় নেওয়ার পরে সে তো চরিত্রবান হয়ে উঠেছে। তুই-ই বলেছিস।

— আপনি রসিকতা করছেন বেগম সাহেবা? জানেন কি হয়েছে?

— বললে তো জানব।

— নাদির শাহকে বন্দী করে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে।

উমদেন্নেসা পালঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে — কী বলছিস তুই? স্বপ্ন দেখছিস?

— না। সবাই বলছে। রাস্তায় ছোটাছুটি। নাদির শাহের লোকজনকে দেখলেই খুন করে ফেলা হচ্ছে। সবাই ক্ষেপে গিয়েছে। কত আর সইবে? চূড়ান্ত অপমান করেছে ও আমাদের বাদশাহকে। আর পরিত্রাণ নেই।

— গুজবে বিশ্বাস করিস না। নাদির শাহ অত সোজা লোক নন।

— গুজব? আমির নিয়াজ খাঁয়ের বাড়িতে নাদির শাহ সিপাহি দিয়েছিলেন পাহারা দেবার জন্য। নিয়াজ খাঁ নিজে চেয়ে নিয়েছিলেন।

— কেন?

— নাদির শাহের সিপাহীদের ভয়ে। তারা মাঝে মাঝে হামলা চালায় বলে। বাড়িতে ওদের নিজেদের লোক দেখলে ওরা কিছু বলবে না।

— সে কথা অবশ্য ঠিক। অনেকেই তাঁর কাছ থেকে সিপাহী চেয়ে নিয়েছে নিজের বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য।

— নিয়াজ খাঁ নিজের হাতে তাদের সব কয়টাকে খুন করেছেন।

— সেকি ? কেন?

— নাদির শাহ তো নেই। ভয়টা কিসের? ওরা যত হিংস্রই হোক। মাথা যেখানে নেই, সেখানে ওরা কি করবে। মাথাতেই তো বুদ্ধি থাকে। ওরা সব লুকিয়ে লুকিয়ে রয়েছে। যে যেদিক দিয়ে পারে পালাচ্ছে।

— এত কথা তোকে কে বলল?

কুলসুম হাসতে হাসতে বলে — আমির নিয়াজ খাঁয়ের বাড়ির খিদমতগার রসুলকে দেখি সদর রাস্তায় দাঁড়িয়ে নাচছে। আমি ভাবলাম পাগল হয়েছে বুঝি। ও আমাদেরই গ্রামের আবদুল চাচার মেজ ছেলে। তাই কষ্ট হল। ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ও বলল "অমন হ্যাঁ করে দেখছ কি কুলসুম, তুমিও নাচ।" ওর মুখে শুনলাম ওদের বাড়ির সব কটাকে নিয়াজ খাঁ নিজে সাবাড় করেছেন। পথ ঘাট খাঁ-খাঁ। ভয়ে তাই চলে এলাম। শাহাজাদা কোথায়?

— আমি জানি না।

— খোঁজ করা দরকার।

— কিছু করতে হবে না। তোর কথা যদি সত্যি হয় তাহলে সব তো চুকেই গেল। শাহাজাদা আবার মধু খেতে শুরু করবে।

বাঁদী কুলসুম বেগম উমদেন্নেসাকে যে কথা বলল, তা কিন্তু এতটুকুও অত্যুক্তি নয়। তবে নাদির শাহের মৃত্যুসংবাদ নিছক গুজব। তমাস খাঁ পাহাড়গঞ্জে অশ্বারোহী নিয়ে গিয়ে যখন শস্যভাণ্ডার খুলে দেওয়ার হুকুম দেয়, তখন মজুতদাররা ঘোর আপত্তি জানায়। তমাস খাঁ বলে টাকায় দশ সের করে গম দিতে হবে। ওরা জানায় এই দুর্দিনে সেটা অসম্ভব। কারণ নাদির শাহের সৈন্যদের বাড়তি চাপে অন্যান্য শস্যভাণ্ডার নিঃশেষিত প্রায়। তমাস খাঁ ক্ষেপে গিয়ে জোর করে ভাণ্ডার খুলে দেয় এবং তার দলের অনেকে গম নিতে শুরু করে। এই সময় নিয়াজ খাঁ তার দলবল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। সে আড়তদার আর মজুতদারদের মনোভাব বুঝতে পেরে তাদের উসকানি দিতে থাকে। ফলে বহু লোক জমায়েত হয়। নাদিরের বিরুদ্ধে তাদের চরম বিদ্বেষভাব বাস্তব রূপ নেয়। ওখানে যে যে নাসিখচি বশী ছিল জনতা প্রথমেই তাদের খুন করল। তমাস খাঁ লুকিয়ে পালিয়ে গেল। এরপর গণ্ডগোল সারা দিল্লীতে ছড়িয়ে পড়ল। নাদিরের লোকজন একে একে খুন হতে লাগল।

উজির কামরুদ্দিনের জামাতা সৈয়দ নিয়াজ খাঁ নিজের বাসগৃহের প্রহরীদের খুন করে সন্তুষ্ট থাকল না। সে তার সাগরেদ শাহ্ নওয়াজ খাঁকে নিয়ে তাণ্ডব চালাতে থাকে। সে পাঁচশো অশ্বারোহীকে নিয়ে হস্তীশালায় হামলা করে। সেখানকার অধিকর্তাকে খুন করে সমস্ত হস্তী ছেড়ে দেয়। এই সময় সাদাত খাঁয়ের বাহিনীর অনেকে তার সঙ্গে যোগ দেয়। তারা প্রথম থেকেই শুধু পরাজয়ের মুখ দেখে এসেছে। সেই কারনালে যুদ্ধ শুরু হতে না হতেই পরাজয় বরণ। তারপর সেখানে বন্দীদশা। সেই পরাজয় তবু তারা সহ্য করেছিল, কিন্তু দিল্লীতে নাদির শাহ যে তাদের শাসনকর্তাকে চরম অপমান করেছেন এই খবরও পৌঁছেছিল তাদের কানে। অবশেষে ভগ্নহৃদয়ে সাদাত খাঁয়ের মৃত্যুবরণ তাদের মনে সহ্যাতিরিক্ত দাগা দিয়েছিল। তাই আজ সুযোগ পেয়ে তারা প্রতিহিংসা চরিতার্থতায় মত্ত হয়ে উঠেছে। তারা শুনেছে সাদাত খাঁয়ের বেগম ও পুত্রকন্যাদের নিয়ে আসতে একজন আমির গিয়েছেন অযোধ্যায়। তারা

বেগমের কাছে প্রমাণ করে দেবে, মৃত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনার সাধ্য না থাকলেও, তাঁর মনে সান্ত্বনার প্রলেপ মাখাতে কিছু অন্তত করতে পেরেছে।

একতরফা খুনখারাপি যখন চলছে দিল্লীর পথেঘাটে, তখন নাদির শাহের কাছে ছুটে ছুটে আসে তাঁর সেনারা, আমিররা। তিনি অটল। শেষে তমাস খাঁ এসে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলে নাদির শাহকে। তিনি একবার স্থির দৃষ্টিতে তমাসের দিকে চেয়ে বলেন — আমি বাদশাহের সঙ্গে একটু কথা বলে নিতে চাই।

বাদশাহকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি আসেন। নাদির শাহ তাঁকে বসতে অনুরোধ করেন। বাদশাহ ভাবেন অনুরোধের অর্থ হল আজ্ঞা। তিনি আসন গ্রহণ করেন।

নাদির শাহ প্রশ্ন করেন — বাইরে নাকি খুব গণ্ডগোল হচ্ছে। আপনি জানেন কিছু?

— আমিও তেমন শুনেছি।

— আপনার রাজধানীতে এসব হচ্ছে আমির ওমরাহদের পাঠিয়ে খবর নিয়েছেন?

— এইবার নেব ভাবছি। বড় বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

— কারা করছে এসব?

— ঠিক জানি না।

— আপনি মহলে গিয়ে বিশ্রাম করুন, আমি তমাস খাঁ এবং আরও দু-একজনকে নিয়ে নিজে দেখে আসছি।

— না না, ওভাবে যাবেন না। আপনার বিপদ ঘটতে পারে। শহরবাসীরা ক্ষেপে যেতে পারে।

নাদির শাহ হেসে বলেন — আমাদের যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। দেশে ফিরে যাওয়ার আগে হবেও না। আমি এখনো নিজেকে যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছি বলে মনে করি। তাই মৃত্যু যদি ঘটে, ঘটবে।

নাদির শাহ তাঁর দ্বিতীয় পুত্র নসরুল্লা মির্জাকে ডাকেন।

সে এসে দাঁড়ালে তিনি বাদশাহকে বলেন — আপনি তো জানেন এ আমার দ্বিতীয় পুত্র। বয়স মাত্র একুশ। এর বড়টি এখন আমার হয়ে পারস্য শাসন করছে। তার বয়স পঁচিশ। তবু এত কম বয়সেও ওরা বুঝতে শিখেছে জীবনটা কিরকম। ওরা জানে মৃত্যু যে কোন মুহূর্তে আসতে পারে। ওরা জানে ভুলের কোন ক্ষমা নেই। আমারই রক্তমাংস দিয়ে তৈরি এদের দেহ। তবু ভুল করলে আমি নিজে এদের মৃত্যুদণ্ড দেব এবং সেই দণ্ড কার্যকরী হয়েছে কি না নিজে দেখব।

বাদশাহ বিচলিত হয়ে বলেন — আপনি ভয়ানক কথা বলছেন।

— হ্যাঁ আপনার কাছে ভয়ানক, তবে আমাদের কাছে স্বাভাবিক। আমি আপনাকে কথা দিয়েছিলাম দিল্লীর কোন মানুষের ওপর আমার সিপাহীরা কোন রকম অত্যাচার করবে না। আমি জানি তারা আমার হুকুম মানবে। না মেনে তাদের গত্যন্তর নেই। কারণ আমাকে অমান্য করার একটাই অর্থ, মৃত্যু। তাই আমি কাসেম বেগ খাঁ, তমাস খাঁ উকিল আর আর আবদুল

বাকি খাঁকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে যাচ্ছি। আমি চাঁদনী চক অবধি যাব।

বাদশাহ ভেতরে ভেতরে কাঁপতে থাকেন। তিনি জেনেছেন নাদির শাহের লোকেরা বেশি মরছে। দিল্লীবাসী ক্ষেপে গিয়ে যথেচ্ছভাবে তাদের হত্যা করছে। তিনি নাদিরের দিকে দু পা এগিয়ে এসেও থেমে যান। তিনি জানেন, নাদির দুর্নিবার। তাঁর গতি রুদ্ধ করার চেষ্টা করে লাভ নেই।

কেল্লার বাইরে এসেই নাদির শাহ চারদিকে একবার দৃকপাত করেন। তিনি দেখেন তাঁর দুর্ধর্ষ অশ্বারোহীর দল আদেশের অপেক্ষায় সারি সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে। অদূরে এবং আরও দূরে চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ছোটাছুটিও করছে অনেকে। তিনি জানেন, অধিকাংশ মানুষই ভীতু। তারা অনেক সময় সামান্য কারণে কিংবা বিনা কারণেই চিৎকার করে দৌড়োদৌড়ি করে। নিজের চোখে সব দেখতে হবে। তবে তার আগে একটি বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে হবে। সৈয়দ নিয়াজ খাঁয়ের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। লোকটার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। উজির কামরুদ্দিন খাঁয়ের জামাতা হিসাবে সে একটু বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। সেই সুবাদে নিজের গৃহে সে তুর্কী সিপাহী মোতায়েন করেছিল। একজন চর এসে খবব দিয়ে গিয়েছে সেই সিপাহীদের সে স্বহস্তে হত্যা করেছে। শুধু তাই নয় সে শাহ নওয়াজ বলে একজনকে সঙ্গে নিয়ে হস্তীশালা আক্রমণ করে সব নষ্ট করেছে। বাদশাহ তো মূর্খ। তাঁর ধমনীতে কোনদিন তৈমুরের রক্ত থাকলেও আলস্যে আর অবহেলায় সেই রক্তের স্রোত জমাট বেঁধে গিয়েছে। তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল আলস্যে আর বিলাসিতায় কালাতিপাত করা। যে মানুষ গণনা আর তুকতাকে বিশ্বাস করে তার জীবনে সক্রিয়তা বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাই আজ তিনি নিজের রাজধানীতে থেকেও অন্যের পদানত। কিন্তু এখনো কিছু দেখতে বাকি রয়েছে তাঁর। নাদির শাহের সেই মূর্তি এখনো দেখেননি তিনি।

বাকি খাঁকে দুইশত অশ্বারোহী সমেত তিনি পাঠান নিয়াজ খাঁয়ের অনুসন্ধানে। হুকুম দেন তাকে খুঁজে পাওয়া গেলে প্রকাশ্য রাজপথে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় যেন। তাঁর আদেশের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

অশ্বপৃষ্ঠে তিনি এগিয়ে যান নগরীর মধ্যস্থলের দিকে। কিছু কিছু মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন এবং তারা সব তাঁরই দলের লোক। তাঁর রক্ত ফুটতে শুরু করে। সঙ্গীরা তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পারে ঝড় আসন্ন। তারা বারবার তাঁকে সাবধান করে দেয়। এভাবে জীবন বিপন্ন না করতে তারা সাধ্যসাধনা শুরু করে। তিনি অবিচল। ওদের কথার কোন জবাবও তিনি দেন না। এগিয়ে চলেন তিনি। আগে পাহাড়গঞ্জ, তারপর চাঁদনী চক। নিজের চোখে তিনি দেখতে চান। তারপর ব্যবস্থা। শত হলেও তিনি কথা দিয়েছিলেন বাদশাহকে দিল্লীবাসী অত্যাচারিত হবে না তাঁর লোকের হাতে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে সেই কথা রাখার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তবু আর একটু দেখে নিতে চান।

ঠিক সেই সময়ে অজ্ঞাত স্থান থেকে বন্দুকের আওয়াজ শোনা যায়। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে একজন অশ্বপৃষ্ঠ থেকে ভূমিতে পড়ে ছটফট্ করতে থাকে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নেমে ঝুঁকে পড়ে দেখেন সে স্থির হয়ে গেল। তার অশ্বটি নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে

সঙ্গে ইষ্টক বর্ষণ শুরু হল তাঁদের লক্ষ্য করে। তিনি লাফিয়ে অশ্বে আরোহণ করেন। যে সমস্ত দলপতি তাঁকে রক্ষা করার জন্য তাঁর চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন — প্রতিটি গৃহে আগুন জ্বালিয়ে দাও, পুরুষ নারী শিশু কাউকে রেয়াত করবে না। প্রতিটি গৃহে লুঠ চালাবে। কোন ক্ষমা নেই কোন অনুকম্পা নেই। পাশের ওই মসজিদের শীর্ষ থেকে যেন আমি দেখতে পাই দিল্লীর আশেপাশে সর্বত্র ধূমউদগীরণ হচ্ছে। অধিবাসীরা ছোটাছুটি করেও যেন নিস্তার না পায়। সন্ধ্যা অবধি সময় দিলাম তোমাদের। শেষ করে দাও। তারপরে আমার কাছে গিয়ে খবর দেবে ওই রৌশনাদ-দৌলা মসজিদে। আমি ওখানে আছি। .

একটা হুংকার ওঠে। নাদির শাহ্ মসজিদে গিয়ে প্রবেশ করেন। আর তাঁর লোকজন সৈন্যসামন্ত শুরু করে দেয় চাঁদনী চক থেকেই। প্রথমে সোনার দোকান লুঠ শুরু হল। সেই সঙ্গে হত্যা। তারপর তুলোপট্টি। সবাই দিশেহারা। তারা নিরীহ নিরপরাধ মানুষ। কিন্তু আজ নাদিরের কাছে দিল্লীর প্রতিটি মানুষ অপরাধী। পাঁচবছরের শিশু অপরাধী, অশীতিপর বৃদ্ধ বৃদ্ধাও অপরাধী, গর্ভবতী রমণী অপরাধী, কিশোর-কিশোরী অপরাধী, রাস্তার মোড়ের অন্ধ খঞ্জ ভিক্ষুকও অপরাধী। ক্ষমা নেই। পারস্য থেকে অভিযান চালিয়ে যাবতীয় শক্তি যেন আজকের দিনের জন্য সঞ্চিত ছিল। কারনালের যুদ্ধ এর কাছে ছিল ছেলেখেলা। তাতে আর কতজনের মৃত্যু হয়েছে?

দ্বিপ্রহরের আগেই দিল্লীর আকাশ বাতাস ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ছেয়ে যায়। ক্রন্দন আর আর্তনাদে কান পাতা দায় হয়ে ওঠে। হারেমের সবাই নিজ নিজ কক্ষ থেকে বাইরে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ায়। এ কি হল? কেন এমন হল? অনেকে শুনেছে বিষপ্রয়োগে নাদির শাহের মৃত্যু হয়েছে। তারা হতবাক হয়। অনেকে আসল সত্যটি জানতে পেরেছে। তাদের হৃদকম্পন শুরু হয়। নাদির শাহ কি তাদেরও টেনে বের করে নিয়ে যাবেন? তাঁর হারেম নাকি খোলা আকাশের নিচে। তাঁর হারেমের রমণীরা শকটের পরিবর্তে সৈন্যদের সঙ্গে পা মিলিয়ে হেঁটে স্থান থেকে স্থানান্তরে যাতায়াত করে। তাদের দলে কেল্লার বেগমদের নিয়ে গিয়ে মিলিয়ে দেবেন না তো? তাহলে নির্ঘাত মৃত্যু। এত ধকল সইবে না। একটু আরাম, একটু বিলাসিতা থাকলে তার সাথে জাহান্নামে যেতেও তারা প্রস্তুত। কারণ বলশালী পুরুষ না হলে ভরসা করা যায় না। সেদিক দিয়ে নাদির শাহ নিজেকে খুবই বলশালী রূপে প্রমাণ করেছেন।

ওদিকে বৃদ্ধা পিতামহী মোহের পারভীরকে কেউ বলে এসেছে যে সারা দিল্লী শহর জ্বলছে। সেই থেকে তিনি ভগ্ন কণ্ঠে যত জোরে পারেন বাদশাহের ডাক নাম ধরে ডাকছেন। তিনি নিজের শয্যার ওপর বসে বলে চলেন — সব গেল। মান সম্মান গেল। প্রাণও যাবে এবারে। ভালই হবে। জুড়িয়ে যাবে।

মালিকা-অল-জুমানি বাদশাহকে বলেন — নাদির শাহ্কে বল, এসব বন্ধ করতে। সব যে শেষ হয়ে গেল।

— তিনি কেল্লাতে নেই।

— কোথাও না কোথাও আছেন। যেখানেই থাকুন, আমির পাঠাও। খুঁজে বের করুক।

— পাঠিয়ে হবে কি ?

— তিনি থামতে বলবেন, তাঁর লোকদের।

— ওরা শুনবে নাকি ? একবার স্বাদ পেয়েছে।

বেগম সাহেবা এবারে ভর্ৎসনার স্বরে বলেন — উনি হিন্দুস্থানের বাদশাহ নন, উনি নাদির শাহ। সৈন্যদল ওর বিশাল হলেও তাঁর অঙ্গুলি হেলনে সব চলে। নিজের সঙ্গে তুলনা করে ওঁর বিচার করবে না।

বেগম সাহেবা কখনো এভাবে স্বামীকে বলেননি। কিন্তু আজও যদি না বলেন কবে বলবেন ? আজকের দিনকে যে পৃথিবীব শেষ দিন বলে মনে হচ্ছে। আগামী কাল পূর্ব দিগন্তে সূর্যের উদয় হবে কি না কেউ বলতে পারবে না। তাই স্বামীকে সহজ সত্য কথাটা বলে দিলেন তিনি।

তাঁর কথায় বাদশাহ এতটুকুও উষ্মা প্রকাশ করলেন না। তিনি নম্রস্বরে বলেন — দেখি, নিজামুল-মুলক তো কেল্লাতেই রয়েছেন। তাঁকে পাঠাতে চেষ্টা করছি।

একটু পরেই নিজামকে পাওয়া গেল। বাদশাহকে দেখে নিজাম বলে ওঠে — এমন স্বপ্নেও ভাবিনি। চারিদিকে শুধু আগুন আর আগুন। রাস্তাঘাটে শুধু লাশ আর লাশ। বড় বড় কাঠের কড়ি-বরগা আগুনে পুড়ে সশব্দে ভেঙে ভেঙে পডছে। সেই সঙ্গে পড়ছে অট্টালিকা। চোখে দেখা যায় না খোদাবন্দ। শুনলাম প্রায় প্রত্যেক গৃহে রমণীরা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। অনেকে বিষপান করেছে। তারা জানত নাদির শাহের লোকের কাছে তারা জঘন্যতম ভাবে অত্যাচারিতা হবে। শিশুরা মরে পড়ে রয়েছে। কারও গলায় পা চাপা দিয়ে মারা হয়েছে। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে কারও মাথা চৌচির করে দেওয়া হয়েছে। উঃ আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব।

— বন্ধ করুন।

— কি করে ?

— নাদির শাহকে বলে।

— তাঁকে কোথায় পাব ?

সেই সময় কামরুদ্দিন এসে বলে — আমি জানি, তিনি কোথায় আছেন।

— কোথায় ?

— সোনার গম্বুজ মসজিদে।

— রৌশনাদ-দৌলা মসজিদে ?

— হ্যাঁ। সেখানে বসে তিনি সৈন্যদের পরিচালনা করছেন।

বাদশাহ বলেন — আপনারা দুজনা এখনি যান, গিয়ে ওঁকে বলুন, আমার অনুরোধ, আর নয়, এবারে বন্ধ করুন।

কামরুদ্দিন বলেন — শুনবেন উনি ?

— মনে হয় শুনবেন।

দুজনা কেল্লা থেকে বেব হয়। বাস্তাঘাটের দিকে তাকানো যায় না। শুধু রক্তনদী আর মৃতদেহের ছড়াছড়ি। বড় বড় অট্টালিকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অধিবাসীদের অধিকাংশই

বেঁচে নেই। বাকিরা কোথায় গিয়ে লুকিয়েছে কেউ বলতে পারে না। ওরা যে রাস্তা ধরেছিল, সেই রাস্তার ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গিয়েছে। এখন এই মহল্লা ছেড়ে অন্য দিকে গিয়ে তাণ্ডব শুরু করেছে। আর্তনাদ আর হৈ চৈ কান পাতলেই শোনা যায়। সেই সঙ্গে গলগল করে ধোঁয়া উঠে আকাশের দিকে ধাওয়া করছে। তারাও যেন নাদির শাহের লোকদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়।

স্বর্ণ-গম্বুজ মসজিদের দিকে যেতে যেতে উজির কামরুদ্দিনের বুক কাঁপে। কন্যা এসে তাকে জামাতার কাণ্ডকারখানার কথা সব খুলে বলেছেন। শুনে চমকে উঠেছিল কামরুদ্দিন। এমন মূর্খের মত কাজ কেন করতে গেল কে জানে। কন্যা বলেছে সে গুজবে বিশ্বাস করেছিল। উজির কিন্তু কন্যার কথা বিশ্বাস করেনি। সৈয়দ নিয়াজ খাঁ অত কাঁচা বুদ্ধির মানুষ নয়। আসলে সে নিশ্চয় একটা বিদ্রোহের সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এবং ভেবেছিল সে কৃতকার্য হবে। কিন্তু হয়নি। নাদির শাহকে সে চিনতে পারেনি। তার একাজ নাদির শাহের কানে পৌঁছেছে কি না কে জানে। যেভাবে জালের মত তাঁর লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে কানে না যাওয়ার কথা নয়। তাই যত মসজিদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে উজির তত তার বুক যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

অবশেষে মসজিদে পৌঁছোয় দুজনা। নাদির শাহ্ তাদের মসজিদের ওপর থেকে ডাকেন। তারা সেখানে গেলে, সেখান থেকে শহরের অনেকটা অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। তখনো অনেক জায়গায় আগুন জ্বলছে।

নাদির নিষ্ঠুর হেসে বলে — এবারে ওই পুব দিকটা শুরু করব। ওদিকে এখনো হাত পড়েনি।

নিজাম বলে ওঠে — না না আর নয় খোদাবন্দ। এবারে ওদের রক্ষা করুন।

— কেন? বাদশাহ্ পাঠিয়েছেন বুঝি?

— হ্যাঁ, নইলে আপনার কাছে আসতে সাহস পেতাম না।

— আমি তেমনই অনুমান করেছিলাম। বেশ আর কিছুক্ষণ পর থেকে শান্তি বিরাজ করবে শহরে। অপরাহ্নের পর থেকে আর একটিও রক্তপাতের ঘটনা ঘটবে না। আগুনও লাগানো হবে না। কিন্তু বাদশাহ্কে যে একটা অনুরোধ করতে চাই। অনুরোধটা যেন থাকে।

— নিশ্চয়ই থাকবে।

— আপনারা দুজনা রয়েছেন। তবে উজির কামরুদ্দিনের মন খারাপ থাকবে, তাই নিজামকেই ভার দিতে চাই।

নিজাম বলে — বলুন কি করতে হবে।

— খান দউরান আর সাদাত খাঁ দুজনাই মৃত। তাঁদের যে সম্পদ রয়েছে, যে হীরা মজুত রয়েছে সবই দুএকদিনের মধ্যে আমার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এর অন্যথা হলে চলবে না।

কামরুদ্দিন আর কথোপকথনের মধ্যে থাকতে পারে না। নাদির শাহ হঠাৎ কেন বলতে গেলেন যে তার মন খারাপ থাকবে? তিনি কি নিয়াজের কথা এর মধ্যেই জেনে গিয়েছেন?

নিজামুল মুল্ক বলে — এ আর বেশি কি? বাদশাহ নিশ্চয় রাজি হবেন।

— আমার আরও অনেক দাবিই তো রয়েছে। আমার ন্যায্য পাওনা অর্থই এখনো মিটল না।

নিজাম মরিয়া হয়ে বলে ওঠে — সব হবে। আপনি খুন বন্ধ করুন। ওই দেখুন আপনার লোক কিভাবে ওই কিশোর দুটিকে কুপিয়ে মেরে ফেলল। এ যে চোখে দেখা যায় না।

নাদির শান্ত কণ্ঠে বলেন — আপনাদের হিন্দুস্থানের মানুষ বলে অমন মনে হচ্ছে। ওরা যদি আমার কেউ হত আপনার ভালই লাগত।

— না না। আমরা এভাবে নিরাপরাধীদের গায়ে হাত দিই না। ওসব আমাদের ঐতিহ্যে নেই। আপনি ভালভাবে খোঁজ নেবেন।

— কি জানি। এমনিতেই এতবড় সাম্রাজ্য গড়ে উঠল গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে?

উত্তেজিত নিজামুল মুল্‌ক একদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে — ওই দেখুন ঘর থেকে টেনে বের করে ওই নারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আপনার লোক।

— বাদশাহ্ তাহলে সত্যিই শান্তি চান?

— হ্যাঁ, হাজার বার শান্তি চান।

— মনে থাকে যেন আমার দাবির কথা।

নাদির শাহ্ একজনকে ইঙ্গিত করলেন। সেই লোকটি সঙ্গে সঙ্গে আর একদিকে হাত ওঠালো।

প্রচণ্ড শব্দে নাকাড়া বাজতে শুরু করল মসজিদের পাশের একটি চাতাল থেকে। ক্রমাগত বাজতেই থাকে। নিজাম বিস্মিত হয়ে দেখে যারা এতক্ষণ আক্রমণ চালাচ্ছিল তারা থেমে গেল। হাত গুটিয়ে নিয়ে তারা সবাই রাস্তার ওপর এসে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল।

নাদির শাহ বলেন — যতদূর এই শব্দ শোনা যাচ্ছে প্রতিটি স্থানে আমার লোকেরা এইভাবে সব ছেড়ে দিয়ে রাস্তার ওপর সারিবদ্ধ হয়ে দাড়িয়েছে এতক্ষণে। তারা অপেক্ষা করছে তাদের নিজেদের দলপতি কখন এসে ছাউনিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

উজির কামরুদ্দিন পর্যন্ত সব ভুলে বিস্মিত হয়ে বলে ওঠে — অবিশ্বাস্য।

নাদির বলেন — কতকিছু অবিশ্বাস্য ঘটে যায় উজির সাহেব। তবে কোন কিছু করতে গেলে তার আগে দীর্ঘদিনের অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। নিজের তাঁবের লোকদের হঠাৎ একত্রিত করে কোন জায়গায় হামলা চালানো হয় না। তাতে স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না। অন্যাকে বিরক্ত করা হয় মাত্র। তার ফল মারাত্মক। আমি আপনাদের বলেছি আমার নিজের পুত্রও যদি এমন কাঁচা কাজ করে তাহলে সে চরম শাস্তি পাবে।

— আপনি আমাকে এত কথা বলছেন কেন? প্রথমেই বলেছিলেন আমার মন খারাপ থাকবে। কেন?

নাদির একটু হেসে বলেন — আপনার জামাতা অন্যায় করেছিলেন। তাঁকে পাহাড়গঞ্জের মোড়ে লটকে দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গী শাহ নওয়াজও পাশাপাশি ঝুলছে। দুটিতে মানিয়েছে বেশ। আমার দুই পুত্র ওইরকম কিছু করলে তাদেরও একই দশা হত। ওতে আমার আফসোস হয় না।

কামরুদ্দিন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। নিজাম তার পাশে বসে পড়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকে। কামরুদ্দিন লোকটা মানুষ হিসাবে ভাল। তাছাড়া সে তার কুটুম্বও বটে।

সেইদিনই রাতে নাদির শাহ হুকুম দেন যত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে তাদের মৃতদেহ হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে একত্রিত করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হোক। যে সব অট্টালিকা পুড়ে নষ্ট হয়েছে তাদের কড়ি বরগা ইত্যাদি যেন এই দাহ কার্যে ব্যবহার করা হয়। তিনি নিজে দেখতে চান পরদিন একটিও মৃতদেহ যেন কোথাও পড়ে না থাকে। কোতোয়াল হাজি ফালাদ খাঁয়ের ওপর তিনি দায়িত্ব দেন। বলেন সুচারুরূপে এই কাজ করতে পারলে তার পদোন্নতি হবে। সে সমস্ত দিল্লী নগরীর কোতোয়াল। এখানকার পারসিক, হিন্দুস্থানী সব অধিবাসীর ভালমন্দের ভার তার ওপর।

পরদিন দিল্লীর পূর্বাকাশে নতুন সূর্যের উদয় হল। আগের দিনের দুষ্কৃতির চিহ্ন বহন করে দিল্লী জেগে উঠল। চাপা কান্না শোনা গেলেও কোথাও কোন হৈ চৈ নেই। বরং অস্বাভাবিকভাবে শান্ত দিল্লীর এই পরিবেশ। কয়েক লক্ষ মৃত সন্তানের শোক নগরী নীরবে সহ্য করে যাবে। তার বুক ফাটবে কয়েক দশক ধরে। তার কণ্ঠে তো স্বর নেই যে কাঁদবে। তবে এদশা তার বহু আগে একবার হয়েছিল। সেবারে তৈমুর এসেছিল। সেই তৈমুর নাদির শাহের আদর্শ। সুতরাং তিনি তৃপ্ত। ঐতিহ্যশালী কোন বংশের ধারক না হওয়ার যে ক্ষোভ, শিক্ষায় দীক্ষায়, রুচিশীল হতে না পারার হীনম্মন্যতা, আরও হাজার রকমের অভাব তাঁকে যে দগ্ধে দগ্ধে মারছিল, রক্তস্নাতা দিল্লীকে দেখে তিনি হয়ত কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন। অতীত গৌরব ধুয়ে ধুয়ে অনেক কাল কাটিয়েছে এরা। তাই তিনি এসেছেন আর এক তৈমুর হয়ে। এরা তাঁকে তোয়াজ করতে বাধ্য। কারণ নিজেদের পূর্বপুরুষ আসল তৈমুরের কথা এরা ভুলেছে। ফলে যোগ্যতাও হারিয়েছে।

এবারে হিসাব-নিকাশ। নাদির শাহ বিস্মিত হন বাদশাহ মহম্মদ শাহের কথা ভেবে। এত কিছুর পরেও তাঁর হুশ হল না। এখনো অর্ধনিদ্রিত। তিনি বাদশাহকে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে যে সব আমির-ওমরাহ এতদিন তাঁকে ঘিরে রেখেছিল এবং এখনো রেখেছে তারা সবাই বিশ্বাসঘাতক। একমাত্র খান-দউরান এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত কেউ তাঁর মঙ্গল চায়নি। তাঁর দুর্ভাগ্য যে খান দউরান যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় নিহত হলেন।

তাঁর কথা শুনে বাদশাহ বলেছিলেন — কেন? নিজাম, সাদাত খাঁ, এঁরা যথেষ্ট বিশ্বাসভাজন।

— আপনি অন্ধ। আপনি জানেন না এরা দুজন আমাকে পত্র দিয়ে হিন্দুস্থানে ডেকেছিল। একথা বলতাম না। কিন্তু এখনো আমি আপনার মঙ্গল চাই। আমি চলে যাওয়ার পরে যাতে আপনি আবার বিপদে না পড়েন সেজন্য সাবধান করে দিচ্ছি মাত্র। এখন আমার কথা শোনা আর না শোনা আমার অভিরুচি। যাহোক, আপনাকে আমি চিনে নিয়েছি। এখান থেকে যা কিছু প্রাপ্য আমি নিজের উদ্যোগেই নেব। খান দউরান আর সাদাত খাঁয়ের সব কিছু পেয়ে

গিয়েছি। তার এক ভাইপো সফদর জং আর জামাতা আবুল মনসুর খাঁ সব মিটিয়ে দিয়েছে।

থমথমে মুখে বাদশাহ বলেন — শুনেছি।

— আরও অনেক আমির ওমরাহের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি।

— শুনেছি।

— আপনার কষ্ট হচ্ছে না? রাগ?

— কত পুরুষের সম্পদ ওগুলো। মনে ব্যথা তো লাগেই।

— আপনার জায়গায় আমি হলে কি করতাম জানেন?

— কি ?

— এই মুহূর্তে আপনাকে খুন করতাম, কিংবা নিজে আত্মহত্যা করতাম। পৃথিবীতে এত ঐশ্বর্য থাকতে পারে আমার ধারণায় ছিল না। শুধু দিল্লী বোধহয় গোটা পৃথিবীকে কিনতে পারে। আমি জানি, এখনো আপনার জিনিসে হাত পড়েনি আমার। সেগুলোও নিয়ে যাব। তবু আমার দুটো বিষয়ে আফসোস রয়ে যাবে। দুটো কর্তব্য আমি অপূর্ণ রেখে যাচ্ছি। জেনেশুনেই রেখে যাচ্ছি।

বাদশাহ নীরব থাকেন।

— আপনার জানতে ইচ্ছা হল না কোন্ দুটি অপূর্ণ রেখে যাচ্ছি?

— অন্যের বিষয়ে কৌতূহলী হওয়া শোভনীয় নয়। আমার স্বভাবও নয়।

— আশ্চর্য! শুনেছি আপনাদের বংশে অনেকে কিতাব লেখেন। এ বংশে কোথা থেকে ওসব এল বুঝতে পারি না। তবে ওসব জিনিস কোন বাদশাহ বা সুলতান বংশে যে থাকা ভাল নয়, এই জ্ঞান আমার হল। কৌতূহলও থাকবে না, সক্রিয়তাও থাকবে না — তাহলে দেশ চালাবেন কি করে? কিতাব লিখে লিখে?

— তেমনও হয়েছে দিল্লীতে।

— সেইজন্যেই বোধহয় বারবার বিদেশীরা এসে আছড়ে পড়ে অল্প আয়াসে লুটেপুটে নিয়ে যায়।

— হয়ত।

— আচ্ছা ওই দুটো কাজ ফেলে রাখার জন্য দেশে গিয়ে কি আমার আফসোস হবে?

— আমাকে স্পষ্ট না বললে বুঝতে পারব না।

— একটা হল, নিজামুল মুলক্-এর মত চতুর শয়তান বিশ্বাসঘাতককে আস্ত রেখে যাওয়া। আমার উচিত ছিল ওকে শেষ করে দেওয়া। কতকগুলো কারণে পারলাম না। ওই শয়তান হয়ত আপনার কোন কাজে লেগে যাবে। আর দ্বিতীয়টা?

বাদশাহ বলেন — বলুন।

— আপনাকে তক্ততাউস থেকে সরিয়ে অন্য কাউকে বসিয়ে না যাওয়া।

বাদশাহ মহম্মদ শাহ নীরব থাকেন। তাঁর মুখমণ্ডলে যদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোন রেখা ফুটেও ওঠে সেটি দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি পূর্বের মতই বসে থাকেন। যে স্থানে মান অপমানের মত পার্থিব অনুভূতি বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা হাত পায় না, তিনি যেন সেই জায়গায় বসে রয়েছেন।

নাদির শাহ এই ধরনের মানুষের সঙ্গে আগে কখনো যোগাযোগ করেননি। হিন্দুস্থান আক্রমণের ফলে এটি একটি অভিনব অভিজ্ঞতা। একটা বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েও কী অদ্ভুত মানসিকতা।

নাদির শাহ নিজের গরজে প্রশ্ন করেন -- কী, কোন মন্তব্য করলেন না যে?

বাদশাহ এবারে বলেন --- শুনতে চান?

— নিশ্চয়।

-- আমাকে রেখে কিংবা সরিয়ে দিয়ে অথবা নিজামকে বাঁচিয়ে রেখে বা মেরে ফেলে আপনি হিন্দুস্থানের ইতিহাসের ছিটেফোঁটা পরিবর্তনও আনতে পারবেন না। যেভাবে চলছে সেইভাবেই গড়িয়ে গড়িয়ে চলবে। আমাকে সরিয়ে কাকে বসাবেন? মোগল বংশে তেমন কর্মিৎকর্মা এখন কেউ নেই। আমি জানি আপনি কোন আফগান বা কোন হিন্দুকে ডেকে আনবেন না। সুতরাং আমিই থাকব। লোকে আমাকে চেনে, জানে, আমি লোকটা অত্যাচারী নই। 'জিজিয়া' তুলে দিয়েছি বলে আপনি দোষারোপ করেছেন বরবার। ওতেই আমি জনপ্রিয়। কারণ যাদের আপনি অবিশ্বাসী বলে গণ্য করেন, তাদের সংখ্যা এদেশে অনেক বেশি। তাছাড়া তাদের ওপর বাড়তি বোঝা চাপাব কেন? অন্য ধর্মের বলে? ওসব আপনার দেশে চলতে পারে, এখানে চলবে না। তাই আলমগীরের মত ব্যক্তির সাম্রাজ্যও টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আর নিজামের বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলছেন? কে বিশ্বাসঘাতক নয়? তবু সব কিছু নিয়ে এই বিশাল দেশ গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে। আপনাদের মত কেউ কেউ মাঝে মাঝে এসে সজোরে ধাক্কা দেয়। খুব কষ্ট হয়। তারপর আবার সব ঠিক হয়ে যায়। যে দেশ অবিরল সম্পদ সৃষ্টি করে চলেছে, সেই দেশের কত সম্পদ আপনারা অপহরণ করবেন? কয়েকবছর খুব অসুবিধা হবে। আবার গড়িয়ে গড়িয়ে চলবে। নিয়মিতভাবে এদেশ থেকে যদি সম্পদ চলে না যায় তাহলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে বেশিদিন সময় লাগে না। এদেশকে দীনহ করে দেওয়ার সাধ্য আপনাদের কারও নেই। অস্ত্রের বড়াই যতই করুন।

নাদির শাহ স্তম্ভিত হয়ে যন। যে মানুষটাকে নিষ্কর্মা অপদার্থ ভেবে অবহেলা করেছেন, প্রকারান্তরে অপমানও করেছেন, সেই মানুষটার চিন্তা কত গভীর। ইনি যেন দার্শনিক। উন্নত মস্তক তাঁর নুয়ে আসতে চায়। তবু জোর করে তিনি সোজা রাখেন। এদেশের জলবায়ু বড় খারাপ। ভাবালুতা এনে দেয়। তাতে তাঁর চলবে না। কারণ তাঁর দেশ এত ঐশ্বর্যশালী নয়। তাঁর দেশকে চিরকাল এই ভাবেই অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। ওদিকে তুরস্ক হুমকি দিচ্ছে। যদিও সেই দেশের একটি অংশের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। সেই দেশের ভাষা তাঁর মাতৃভাষা। মহম্মদ শাহকেও তাই তাঁর সঙ্গে অধিকাংশ সময়ে তুর্কী ভাষায় কথোপকথন চালাতে হয়েছে। তাই বলে মহম্মদ শাহকে সম্ভ্রম জানাতে গিয়ে কিছু কম নিয়ে গেলে চলবে না।

— আপনার মীর বক্সী আগামী কাল আপনার কোষাগারের ফর্দ আমায় দেবেন বলেছেন। মিলিয়ে দেখতে হবে।

— দেখবেন।

— আপনার তোপখানায় যে সমস্ত দ্রব্য রয়েছে তার মূল্যও শুনলাম কয়েক কোটি টাকা হবে।

— হতেই পারে।

— আপনি জানেন না?

— না, দরকার পড়েনি। তবে এবারে জানতে হবে। কারণ প্রজাদের জানার অধিকার আছে। তারা দাবি করবে না কখনো। দাবি করার কথা কল্পনাও করে না। তবু আমি নিজে থেকে জানাব ভাবছি।

— আমি কাল অপরাহ্ণে আপনাকে সমস্ত জিনিসের একটা তালিকা দেব। জীবনে কোন কিছু অস্পষ্ট রাখা আমার স্বভাব নয়।

— খুব ভাল অভ্যাস।

পরদিন তালিকা প্রস্তুত করে নাদির শাহ একবার ভাবেন, বাদশাহকে ডেকে পাঠাবেন। পরে কি ভেবে খবর পাঠালেন, মহম্মদ শাহকে যে তিনি নিজেই আসছেন তালিকা নিয়ে।

বাদশাহ তাঁর শয়নকক্ষ সংলগ্ন একটি আলোবাতাসযুক্ত কক্ষে নাদির শাহকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি আসন গ্রহণ করলে একজন সুসজ্জিতা পরিচারিকা মণি-মাণিক্য খচিত সুদৃশ্য পাত্রে তাঁর কাছে গিয়ে শরবত নিয়ে দাঁড়ায়।

নাদির শাহ শরবতের কথা ভুলে পাত্রটির দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে বলেন — এটি তো খুবই মূল্যবান দেখছি।

— হতে পারে।

নাদির শাহ একটু ইতস্তত করেই পাত্রটি তুলে নিয়ে ওষ্ঠে স্পর্শ করেন। তারপর পান করতে করতে বলেন — এখন বুঝতে পারছি আপনার কাছে মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রীর কোন হিসাব নেই কেন? এই সব জিনিস আপনি প্রতিনিয়ত দেখছেন, ব্যবহার করছেন। এদের মূল্য বুঝতে হলে যে অভাববোধ থাকতে হয় যে আকাঙ্ক্ষা থাকতে হয় আপনার মধ্যে সেটি সৃষ্টি হয়নি। কারণ আপনারা কল্পনাতীত প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছেন।

বাদশাহ সেই প্রসঙ্গে না গিয়ে স্মিত হেসে বলেন — আপনি বিনা দ্বিধায় শরবত পান করলেন। সন্দেহ হল না? এইটাই তো আপনাকে হত্যা করার প্রকৃষ্ট সময় ছিল।

— ঠিক বলেছেন। একটু দ্বিধাবোধ ছিল আমার। তবু আপনাকে অবিশ্বাস করতে পারলাম না।

— হিন্দুস্থান আক্রমণের ফলে এইটাই আপনার সবচেয়ে বড় লাভ।

— হ্যাঁ, ব্যক্তিগত ভাবে হয়ত তাই। কিন্তু আমি কখনো আপনার মত দেশকে এবং দেশের মানুষদের অবহেলা করি না। 'জিজিয়া' চালু হলে অনেকের অসুবিধা হলেও, রাজকোষ পূর্ণ হত। তাই দিয়ে ইচ্ছা করলে আপনি অনেক কিছু করতে পারতেন। তবে আপনার হয়ত প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে প্রতি কণা খাদ্যশস্য, প্রতিটি সুবর্ণমুদ্রার মূল্য অপরিসীম। আপনার মত দুহাতে অপচয় করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আসলে আমরা দুজনা দুই পথের পথিক। আমাদের দেশ এবং পরিবেশের পার্থক্য আমাদের এমন করে গড়ে তুলেছে।

— এটাই খাঁটি কথা।

নাদির শাহ এবারে তাঁর তৈরি ফর্দটি বাদশাহের হাতে দেন।

১।	বাদশাহ্ ও ওমরাহদের হীরা মণিমাণিক্য ইত্যাদি	- পঁচিশ কোটি টাকা
২।	বাসনপত্র ও মণিমাণিক্যখচিত অস্ত্রসমূহের হাতল ও ময়ূর সিংহাসন	-- নয় কোটি টাকা
৩।	স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা	- পঁচিশ কোটি টাকা
৪।	স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত গলানো ভোজন পাত্র	পাঁচ কোটি টাকা
৫।	অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র, মসলিন ইত্যাদি মূল্যবান দ্রব্য	- দুই কোটি টাকা
৬।	আসবাবপত্র এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী	-- তিন কোটি টাকা
৭।	যুদ্ধে ব্যবহারের যোগ্য অস্ত্রাদি ও কামান	১ কোটি টাকা
৮।	হস্তী	একহাজার
৯।	অশ্ব	- সাত হাজার
১০।	উষ্ট্র	— দশ হাজার
১১।	খোজা	- একশত
১২।	মুনশী	- - একশত ত্রিশ
১৩।	কর্মকার	- দুইশত
১৪।	রাজমিস্ত্রী	-- তিনশত
১৫।	ছুতোর মিস্ত্রি	দুই শত
১৬।	ভাস্কর ও পাথর কাটার মিস্ত্রী	একশত

বাদশাহ ফর্দটি হাতে নিয়ে পড়তে পড়তে এক জায়গায় থেমে যান তাঁর মুখ বেদনাক্লিষ্ট হয়ে ওঠে। তবু শেষ পর্যন্ত পড়ে যান।

নাদির শাহ্ বলেন — ফর্দটি আপনি রেখে দিন। আপনার মীর বকশীকে দেবেন।

— কিছুই বাকি রাখেননি।

— উপায় নেই। আমার সিপাহীরা বহুদিন দেশছাড়া। তাদের পাওনা একবার মিটিয়েছি। এবারে আরও বেশি দিতে হবে। তাছাড়া পারস্যের অবস্থা ভাল নয়।

-- আমার একটি অনুরোধ রয়েছে।

— না। কোন অনুরোধ নয়। এটিই চূড়ান্ত। এর মধ্যে কোনরকম আপস চলবে না। আমি জানি আপনি কিসের কথা বলছেন। কারণ তাই নিয়ে রাস্তাঘাটে শুনছি অনেক আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমি কোন কথা বলতে চাই না। আমি যে হিন্দুস্থান বিজয় করেছি সেটাই হবে তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। জানি না পরে সেটিকে কেউ গলিয়ে ফেলবে কি না। খুব অভাবে না পড়লে আমি অন্তত সেটিকে আস্ত রাখার চেষ্টা করব।

— বুঝতে পেরেছেন দেখছি। আপনার এই পদক্ষেপ অনুমান করে হারেমে কয়েকদিন আগে থেকে কান্নার রোল উঠেছে। ময়ূর সিংহাসন শুধু হারেমের নয়, এদেশের মানুষের অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে রয়েছে।

— সেই জন্যেই তো ওটি পেতে আমি সবচেয়ে বেশি আগ্রহী।

বাদশাহ নীরব থাকেন।

কোটি কোটি টাকার হীরা জহরত স্বর্ণ রৌপ্য নিঃশব্দে হাতবদল হল কেউ জানতেও পারল না। জানলেও, ভ্রূক্ষেপ করল না। কিন্তু যেদিন রব উঠল নাদির শাহ আজকে ময়ূর সিংহাসন নিয়ে যাবেন তাঁর নিজের আস্তানায় সেদিন সহস্র সহস্র মানুষ ছুটে আসে কেল্লার প্রাকারের কাছে। আগে থেকে নাদির শাহের অগণিত অশ্বারোহী কেল্লা ঘিরে রাখে। কিন্তু তাদের কেউ ভয় পায় না। দিল্লীবাসী হিংস্র নয়, তারা কাতর এই বিশেষ দিনটিতে। অনেকে হাহাকার করে, অনেকে চোখের জল ফেলে। তাদের প্রাণ-ভ্রমর আজ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে ওরা। ময়ূর সিংহাসনের প্রতিটি মণি মাণিক্যের অণুতে পরমাণুতে স্বর্ণ রৌপ্যের পরতে পরতে মিশে রয়েছে তামাম হিন্দুস্থানের মর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধ।

বাইরে থেকে ভেসে আসছে আক্ষেপ ও বিলাপের ধ্বনি। নাদির শাহ অস্বস্তি অনুভব করেন। তাঁর মনে হয় এইভাবে যদি দলে দলে এদেশের অধিবাসী খালি হাতেও ছুটে আসে তাহলে তাঁর সমস্ত বাহিনী ভেসে যাবে। তাঁর ভয় হয় এরা বুঝি কেল্লার ফটকের ওপর আছড়ে পড়বে। তাহলে আর উপায় নেই।

সেই সময় অন্যদিকে কেল্লা শীর্ষ থেকে একাকী বাদশাহ মহম্মদ শাহ এক দৃষ্টে চেয়ে ছিলেন দেওয়ান-ই খাসের দিকে। কিন্তু বেশিক্ষণ ওভাবে থাকলেন না। পায়চারী করতে শুরু করেন—একবার এদিকে, একবার ওদিকে। বাইরের কোলাহল তাঁর কানে এসে ধাক্কা খায়। অস্থির করে তোলে তাঁকে।

সেই সময় স্বয়ং বেগম সাহেবা সেখানে এসে উপস্থিত হন।

— তুমি।

— চলে এলাম। তুমি পালিয়ে এসেছ। আমি কিন্তু পালিয়ে আসিনি। আমি এসেছি পিতামহী মেহের পরভিরের হুকুমে।

— একটু একাও থাকতে পারব না? এখনো হুকুম?

— নাদির শাহের হুকুমের চেয়ে এই হুকুম সহস্রগুণ মিষ্টি। অবশ্য যদি সেই বোধ তোমার থাকে।

— চল।

মালিকা-আল জুমানি বুঝতে পারেন শাহানশাহের মন একেবারে ভেঙে গিয়েছে। নইলে তিনি একটা কিছু বলতেন। তিনি জানেন বাইরে যেমন দেশবাসীর বাঁধভাঙা ঢেউ, কেল্লার ভেতরেও তেমনি প্রতিটি ঝরোখায়, প্রতিটি বাতায়ন আর গবাক্ষের কাছে হারেমের রমণীদের ভিড়। সবাই দেখতে চায় সত্যিই ময়ূর সিংহাসন স্থানচ্যুত হচ্ছে কি না। সবার মনে এখনো একটা আশা রয়েছে যে শেষপর্যন্ত নাদির শাহ ওটি নেবেন না।

বাদশাহ বেগমের সঙ্গে ধীরে ধীরে পিতামহীর কক্ষে প্রবেশ করেন।

বেগম মেহের পরভির শয্যার ওপর একটা বড় তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে ছিলেন। বাদশাহ বুঝতে পারেন, অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাঁর মুখ বেশ শুকিয়ে গিয়েছে। তাঁর গায়ের রঙ এর জন্য তাঁকে হস্তীদন্তে নির্মিত একটি মূর্তির মত দেখাতে লাগছে। মুখমণ্ডলের মধ্যে তাঁর চক্ষুদ্বয় অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

পৌত্রকে দেখতে পেয়েই তিনি বলে ওঠেন -- যা শুনছি তা কি সত্যি?

— কি শুনেছেন?

— সেই বর্বরটা নাকি ময়ূরসিংহাসন নিয়ে যেতে চায়?

খবরটা বেগম মেহের পরভিরকে জানানো নিষেধ ছিল। তবু কোন এক বেগম কিংবা বাঁদীর তর সয়নি। সুতরাং উত্তর একটা দিতেই হবে।

বাদশাহ বলেন — হ্যাঁ।

— দেওয়া চলবে না। শুনলাম সবই নিয়েছে। এটা দেওয়া চলবে না।

— ঠিক আছে। আমি গিয়ে দেখছি।

— এখনো প্রতারণা? এই বৃদ্ধার সঙ্গেও প্রতারণা? এইটুকুই শিখেছ শুধু। যাদের দেহেও বল নেই, মনেও শক্তি নেই, তারা এইসব আঁকাবাঁকা পথে চলতে অভ্যস্ত হয়।

— আপনি এভাবে বলবেন না।

— কেন বলব না? যাঁর সঙ্গে দিনের পর দিন আলোচনা করে কিছু ঠিক করতে পারলে না, এখন গিয়েই ঠিক করে ফেলবে? আসলে তোমরা বাদশাহ হয়ে জন্মাও নি, জোর করে তোমাদের বাদশাহ করা হয়েছে।

— এখন কি সেই কথা বলার সময়?

— না। কিন্তু অতি কষ্টে এই কথা বের হয়ে আসে। একবার ভাব সেইদিনের কথা, যেদিন শাহানশাহ শাজাহান অমন সুন্দর তক্তৃতাউস তৈরি করতে দিয়ে বেগম মমতাজের সঙ্গে দেখা করতে এলেন হারেমে। দুজনার চোখে তখন কোন্ দৃষ্টি ছিল? সেই দৃষ্টি বর্তমান পেরিয়ে সুদূর ভবিষ্যতের দিকে নিবদ্ধ ছিল। সেই দিনে কি আজকের এই দিনের কথা তাঁদের দুজনার কেউ কল্পনা করতে পেরেছিলেন?

— আর বলবেন না। আমি সইতে পারব না। আমিই এর জন্য দায়ী।

— হ্যাঁ প্রত্যক্ষভাবে তুমি, কিন্তু পরোক্ষভাবে আরও অনেকেই। তবে তারা সবাই মোগল বংশের।

সেই সময় বাইরে থেকে লক্ষ কণ্ঠে আর্তস্বর কর্ণকুহর বিদীর্ণ করতে চায়।

বৃদ্ধা আশঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে বলে — কি হল?

বাদশাহ বুঝলেন, যা হওয়ার তা হয়ে গেল।

একটু পরেই কয়েকজন বেগম এসে বাদশাহকে দেখেও এতটুকু অপ্রস্তুত না হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে --- ওরা নিয়ে গেল। আমরা নিঃস্ব হয়ে গেলাম। ওরা নিয়ে গেল।

বৃদ্ধা বড় বড় চোখে চেয়ে বলেন — কী নিয়ে গেল।

— সর্বস্ব। ওরা ময়ূরসিংহাসন নিয়ে চলে গেল।

বৃদ্ধা সেই ভাবেই চেয়ে রইলেন। তাঁর চোখের পলক পড়ে না। তাঁর হাত-পা সব স্থির। তিনি সেই একই ভাবে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে চেয়ে থাকেন। তারপর একটু পরে তাঁর মাথা একদিকে ঝুঁকে পড়ে।

বাদশাহ ছুটে যান তাঁর পাশে। বেগমও যান। কিন্তু ততক্ষণে তিনি ময়ূরসিংহাসনের মায়া পরিত্যাগ করে অক্ষত আত্মগরিমা নিয়ে চলে গিয়েছেন অনেক দূরে।

পরিশিষ্ট

নাদির শাহের হিন্দুস্থান অভিযান সার্থক। তাঁর স্বপ্ন ফলবতী। দিগ্বিজয়ী বীরের মতই তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি অপরিমেয় সম্পদ বাহুবলে আহরণ করেছেন। ময়ূর সিংহাসন তাঁর দখলে। সাধারণ দৃষ্টিতে আর কিছু তাঁর কাম্য থাকতে পারে না।

তবু নাদির শাহের মনের নিভৃত কোণের অন্ধকার থেকে উঁকি মারে আব একটি স্পৃহা। আভিজাত্যেব আরকে নিজের বংশটিকে একটু চুবিয়ে নেওয়া। নাদির কুলি আজ নাদির শাহ হয়েছেন বটে, তাই বলে তো আর তাঁর অতি সাধারণ অতীতকে ধুয়ে মুছে ফেলা যায় না। কোথায় দিল্লীর শাহানশাহের বংশ আর কোথায় তাঁর বংশ। সুযোগ যখন এসেছে তখন পুরোপুরি তার সদ্ব্যবহার করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

বাদশাহকে তিনি একদিন বললেন — আমার পুত্র নাসরুল্লাকে তো আপনি দেখলেন এত, তার সম্বন্ধে কি ধারণা হল?

বাদশাহ মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হন। সবই তো নেওয়া হল, এখনো নড়ছে না কেন তার জন্য তাঁর দুশ্চিন্তা। এর মধ্যে আবাব গায়ে পড়ে আলাপ। নিশ্চয় অন্য মতলব। পিতামহী নাকি অনেককে বলেছেন হামেশা, নাদির শাহকে খুব বেশি আমল না দিতে। যতক্ষণ থাকবেন এখানে, ততক্ষণ চেয়ে যাবেন। তাঁর খাঁই-এর শেষ নেই।

তাই নাসরুল্লার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে তিনি সাবধান হয়ে যান এবং অত্যন্ত দায়সারাভাবে বলেন — মন্দ কি ? ভালই তো।

নাদির শাহ একটু যেন ঠোক্কর খান। বলেন — ব্যস এইটুকু ? আপনি ওকে চিনতে পারেননি।

— হতে পারে।

— আমি ঠিক করেছি আপনাদের বংশের একটি মেয়েকে আমার পুত্রেব সঙ্গে সাদি দেব।

— কি বললেন?

— আপনি চমকে উঠলেন কেন? আমি অন্যায় কিছু বলেছি?

— কি বললেন সেটা শুনব তো?

নাদিব শাহ ক্রূর হেসে বলেন — আমি আমার দূতকে আপনার কাছে পাঠাইনি যে বিদায় করে দেবেন কিংবা হত্যা করবেন। আমি নিজেই সশরীরে আপনার সম্মুখে উপস্থিত। সুতরাং যদি সত্যিই শুনে না থাকেন তাহলে আবাব বলছি। আপনাব বংশের কোন কন্যাকে আমার পুত্রবধূ করে নিয়ে যাব।

শাহানশাহের বুকের ভেতরে মোচড় দিয়ে ওঠে। তিনি এই কদিন ভাবছিলেন ময়ূব সিংহাসন চলে যাওয়াব সময় তাঁর বংশমর্যাদা চরমতম নিচে গিয়ে পৌঁছোবে। তার চেয়ে আব নিচে নামার আশঙ্কা নেই। কিন্তু এখন দেখছেন এর যেন তল নেই। ওই বর্বরের পুত্রের

সঙ্গে বিবাহ হবে মোগল বংশের কোন কন্যার! এই বংশেব যে কোন কন্যাই বলতে গেলে সঙ্গীত রসিকা। যে কেউ দুচার পাতা লিখতে পারে। সে ওই নির্বাসনে গেলে যে শুকিয়ে মরে যাবে।

বাদশাহ ঢোঁক গিলে কোনবকমে বলেন — অনুসন্ধান করতে হবে।

অতি উৎসাহে নাদির শাহ বলেন — সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। এখন আপনার অনুমতিব অপেক্ষায় শুধু।

মহম্মদ শাহ ভাবেন, কোন্ উজবুক তার মেয়েটিকে জলে ভাসিয়ে দিতে চাইছে? মুখে বলেন — কাব কন্যা?

— ইয়াজদান বক্স্।

— সে বলেছে?

— না, ঠিক করে রেখেছি আমি। অনেক খোঁজখবর করেই তাঁর মেয়েকে নির্বাচন করলাম। শাহানশাহ আলমগীরের সাক্ষাৎ প্রপৌত্রী।

— সব খবরই বাখেন দেখছি।

নাদিব শাহ এবারে বলেন — সেই দিক দিয়ে আমি সব সময় আপনার চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে। আর আপনি তো ভালভাবেই জানেন, ইয়াজদান বক্স্‌কে রাজি করাতে খুব বেশি অসুবিধা হবে না।

মনে মনে সেটা স্বীকার করেন বাদশাহ। বেচারা ইয়াজদান। তার ওপর শেষ পর্যন্ত কোপ পড়ল।

বিবাহের দিন গণ্যমান্য সবাই নিমন্ত্রিত হল। না এসে উপায় নেই বলে সবাইকেই আসতে হল। কাষ্ঠ হাসি হাসতে হল। উপহার প্রদান করতে হল।

বাদশাহও এলেন। ইয়াজদান তাঁর দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাইলেন। কিছু বলার নেই। তাঁকে দেখে মেয়েটির চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তিনি কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত রেখে নিম্নস্বরে বলেন — আমি একটা অপদার্থ রে। তবে তোর জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা জানাব। তিনি সহ্যশক্তি দেবেন নিশ্চয়। পরে সব মানিয়ে নিতে পারবি। হয়ত ভালই হবে।

মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে আর কিছু বলতে পারলেন না তিনি। সাদির আগে পাত্রের সাত পুরুষের পরিচয় প্রদানেব প্রথা রয়েছে মোগল বংশে। নইলে এই বংশের কোন কন্যা অন্যত্র যায় না। অর্থাৎ আভিজাত্যের প্রমাণের জন্য এই পরিচয় প্রদান। নাদির শাহের নিকট লোক পাঠানো হয়েছিল ঐতিহ্য অনুযায়ী। তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করে কর্কশ কণ্ঠে বলেছিলেন — ইয়াজদান বক্স্‌কে বলে দেবেন নাসরুল্লার পিতার নাম নাদির শাহ, তাঁর পিতা তরবারির পুত্র, তাঁব পিতাও তরবারির পুত্র। এইভাবে সাত পুরুষ নয় সত্তর পুরুষ.....।" সুতরাং বলার কিছু ছিল না।

বাদশাহ ইয়াজদান বক্‌স্-এর কন্যাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার হীরকখচিত একটি কণ্ঠহার ও পাঁচহাজার টাকা উপহার দিলেন। ইয়াজদানকে একান্তে বললেন— সেই সব দিন থাকলে এই সামান্য উপহারের কথা ভাবতে পারতাম না। কিন্তু আমার কিছুই নেই। খুঁজে পেতে এইটি পাওয়া গেল।

ইয়াজদান বলে — সেজন্যে দুঃখ করবেন না। মেয়েটা শান্তিতে থাকতে পারলে বাঁচি।

নাদির শাহ সেদিন কিছু দিলেন না। শুধু দেখে গেলেন সব। তারপর তিনি জানতে পারলেন বাদশাহ কত মূল্যের উপহার দিয়েছেন। পরদিনই তিনি সবাইকে জানিয়ে পুত্রবধূকে পাঁচলক্ষ টাকার জড়োয়ার গহনা দিয়ে এলেন।

কিন্তু সবার শেষে একটি কথা বলার রয়েছে। নাদির শাহ রয়েছেন অথচ রক্তপাত ঘটবে না এ তো হয় না। শুভ অনুষ্ঠান হলেও খুন খারাপি না হলে যেন তেমন জমে না কিছু।

পুত্রের বিবাহে নাদির শাহ জাঁকজমকের ত্রুটি রাখেননি। আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়েছিল সমস্ত অঞ্চলটি। বাজি পোড়ানো হল নানান রকমের। রাজধানীর অধিবাসীদের নিঃসাড় মনে সাড়া না জাগলেও তাদের চোখে পড়েছিল সেই উৎসবের দৃশ্য।

এই উৎসবে নাদির শাহের সাধের কিজিলবাস অশ্বারোহীদের জন্য পনেরো কুড়িজন নৃত্যে এবং সঙ্গীতে আসর জমিয়ে তুলল। খুব বেশি আনন্দ দিতে হলে ধর্মকে টেনে আনতে হয়। সেটা করতে গিয়ে তারা নিজেদের বিপদ ডেকে আনল। নাদির শাহ আসর ছেড়ে চলে গিয়েছেন তখন। অতি উৎসাহী কিজিলবাস সিপাহীরা আসরকে মাতিয়ে তুলতে হোসেনের শোকগাথা মর্মস্পর্শী সুরে আবৃত্তি করতে শুরু করল। আসরের কেউ-ই অশ্রু সংবরণ করতে পারল না।

পরদিন প্রত্যুষেই নাদির শাহের কাছে সংবাদ পৌঁছে গেল। ক্রোধে তিনি উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন ---- কী! নাসরুল্লার সাদির আসরে অশ্রুজল? সব কটাকে এই মুহূর্তে বেঁধে নিয়ে এস। আমি তো নতুন বলছি না, অনেকদিন থেকে বলে আসছি আনন্দের অনুষ্ঠানে ওসব চলবে না। এটা কোরান-বিরুদ্ধ। কোরানকে অশ্রদ্ধা করা হয়েছে। সুন্নি ঐতিহ্যে এটা ঘোর অন্যায়।

সেই দিনই ওই বিশজন হতভাগ্যকে দিল্লীর এক ফটকের সামনে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে রাখা হল। এর পরে নাদির শাহ দিল্লী পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার পরেও সেই টুক্‌রোগুলো পচে গলে হাড় বেরিয়ে পড়ে রইল বহুদিন নাদির শাহের নৃসংশতার শেষ নিদর্শন রূপে।

—?—